সীতা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

১৬ই ভাদ্র ১৩১৯।

(প্রকাশক, এ, কে, রায় এণ্ড কোং ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট)।

(A. K. Roy. & Co.. 57-1, College Street)

ভূমিকা

"সীতা" প্রচারিত হইল। কোথায় বাল্মীকি-প্রতিভা, কোথায় অলৌকিক সীতাচরিত্র, আর কোথায় মদ্বিধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি! আমার এই দুঃসাহস কোনমতেই মার্জ্জনীয় নহে; কিন্তু সীতাচরিত্রের চিত্তচমৎকারী মহিমাই আমার এই দুঃসাহসের একমাত্র কারণ।

সীতাচরিত্রের সৌন্দর্য্য যে কিছুমাত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা মনে হয় না; তবে যত্ন ও চেষ্টার কিছু ত্রুটি করি নাই। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে কবিকুলগুরু মহর্ষি বাল্মীকিরই পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি; ইহাই আমার একমাত্র সাহস! "সীতা" পাঠ করিয়া কেহ যদি প্রীত হন, তবে তাহা বাল্মীকির গুণে, আর কেহ যদি অপ্রীত হন, তবে তাহা গ্রন্থকারের দোষে। ফলতঃ, জগৎপূজ্যা সীতাদেবী যে এই গ্রন্থনিবদ্ধ সীতা অপেক্ষাও মহীয়সী, ইহাই স্মরণ রাখিতে আমি সকলকে প্রার্থনা করি।

যেরূপ রাম ব্যতীত রামায়ণ অসম্ভব, সেইরূপ রাম ব্যতীত সীতাও অসম্ভব; সুতরাং "সীতা" লিখিতে লিখিতে আমাকে প্রায় সমগ্র রামায়ণখানি সংক্ষেপে বর্ণিত করিতে হইয়াছে। আজ-কাল যে শ্রেণীর পাঠকপাঠিকা দুর্ভাগ্যক্রমে নানাকারণে রামায়ণ পাঠ করেন না, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা তাঁহাদের কিঞ্চিৎ উপকার হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। আর যাঁহারা নিয়তই রামায়ণ পাঠ করেন, বা পবিত্র রামকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের ত ইহাতে অরুচি না হইবারই কথা।

আশা করি, এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্যকালে, পতিব্রতার অগ্রগণ্যা সীতাদেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যকীর্ত্তনকে কেহ অসাময়িক প্রসঙ্গ বা অসংলগ্ন প্রলাপ বলিবেন না। স্ত্রীশিক্ষা ও লোকশিক্ষা প্রয়োজনীয় কি না, সে বিচারের দিন বহুকাল গত হইয়াছে; কাহারও ইচ্ছা থাক্ বা নাই থাক্, এই উভয়বিধ শিক্ষাই এখন এদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সকলে যাহাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করা বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। "সীতা"কে স্ত্রীশিক্ষা ও লোকশিক্ষার উপযুক্ত করিয়াই রচিত করিয়াছি। কিন্তু ইহা আমাদিগের উদ্দেশ্য কতদূর সফল করিয়াছে, তাহা সাধারণে বিচার করিবেন।

এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের বঙ্গানুবাদ হইতে স্থলে স্থলে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে যে স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার শেষে বন্ধনীর মধ্যে প্রথম সংখ্যা কাণ্ডবাচক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা সর্গবাচক।

কলিকাতা।
১লা ফাল্গুন, ১২৯৭

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবারও কতিপয় ভ্রম অনিবার্য্য হইল। উদারহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। শ্রাবণ, ১৩০৪।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অনেকে "সীতা"র একটী সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করায়, আমি বর্ত্তমান সংস্করণে কতিপয় চিত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। চিত্রগুলি দিতে বহু ব্যয় হইলেও, আমি "সীতা"র মূল্যের বৃদ্ধি করিলাম না। যাঁহারা বিগত দ্বাবিংশ বৎসর ধরিয়া "সীতা"র সমাদর করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহার বর্ত্তমান সংস্করণেরও যথোচিত সমাদর করিবেন, এইরূপ আশা করি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পিগণের অঙ্কিত কতিপয় চিত্রের প্রতিলিপি "সীতা"তে সন্নিবিষ্ট হইল। চারিবর্ণে মুদ্রিত প্রথম চিত্রটি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় আমার অভিপ্রায়ানুসারে প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অঙ্কিত "কৈকেয়ী ও মন্থরা" এবং "অশোকবনে মর্ত্তুকামা সীতা" এই চিত্রদ্বয়ের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এলাহাবাদের "ইণ্ডিয়া প্রেসে"র সত্বাধিকারী মহাশয়ও প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্ত্তৃক অঙ্কিত "রাম ও গুহক-সম্মিলন" নামক চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়া আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রাজা রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত "রাবণ ও জটায়ু" এবং "সীতা ও স্বর্ণমৃগ" নামক চিত্রদ্বয় প্রকাশিত করিবার জন্য আমি "প্রবাসী"-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী রহিলাম।

সীতাদেবীর দেবোপম চরিত্রাবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায় আরও দুই তিন খানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সীতাচরিত্র গৃহে গৃহে যতই আলোচিত হয়, ততই সুখের বিষয়। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একটী গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে হইল, গ্রন্থকার মৎপ্রণীত এই পুস্তকের বিলক্ষণ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন; পরন্তু তিনি ভূমিকায় তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে অপরিচতিও নহেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ সম্বন্ধে অমি নিজে কিছু না বলিয়া তদ্বিষয়ের বিচারভার পাঠকবর্গেরই উপর অর্পণ করিলাম। ইতি

আজিমগঞ্জ
১৬ই ভাদ্র ১৩১৯।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। গীতা (সচিত্র) কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

২। ঐ (বিদ্যালয়-পাঠ্য) মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

৩। পলাশ-বন (গার্হস্থ্য চিত্র) কাপড়ে বাঁধা, (চিত্র নাই) মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ১৯১১ সনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার (এফ-এ পরীক্ষার) পাঠ্য ছিল। মহামান্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ,ডি এল্ মহোদয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা Goldsmith's Vicar of Wakefield, Lamb's Tales from Shakespeare প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থখানিও পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভাষা ও ভাব পবিত্র ও উপাদেয়।

৪। কুমারী (উপন্যাস) প্রায় ৩৪০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ২৲ দুই টাকা। গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি সহিত।

৫। গাথা (কবিতা পুস্তক) মূল্য ৸০ আনা। কবিতাগুলি পবিত্র ও উচ্চভাবময়। সকলেই পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। একটী হাফ্-টোন্ ছবি আছে।

৬। সুকথা সুনীতিপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। বালকগণের অতি সুপাঠ্য। মূল্য ।০ চারি আনা।

৭। রঘুবংশম্ (গ্রন্থকার ও পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন কর্তৃক সম্পাদিত ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সর্গ, ইন্টারমিডিয়েট্

পরীক্ষার পাঠ্য) উৎকৃষ্ট টীকা, বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ ইত্যাদি। প্রতি সর্গের মূল্য ১৲ এক টাকা। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গও পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি সর্গ ১৲ এক টাকা। (প্রকাশক, এ, কে, রায় এণ্ড কোং ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট)।

৮। The Vaisya Caste (cloth) price Rs 1-4 Highly praised by all newspapers for research and erudition. (A. K. Roy. & Co.. 57-1, College Street).

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উক্ত গ্রন্থ নিচয় সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

১। সীতা।

"Babu Abinas Chandra Das, M. A. B. L., made a decided hit some years ago with the story of *Sita*, the ideal wife, following on the lines of the poet Valmiki, the original delineator of the character. The work was distinguished by fine literary feeling and Sir Alfred Croft selected it as a text-book for the normal Schools and subsequently for the Bengali Course in the Middle Scholarship Examination. The little book has had a wide circulation and a new edition has just been published." *The Englishman.*

"The style of the author is chaste, elegant and full of

vigour. * * The book would do credit to the best Bengal. writers * * The wr ter has followed in the foot steps of Valmiki and has attained full success in bringing out the beauties of Sita's character. * * Many are the hidden beauties in the character of Sita, which like some rare and delicate perfume pervade her nature but escape analysis. We leave, the reader to find them out and elevate his nature with their enjoyment. The descriptions of natural scenery in the book are very vivid and charming. * * He has grouped round her life nearly all that is worth knowing in the Epic. * * It is one of the best books that can be placed in the hands of young ladies and old, though, of course, the male reader would be equally benefited by it. Our countrymen, if they are sincere in their love of all that belongs to Ancient India, ought to welcome and cherish such a work. In its purity, its sweetness, its meek and simple heroisom, its ardent love and enjoyment of Nature, its consciousness of the dignity and holiness of wifehood, and in the many other heavenly qualities which grace it, the character of Sita is unique. And this is the character the author has portrayed with consummate ability and full success" *Indian Messenger.*

"The book is an excellent production. Whoever has once gone through it cannot but admire it. As a literary production, it outbeats some of the standard works on similar subjects coming out from the pen of some of the best of our literary men. It is a valuable acquisition to the Bengali literature * * The æsthetic beauty of the work is remarkable.Thechief recommendation ofthe work is its moral beauty. The author has writen the book in the capacity of one who has been charmed by the beauty of his heroine's character. * * The character portrayed by such an ardent admirer cannot but be of an immense moral value."—*Uniy and the Minister.*

"The book is written in a simple and chaste style and I read it with much pleasure. * * *Sir Gooroo Dass Banerjee.*

......"Indeed, it does infinite credit to you and I venture to think, it does credit to any body, to write such an admirable work as you have done. * * Your delineation of the character of Sita is highly gratifying to us all who lookupon her with reverence. *Raja Binay Krishna Bahadur of Sovabazar.*

"সীতা" একখানি সুপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা আদর্শ চরিত্রের একখানি আদর্শ পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সীতার ন্যায় আরও গ্রন্থ রচনা করিলে, বাঙ্গালী অবিনাশ বাবুকে সোণার দোয়াত কলম দিবে। বঙ্গবাসী।

"ইহা শুদ্ধ সীতাচরিত্রের সমালোচনা নহে, গ্রন্থকার প্রাঞ্জলভাষায় রামায়ণ অবলম্বন করিয়া, সীতাচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি সুপাঠ্য ও সুন্দর—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।" হিতবাদী।

"সীতা-চরিত্র অনেকে লিখিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় এমন সুন্দর করিয়া কেহ বুঝি সীতা-চরিত্র অঙ্কন করেন নাই। 'সীতা', বাঙ্গালা ভাষায় এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে। এমন সুন্দর ভাষা, ভাষার এমন তেজ প্রায় দেখা যায় না। অবিনাশ বাবু 'সীতার' জন্যই সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইহাঁর লেখনী অক্লান্ত থাকিয়া বঙ্গভাষায় উন্নতি করুক, বাঙ্গালীর জন্য সুখপাঠ্য উন্নত নীতিপূর্ণ গ্রন্থ উপস্থিত করুক।" সঞ্জীবনী।

"ললনাকুলশিরোমণি সীতাদেবীর স্বর্গীয় সমুন্নত চরিত্র প্রতিফলিত করিয়া আমাদের এই নবীন গ্রন্থকার, বাঙ্গালা সমাজের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।" নবযুগ।

গ্রন্থকার যে আকারে বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সীতাচরিত্র বঙ্গভাষায় অদ্যাপি আর প্রকাশিত হয় নাই। পরিণয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবনবৃত্তান্ত এ পুস্তকে অতি দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার অবশ্য পাঠ্য।" নব্যভারত।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা, রচনার গাঢ়তা এবং ভাবের মাধুর্য্য সকলই অতীব প্রশংসনীয়। কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণে যে অতুলনা স্বর্গের ছবি সীতাকে অঙ্কিত করিয়াছেন, অবিনাশ বাবু তাহা বাঙ্গালা রঙ্গে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং এ চিত্র সুন্দর হইয়াছে। পাঠিকাগণ আদর্শসতী সীতার যথোচিত সমাদর করিবেন, এজন্য অনুরোধ করা বাহুল্যমাত্র।"

বামাবোধিনী।

"সূর্য্যে প্রখরতা আছে চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, মিষ্টে পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু রামায়ণ সাহিত্য জগতে এক অদ্বিতীয় অপূর্ব্ব বস্তু, আজন্ম কাল হইতে আমরা তাহার গল্প শুনিয়া আসিতেছি, তাহা পাঠ করিতেছি, তাহাতে আমাদের অরুচি নাই, প্রিয়তমের ন্যায় ইহা চিরমাধুর্য্যময় সদানন্দদায়ক। রামায়ণের এই যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, 'সীতাতে' তাহা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে, ইহা লেখকের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। বইখানি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। ভাষা অতি সরল, সুন্দর; বর্ণনার লালিত্য মনোহর। অধিকাংশ বর্ণনা মূল রামায়ণ হইতে অনুবাদিত। সীতার বনবাসাংশ ও অবশেষে যজ্ঞস্থলে তাঁহার প্রাণত্যাগ অতি মনোহর ভাবে হৃদয়াদ্রকারী।"—ভারতী

২। পলাশবন।

(১৯১১ অব্দে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্য ছিল)

In the course of a lengthy address to the Entrance Examinees who were entertained by the Calcutta University Institute on the 9th March 1907, Sir Gooroo Dass Banerjee KT. M. A. D L. gave them the following advice as to the books they should read :—

"When you read, you cannot do better then read, in the first place, our great book, the 'Geeta'. You will not find it very difficult, barring the few passages in which the Vedanta philosophy is sought to be explained. *You may also read the Bengali novel Palasban, by Babu Abinas Chandra Das*, or 'Suto Duhita'. They are *excellent novels and written in the purest style*. You may also read a book like Goldsmith's 'Vicar of Wakefield' or Lamb's 'Tale from Skakespeare'. You may also read a book like 'Meditations of Aurelius,' a book which has some analogy with the 'Geeta'.

Commenting on the arove, the *Unity and the Minister wrote* "That the *Palasban* of Babu Abinas Chandra Das should have been mentionedin the same breath by Sir Gooroo Dass Banerjee with some books of epoch-making character as a fit book for study by the rising generation shows the keenness (of the appreciation) of the work by the learned speaker. *Sita*, the author's other well-known book, is also of considerable merit, and ought to be read very largely by our young men and young women."

"A novel deserving of high praise. It is a vivid picture of happy Hindu domestic life and is written in a style of singular purity and grace. The drawing of character is distinctly clever and the love of the beautiful in scenery is a pleasing feature of the work. "– *Englishman*.

...A faithful picture of Bengali middle-class life delineated

with considerable skill * * Surama's self-denial is worthy of the best traditions ef Classic India. The purity, simplicity and felicity of Hindu domestic life have been delineated in the book with a skill and fidelity that do credit to the author. The book is written in pure and chaste Bengali--*Calcutta Gazette.*

"......A domestic picture drawn in the shape of an auto biography. The author has successfully shown in this how Hindu Society can be made a thoroughly national institution without the higher aspirations of individual members resulting from culture and religiousness !receiving the slightest let or hindrance. The writer is a good hand at reproducing Zenana life in all the sweetness of its social system. Surama who, after showing herself once or twice at the beginning of the piece, disapprears entirely from view in the middle and re-appears at the close in all the effulgence of her moral beauty, is an interesting creation of the writer's fancy. Her firmness of character, and her devotedness to her prospective husband and other features of her life afford capital moral instruction to her sex. *Palashon* is a very characteristic production and a perusal of it is calculated to give the reader both pleasure and profit," -*Indian Minror.*

"পলাশবনে'র ভাব ভাল, ভাষা ভাল, লিখনভঙ্গী পবিত্রতা-মাখান। পলাশবনে' কিশোরের উন্মত্ততা নাই ; উদ্দাম শিক্ষার ঔদ্ধত্য নাই, তাই 'পলাশবন' আমাদের আদরের।"—বঙ্গবাসী।

"অবিনাশ বাবু "সীতা" লিখিয়া সাহিত্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন ; 'পলাশবন' লিখিয়া আরও সুপরিচিত হইলেন। * * * গল্পাংশের কল্পনা যে সুন্দর হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দু গৃহে প্রতিদিন যে সকল চরিত্র আমাদের নয়নপথে পতিত

হয়, তাহারই কতিপয় উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে। চরিত্রগুলি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তবে সব চরিত্রগুলিকেই লেখক চরিত্রের আদর্শ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; আর আদর্শের সমষ্টি সংসারে সুলভ হইলেও, একাধারে আদর্শ দোষ ও গুণের সমষ্টি সংসারে সুলভ নহে। উপন্যাসের নায়ক আদর্শ পুরুষ। তাঁহার দোষ ও গুণ উভয়ই যেন সংসার হইতে উচ্চস্থানে আরোপিত। তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসারী নহেন। পরহিত সাধন তাঁহার ব্রত; বিদ্যার অর্জ্জনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। স্বার্থত্যাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। নায়ক সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসেন; অথচ সংসারের ও সংসারীর সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি। সংসারীর পক্ষে এরূপ আদর্শ সর্ব্বথা অনুকরণীয়। নায়কের ভৃত্য কেশব প্রভুভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নায়িকা যোগমায়া লক্ষ্মীরূপিণী। মঙ্গলা প্রত্যেক গৃহেই দাসীরূপে অবস্থিতা। গোস্বামী ও গোস্বামীপত্নীর ন্যায় লোক এখন বিরল হইলেও, দুষ্প্রাপ্য নহে। এককালে কিন্তু তাঁহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ তেজস্বী, ভগবৎপ্রাণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হিন্দু সমাজের নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। * * * গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিয়াছি। পাঠকগণও সন্তোষলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।"—দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা।

বাল্মীকি রামায়ণের বিমল চারিত্র্যমাধুর্য্য, তাহার ভীম পর্ব্বত উদার বনভূমি, বিসর্পিণী তটিনী ও পুণ্য তপোবনের ভিতর যদি এই ক্ষীণপুণ্য বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন মানবের মন হারাইয়া যায়, তবে তাহার উপায় কি? যে কোন প্রবল অনুভূতি অন্তরে

জন্মলাভ করে, কোন না কোন আকারে তাহার বাহ্যবিকাশ অবশ্যম্ভাবী। এই পলাশ-বন বাল্মীকিবিমুগ্ধহৃদয়ের মোহশূন্য বর্ত্তমান জীবন যাত্রাকেও রামায়ণ-মোহময় করিবার সুন্দর প্রয়াস। * এই গ্রন্থের আর একটী চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা সুরমার। এরূপ অলীক-ব্রীড়াবর্জ্জিত, ধীর. প্রশান্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রীচরিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসে প্রায় দেখা যায় না। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিতেছেন "পলাশ-বন ঠিক উপন্যাস গ্রন্থ নহে। উপন্যাসের অধিকাংশ লক্ষণই ইহাতে বিদ্যমান নাই। ইহাকে একটী কাল্পনিক গার্হস্থ্যচিত্র মাত্র বলা যাইতে পারে। যাঁহারা উপন্যাসের তীব্র আনন্দ-লাভ-প্রত্যাশায় ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ নিরাশ হইবেন। তীব্র আনন্দ হয়ত নাই, কিন্তু যে সাত্ত্বিক প্রশান্ত আনন্দে গ্রন্থখানি সিক্ত তাহা দুর্ম্মূল্য! আমরা দুইবার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে গ্রন্থখানি পড়িয়াছি, এবং এখনও অনেকবার পড়িয়াও প্রীতিলাভের প্রত্যাশা রাখি, স্থানাভাবে ইহার অনেক, সৌন্দর্য্যের আমরা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। * *" (আট পৃষ্ঠা ব্যাপিনী সমালোচনা হইতে উদ্ধৃত)

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল

৩। কুমারী।

The Indian Mirror says :--We have no hesitation in saying that it would mark an epoch in the history of Bengali novels. It is quite unlike any of the novels with which the rea-

ders of Bengali literature are familiar. The author has chalked out a new path of his own, and has brought us face to face with the all-absorbing social, moral, religious and political problems with wich we are confronted at the present moment. Considered from this point of view, it is really the Book of the Times and is sure to exercise great influence for good in the upbuilding of our national life. With that superior literary art and skill of which the author is a past-master, the author takes the reader with him through these intricate problems, and lands him safely at a place where there is a happy solution of them all. * * We ardently wish that every one of our educated countrymen, young and old, will have a copy of this valuable work at his elbow and ponder over the teachings that it seeks to inculcate, * * The book deserves to be very widely read, and we wish it a large circulation among the Bengali-reading public. No home in our opinion should be without a copy of it.

The "Englishman" says: The author has gained no small reputation. * * His language is chaste and his style pleasing."

আমরা পুস্তকখানি অভিনিবেশ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার যে কয়টী লোকচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। * * আমরা এই পুস্তকখানি আমাদের পাঠকপাঠিকাগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস, এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। পুস্তকখানিতে অবিনাশ বাবুর পূর্ব্ব যশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। হিতবাদী ১৬ই পৌষ ১৩১৬ সাল।

"কুমারী" আদ্যন্ত পাঠ করিয়া জানিলাম, এ গ্রন্থপ্রণয়নে অবিনাশ বাবুর পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুন্ন রহিয়াছে, অথবা সাহস

সহকারে বলিতে পারা যায়, ইহাতে তাঁহার পূর্ব্ব যশঃপ্রভা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে যে কয়টি লোকচরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল গুলিই অতি সুন্দর হইয়াছে। উপন্যাসখানির "মাতৃ-সম্প্রদায়" শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয়ের অভিনব-সৃষ্টি। মাতৃ-সম্প্রদায়ের নেত্রী মাতাজী তপস্বিনীর মুখে তিনি যে সার সত্যের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই মধুর, বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই উপদেশপূর্ণ। অবিনাশ বাবু অতীব নিপুণতার সহিত উপন্যাসের মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ও জাতীয় কর্ত্তব্যের সমাধান করিয়াছেন; গ্রন্থের এ অংশ বড়ই তৃপ্তিকর, বড়ই শিক্ষাপ্রদ। এই উপন্যাসখানির ভাব যেরূপ উচ্চ, ভাষাও তদ্রূপ পরিমার্জ্জিত। বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলী ও শিক্ষিতা মহিলাগণের হস্তে উপন্যাসখানি অতিশয় শোভনীয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঁকুড়াদর্পণ ১৬ই এপ্রিল ১৯১০ সাল।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ১৩১৬ সালে সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন "আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও অবিনাশচন্দ্রের 'কুমারী' ব্যতীত উপন্যাস বিভাগও কোনও স্থায়ী রসাত্মক রচনাদ্বারা আলোকিত হয় নাই।"

"পুস্তকের ভাষা মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ; রচনায় কবিত্ব ও ভাবুকতা আছে; ভাব পবিত্র। আদর্শ উচ্চ। প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে বর্ত্তমান সময়ের কতিপয় জটিল সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে, যথা—বালিকা বিবাহ, সামাজিক অবস্থা, ভারতে ইংরাজশাসন বিধাতার বিধান কি না, ভারত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপযুক্ত কি না, স্বরাজ পাইবার আশা করার আগে আমাদের দেশের পতিত অস্পৃশ্য প্রভৃতি জাতি ও নারীসমাজকে শিক্ষিত ও উন্নত করা আবশ্যক কি না—এই সকল সমস্যা খুব ধীরভাবে

আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান সাধনা ব্রহ্মতত্ত্বলাভ, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম জানিলে আমরা সকলকে সম্মান ও সমাদর করিতে পারিব এবং তখনই আমরা সকল বিরোধের সমন্বয় করিয়া স্বরাজ্য লাভ করিতে পারিব ইহাই বাস্তবিক তপস্বী ভারতবর্ষের সাধনা। এমনই খণ্ডশ ভাবে এই গ্রন্থখানি উপাদেয়।

প্রবাসী।

৪। গাথা।

Indian Mirror বলেন :—The poems are mostly spiritual, and have blossomed forth in all their innocent purity and loveliness which are not blurred nor bedimmed by any mist hanging about them, as unfortunately characterises the writings of some of our best poets. The rapturous effusions of the soul bear in them the impress of classical simplicity and grandeur, and make one forget for the nonce the sad and maddening turmoils of the world."

কবিতাগুলি সরস ও প্রাঞ্জল, একটী স্নিগ্ধ শুচিতা সর্ব্বত্র স্বচ্ছভাবে রহিয়াছে। কবিতায় কোথাও বিহ্বল উদ্দাম আবেগ নাই। সমতল দেশের ক্ষুদ্র তটিনীর মত ধীর লঘু গতিতে চলিয়া গিয়াছে—আড়ম্বরও নাই, অথচ আড়ষ্টও নহে।

প্রবাসী।

ধুরি স্থিতা ত্বং পতি দেবতা

রঘুবংশে, নির্ব্বাসিতা সীতার প্রতি মহর্ষি বাল্মীকির ।

Copyright.

সীতা।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে মিথিলা নামে এক বৃহৎ জনপদ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে, বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এবং গঙ্গার উত্তর দিকে ত্রিহুত নামে যে প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন তাহাই অতিশয় প্রাচীনকালে মিথিলা নামে অভিহিত হইত। বাল্মীকির রামায়ণে মিথিলার অবস্থানসম্বন্ধে যে প্রমাণাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত অনুমানকে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, পুরাকালে এই মিথিলা দেশে এক সুবিখ্যাত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন; মহাযশা নিমিই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র মিথি, এবং মিথির পুত্র জনক। ইহাঁরই নামানুসারে মিথিলার রাজগণ বংশপরম্পরাক্রমে জনকশব্দে অভিহিত হইতেন।

অযোধ্যাপতি মহাত্মা দশরথ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে যে মহাভাগ মিথিলার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তিনিই জনক নামে জগতে সুপরিচিত আছেন। এই মহীপাল জিতেন্দ্রিয় ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন; তিনি নিয়ত ব্রহ্মপরায়ণ

হইয়া যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঋষিসমাজ তাঁহাকে রাজর্ষি-উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার এমনই প্রতিপত্তি ছিল যে, তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় এবং রাজা হইলেও ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুদ্বারা নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও একদিকে তৎসমুদায়ে যেমন একেবারে স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে প্রজাপালন ও রাজকার্য্য-পরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এইজন্য জগতে তাঁহার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক গুণে আকৃষ্ট হইয়াই নানাদিগ্দেশ হইতে ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি ও সাধু মহাত্মগণ সর্ব্বদা তদীয় রাজসভায় সমাগত হইতেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

যে জগৎ-পূজ্যা অসামান্যা নারীর জীবনচরিত লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই নারীকুলভূষণ সীতাদেবীই এই মহানুভব রাজর্ষি জনকের দুহিতা ছিলেন। সীতার জন্মসম্বন্ধে রামায়ণে যে প্রসঙ্গটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার জন্ম একটী অলৌকিক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, একদিন রাজর্ষি হলদ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে একটী কন্যা উত্থিত হইল। নবদূর্ব্বাদলমধ্যে শুভ্র পুষ্পরাশি যেমন পড়িয়া থাকে, সেইরূপ সেই সদ্যকর্ষিত মৃত্তিকার উপর রাজর্ষি রূপ-লাবণ্যসম্পন্না সুলক্ষণা সেই কন্যাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত

বিস্মিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রোড়ে উত্তোলন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সস্নেহে আপনার আত্মজার ন্যায় তাঁহার লালনপালন করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রশোধন কালে কন্যা হলমুখ হইতে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া জনক তাঁহার নাম "সীতা" রাখিলেন।

এইরূপে রাজর্ষির স্নেহ ও কারুণ্যে প্রতিপালিত হইয়া সীতা শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সীতা জনককে আপনার পিতা ও তৎপত্নীকে আপনার জননী বলিয়াই জানিতেন; তাঁহারাও তাঁহাকে আপনাদের কন্যা অপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। সূক্ষ্ম মেঘজাল ভেদ করিয়া যেমন শুভ্র শশাঙ্কজ্যোতি প্রকাশিত হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে সীতার সুকুমার দেহেও দিব্য রূপলাবণ্য প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। সীতা বাল্যসুলভ ভীরুতা ও চপলতাবশতঃ কখনও চঞ্চল মৃগশিশুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন; কখনও বা স্নিগ্ধোজ্জ্বল অচঞ্চল সৌন্দর্য্যরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবকন্যার ন্যায় লক্ষিত হইতেন। তখন লোকে সত্যসত্যই তাঁহাকে মানবকন্যাবেশে সাক্ষাৎ কোন অমরদুহিতা মনে করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইত! বিশেষতঃ, সীতার জন্মসম্বন্ধীয় ঘটনার সহিত তাঁহার অলৌকিক রূপ, শান্তস্বভাব, কোমলতা, সরলতা প্রভৃতি গুণাবলির আলোচনা করিয়া সকলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, সীতা অবশ্যই অগর্ভসম্ভূতা হইবেন, কারণ কোন নারীগর্ভজাতা বালার মধ্যে উল্লিখিত গুণরাশি একাধারে কোথাও কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

বালিকা সীতার স্বভাব এমনই মধুর ছিল, দেখিয়া বোধ হইত যেন স্বর্গ হইতে একবিন্দু সুধা জনকের গৃহে পতিত হইয়াছে! রাজর্ষির সভাতে যে সকল তপোধন মহর্ষি আগমন করিতেন, তাঁহারা সীতার সৌন্দর্য্যপ্রভা ও পবিত্রতা দেখিয়া তৎসম্বন্ধে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করিতেন। সরলা সীতা ঋষিগণের নিকট তাঁহাদের আশ্রমের বর্ণনা শুনিতে সাতিশয় কৌতূহল প্রকাশ করিতেন, এবং পবিত্রস্বভাব ঋষিকন্যাগণের সহিত বাস ও বিচরণ করিতে একান্ত অভিলাষিণী হইতেন; তাহা দেখিয়া দূরদর্শী মহর্ষিগণ বলিতেন, এই কন্যা ভবিষ্যতে স্বামীর সহিত অরণ্যচারিণী হইবেন। বাস্তবিক, সীতা বাল্যকাল হইতেই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য্যে এমনই বিমুগ্ধ হইতেন, এবং পবিত্র আশ্রমভূমির দর্শনলালসা তাঁহার মনে এতই বলবতী ছিল যে, তিনি স্বামীর সহিত প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষকাল অরণ্যবাস ও নানাস্থানে মনোহর আশ্রমপদসকল পর্য্যটন করিয়াও হৃদয় মধ্যে যেন কিছুমাত্রও তৃপ্তিলাভ করেন নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার সরল পবিত্র হৃদয়ে পতিত হইয়া স্বর্গের শোভায় পরিণত হইয়াছিল। নিবিড় অরণ্যানী, ভীষণ গিরিগুহা, ভয়াবহ নদনদী প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক সীতা কখনও সন্ত্রাসিত না হইয়া বরং ভীতিমিশ্রিত এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। সীতা কাননমধ্যে নির্ভীকচিত্তে হরিণীর ন্যায় বিচরণ করিতে এবং মনোহর পুষ্পসকল চয়ন করিয়া বনদেবীর ন্যায় পুষ্পভূষণে ভূষিত হইতে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগবিষয়ে সীতা জগতে অতুলনীয়া। এই

জন্যই বুঝি তিনি পৃথিবীর প্রিয়তমা দুহিতা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন।

বাস্তবিক, সীতার সমগ্র জীবনের ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করিয়া এক এক বার মনে হয়, বিধাতা বুঝি সংসারের কাঠিন্য ও কর্কশতার জন্য সীতাকে সৃষ্ট করেন নাই; পরন্তু ফল-পুষ্পশোভিত মনোহর কাননসমূহে মৃগীগণের সহিত ক্রীড়া ও সরলহৃদয় তাপসকন্যাগণের সহিত বনে বনে বিচরণ ও পুষ্পাদি-চয়নের জন্যই তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন! বুঝি সীতার ভাগ্য রত্নৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ মধ্যে নিক্ষিপ্ত না হইয়া যদি বৃক্ষদলশোভিত মৃগপক্ষিসেবিত কোন নির্জ্জন আশ্রম মধ্যে পতিত হইত, তাহা হইলেই যেন সীতার জীবনের সার্থকতা-সম্পাদন হইত। কিন্তু পরমেশ্বর কুসুমকোমলপ্রাণা সীতাকে সংসারের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার নিমিত্ত অভিপ্রেত করিয়াছিলেন; আর সীতাও অন্তর্নিহিত অলৌকিক তেজোবলে আপনার ধর্ম্ম ও মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া চিরকালের জন্য সমগ্র স্ত্রীজাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন এবং অদ্যাপি নারীকুলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জগতে সম্পূজিত হইতেছেন।

রাজর্ষি জনক লোকমুখে প্রাণসমা দুহিতার প্রশংসা ও ঋষিগণের নিকট তাঁহার শুভলক্ষণাদির কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় পুলকিত হইতেন। সীতাও পিতার আদর ও যত্নে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। মলয়সমীরস্পর্শে পুষ্পমুকুল যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, সেইরূপ পিতার ধর্ম্মপ্রধান রাজসংসারে সীতার সুকোমল মনও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত

হইতে লাগিল। নিশাবসানে আলোক এবং অন্ধকার মিশ্রিত হইয়া যেমন বিশ্বমোহিনী ঊষার সৃষ্টি করে, সেইরূপ শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সীতাও স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। আর ফুটনোন্মুখ পুষ্পের দলে দলে সৌন্দর্য্য যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ বিকাশমান সীতাচরিত্রও কোমলতা ও মাধুর্য্যগুণে ভূষিত হইতে লাগিল। রাজর্ষি জনক এহেন দুহিতারত্ন কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, এই চিন্তায় মধ্যে মধ্যে আকুল হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় রাজগণ উপযুক্ত পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তাঁহারা কখন কখন কন্যাকে স্বয়ং পাত্রনির্ব্বাচন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেন; কখনও বা বলবীর্য্যের পরীক্ষা করিয়া আপনারাই পাত্র মনোনীত করিয়া দিতেন। তৎকালে শারীরিক বলবীর্য্যের অতিশয় সমাদর ছিল, এমন কি রমণীগণও বীর্য্যহীন কাপুরুষকে যারপরনাই ঘৃণা করিতেন। কন্যালাভবাসনায় ও বলবীর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার আশায়, নানাদেশ হইতে নরপতিগণ উপস্থিত হইয়া বীর্য্যপরীক্ষায় যোগদান করিতেন। যিনি সেই পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাঁহাকেই পুরস্কারস্বরূপ সেই দুর্লভ কন্যারত্ন সম্প্রদান করা হইত। বীর্য্যই তৎকালে কন্যার পাণিগ্রহণের একমাত্র শুল্ক ছিল। রাজর্ষি জনক উদ্ভিন্নযৌবনা সীতার নিমিত্ত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া বীর্য্যপরীক্ষাদ্বারাই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন।

একদা মহাবল শূলপাণি দক্ষযজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এক বৃহৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, "সুরগন, আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশদানে সম্মত হইতেছ না। অতএব, এই শরাসনদ্বারা আমি তোমাদিগকে এক্ষণেই বিনাশ করিব।" মহাদেবের এই কথা শুনিয়া দেবগণ স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন রুদ্র ক্রোধসম্বরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা হরধনু গ্রহণ করিয়া জনকের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ নিমির পুত্র দেবরাতের নিকট উহা ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া দিলেন। রাজর্ষি জনক এক্ষণে উক্ত ধনুর কথা স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি সেই হরকার্ম্মুকে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে তিনি সীতাকে সম্প্রদান করিবেন। অনন্তর সীতা বয়ঃপ্রাপ্তা ও বিবাহযোগ্যা হইলে অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সীতা বীর্য্যশুল্কা ছিলেন বলিয়া জনক কাহারও প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না।

কিয়দ্দিবসমধ্যে সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও গুণাবলির কথা দেশবিদেশে প্রচারিত হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জনকের পণও সকলে বিদিত হইলেন। কত দেশ হইতে কত নরপতি আসিয়া সীতালাভবাসনায় সেই হরকার্ম্মুকে জ্যারোপণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ বা উত্তোলন করিতে পারিলেন না, সুতরাং জনক তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনার কিয়ৎকাল

পরেই সাংকাশ্যা হইতে সুধন্বা নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি আসিয়া মিথিলারাজ্য অবরোধ করিলেন, এবং দূতদ্বারা জনকের নিকট সীতা ও হরধনু প্রার্থনা করিলেন। জনক তাঁহার প্রার্থনায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধের পর রাজর্ষি সুধন্বাকে সমরে নিহত করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া তাহা নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা মহাত্মা কুশধ্বজকে অর্পণ করিলেন।

এদিকে ভূপালগণও বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি মিথিলাধিপতি তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে অবমানিত করিবার জন্যই এরূপ কঠিন পণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাও সমবেত হইয়া বলপূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে মিথিলানগরী আক্রমণ করিলেন। আবার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রায় সম্বৎসরকাল রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া জনক অবশেষে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। জনক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু কিরূপে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে, এই চিন্তায় একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, রাজর্ষি জনক এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি নানাদেশস্থ ঋষি তপস্বী ও ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হইলে, যজ্ঞক্ষেত্র এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কোথাও ঋষিনিবাসসমূহ অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ; কোথাও ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বেদধ্বনি

করিতেছেন, এবং কোথাও বা যজ্ঞদর্শনার্থী প্রজাপুঞ্জ সমবেত হইয়া বিস্মিতহৃদয়ে অগ্নিকল্প ঋষিগণকে সন্দর্শনপূর্ব্বক নয়নমন সার্থক করিতেছে। বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠানে ও অভ্যাগত মহাজনগণের সৎকারে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে তিনি শ্রবণ করিলেন যে, সহচর ঋষিবর্গের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরোহিতগণকে অগ্রে লইয়া অর্ঘ্যহস্তে মহর্ষির প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং তাঁহার আগমনে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও যথাক্রমে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আহ্লাদসহকারে সহচরবর্গের সহিত জনকপ্রদত্ত আসনে সুখে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক সেই সহচরগণের মধ্যে অসি তূণ ও শরাসনধারী দুইটি বীর যুবককে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহাদের বিক্রম, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাদের গতি এবং দেবতার ন্যায় তাঁহাদের রূপ। তাঁহাদের সুকোমল অঙ্গে যৌবনশোভার আবির্ভাব হইয়াছে, দেখিয়া বোধ হইল যেন দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ কুমারদ্বয়ও সেই প্রদেশকে যারপরনাই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উভয়ের আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া রাজর্ষি বিনীতভাবে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তপোধন, আপনার সহচরবর্গের মধ্যে যে এই দুইটি কুমারকে দেখিতেছি, ইহাঁরা কাহার পুত্র? কি জন্যই

বা ইহাঁরা এই দুর্গমপথে পাদচারে আগমন করিলেন? আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে।”

তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া মৃদুমধুর বাক্যে তাঁহাদের বিবরণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি জনক সকলের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাজন্, আপনি যে এই কুমারদ্বয়কে দেখিতেছেন, ইহাঁরা অযোধ্যাপতি মহাত্মা দশরথের পুত্র। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে, রাজা দশরথ বৃদ্ধবয়সে পুত্রেষ্টি অনুষ্ঠান করিয়া চারিটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে এই দূর্ব্বাদলশ্যাম কমললোচন রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে সুশীল ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে তুল্যরূপ যমজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে এই কনককান্তি বীর কুমারের নামই লক্ষ্মণ। ইহাঁরা সকলেই প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী শাস্ত্রজ্ঞ ও ধনুর্বিদ্যাবিশারদ। ইহাঁদের পরস্পরের সৌভ্রাত্র জগতে অতুলনীয়; কিন্তু তাহা হইলেও লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের নিকটেই থাকিতে ভাল বাসেন। ইহাঁরা যেমন শান্ত ও সুশীল, তেমনিই অতিশয় পরাক্রমশালী। কিয়দ্দিবস হইল, আমি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম : কিন্তু মারীচাদি দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণ পাছে তাহার বিঘ্ন সমুৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় আমি মহারাজ দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার এই সিংহপরাক্রম পুত্র রামচন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করিলাম। রামের বয়ঃক্রম ঊনষোড়শ বর্ষমাত্র; ইহাঁকে রাক্ষসযুদ্ধে অসমর্থ ভাবিয়া দশরথ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। বৃদ্ধ নরপতি পুত্রস্নেহে বিমোহিত হইয়া প্রথমে আমার প্রস্তাবে কিছুতেই

সম্মত হইলেন না; কিন্তু তিনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, এই নিমিত্ত ধর্ম্মলোপভয়ে ভীত হইতে লাগিলেন; পরিশেষে কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের অনুনয়বাক্যে রামসম্বন্ধে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া, তিনি লক্ষ্মণের সহিত রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। লোকাভিরাম কুমারদ্বয় আপনাদের শান্তস্বভাব ও অনুপম সৌন্দর্য্যদ্বারা সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে করিতে পাদচারেই আমার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কোথাও মনোহর কানন, কোথাও পুণ্যসলিলা নদী, কোথাও বা রমণীয় আশ্রম দর্শন পূর্ব্বক রাম তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমিও সুমধুর বাক্যে তাহাদের পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে কুমারদ্বয়ের পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। কিন্তু পত্রদলশোভিত নবীন কদলীবৃক্ষ দারুণ আতপতাপে যেমন পরিম্লান হয়, সেইরূপ গমনশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় পাছে ইহাঁরা অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, এই নিমিত্ত আমি সরযূতীরে ইহাঁদিগকে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা প্রদান করিলাম। তাহাদের প্রভাবে ইহাঁরা ক্ষুৎপিপাসাবিরহিত হইয়া সুখে বিচরণ করিতে পারিবেন।

"অনন্তর পবিত্রসলিলা জাহ্নবী সমুত্তীর্ণ হইয়া আমরা জনসঞ্চারশূন্য এক ভীষণ অরণ্য দেখিতে পাইলাম। সেই বন নিরন্তর ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ এবং ভয়াবহ শ্বাপদকুলে সমাকীর্ণ। তাহার মধ্যে কোথাও নানাপ্রকার বিহঙ্গ ভয়ঙ্করস্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে, কোথাও বা সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও হস্তী প্রভৃতি

বন্যজন্তু সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। তাড়কানাম্নী ঘোরদর্শনা এক রাক্ষসী সেই অরণ্যে বাস করিত। তাহার দেহে সহস্র মাতঙ্গের বল ছিল এবং সে মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে দারুণ রাক্ষস-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারই মনোরম আশ্রম ধ্বংস করিয়াছিল। তাহার ভয়ে পথ জনশূন্য ও তাহার উৎপীড়নে প্রাণিকুল জর্জ্জরিত হইয়াছিল। আমি সেই রাক্ষসীর সবিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাহার বিনাশের নিমিত্ত রামকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলাম। রামও লোকহিতার্থ তাহার বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী সেই টঙ্কার লক্ষ্য করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল এবং ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অবশেষে রামচন্দ্র এক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন; রাক্ষসীও সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। রক্ষসী বিনষ্ট হইলে, আমি প্রীতমনে রামকে মন্ত্রসহ কতকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলাম।

"অনন্তর কিয়দ্দিবস মধ্যে আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে আমাদের রমণীয় আশ্রমে উপনীত হইলাম। রাম ও লক্ষ্মণের বাক্যে আমি সেই দিবসেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। আমি যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেছি, এমন সময়ে রাক্ষসেরা নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইল; চতুর্দ্দিক্ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দসকল উত্থিত এবং বেদির উপর জবাপুষ্পের ন্যায় ঘনীভূত রক্তবিন্দুসকল পতিত হইতে লাগিল। এই সকল উৎপাত দেখিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন যে, রাক্ষসেরা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া রাক্ষসগণের

সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মারীচকে অস্ত্রাঘাতে তিনি বহুদূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন এবং অপরাপর রাক্ষসগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমি রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। তাঁহারাও বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া আমার অন্য আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"রাজর্ষে, যজ্ঞসমাপন করিয়া আমি সহচর ঋষিবর্গের সহিত আপনার এই সুবৃহৎ যজ্ঞ দর্শনার্থ সমুৎসুক হইলাম। আপনার গৃহে সুরক্ষিত সেই বিচিত্র হরধনুর বিষয় স্মরণপূর্ব্বক আমি তাহার বিবরণ রাম ও লক্ষ্মণকে জ্ঞাপন করিলাম। ইহাঁরাও তাহা দর্শন করিতে একান্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলে, আমি ইহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই আপনার রাজ্যে আসিয়াছি। পথিমধ্যে বিশালা নগরীতে আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম, এবং রামচন্দ্র মিথিলার অনতিদূরে গৌতমাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবরূপিণী অহল্যাকে শাপমুক্তা করিয়াছেন। গৌতমী মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে রামের দর্শনকাল পর্য্যন্ত ত্রিলোকের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়া ভস্মাবলেপিতদেহে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে পবিত্র হইয়া স্বামীর সহিত তপশ্চরণ করিতে বনগমন করিয়াছেন। রাজন্, দশরথের এই তনয়যুগল বিচিত্র হরধনু দর্শন করিতে আপনার গৃহে আগমন করিয়াছেন; আপনি ইহাঁদের অভিলাষ পরিতৃপ্ত করিলে আমিও চরিতার্থ হইব।"

বিশ্বামিত্রের নিকট রাজকুমারদ্বয়ের এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি জনক অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাদের বিলক্ষণ প্রশংসা ও সমাদর করিলেন। পরদিন প্রভাতে বিশ্বা-

মিত্রের আদেশানুসারে জনক অনুচরবর্গকে হরধনু আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। যথাসময়ে ধনুক আনীত হইলে, বিশ্বামিত্র রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস, তুমি এক্ষণে এই হরশরাসন নিরীক্ষণ কর।" রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন ও ধনু অবলোকন করিয়া কহিলেন, "আমি এই দিব্য শরাসন পাণিতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন আমাকে কি ইহা উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে?" বিশ্বামিত্র ও জনক সম্মতি প্রদান করিলে রাম সেই ধনু গ্রহণ ও সকলের সম্মুখে অনায়াসেই তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণ ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শরাসন তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ঐ সময়ে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটী ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল; তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিচেতনপ্রায় হইলেন।

রাজা জনক ধনু দ্বিখণ্ড হইতে দেখিয়াই জানকীর পরিণয় সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় অপনীত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যেরূপ দাহিকা শক্তি আছে, সেইরূপ সুকুমার রামচন্দ্রের সুকোমল দেহেও সিংহের পরাক্রম দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভগবৎকৃপায় তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রিয়তমা জানকীও রামের সহিত পরিণীতা হইয়া পিতৃকুলে কীর্ত্তিস্থাপন করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজ দশরথকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন ও তাঁহাকে অনতিবিলম্বে মিথিলায় আনয়ন করিতে শীঘ্রগামী রথে দূতসকল প্রেরণ করি-

লেন। দূতেরাও যথাসময়ে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মহারাজকে ধনুর্ভঙ্গব্যাপার ও রামলক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

এদিকে ধনুর্ভঙ্গসংবাদ মিথিলানগরীর মধ্যে প্রচারিত হইবা-মাত্র হর্ষ-বিস্ময়-সম্বলিত এক মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সকলে এক বাক্যে রাজকুমার রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হওয়ায় প্রশস্ত রাজপথসকল পরিষ্কৃত, উন্নতানত স্থান সমূহ সমতলীকৃত এবং স্থলে স্থলে মনোহর তোরণসমূহ সুসজ্জিত হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ আপনাদের গৃহদ্বার পুষ্পমালা ও লতাজালে বেষ্টন করিল এবং নগরীর মধ্যে নিরন্তর মঙ্গলময় বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। জনকের অন্তঃপুরও বিবাহোচিত মাঙ্গল্যোৎসবে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

সীতার বয়ঃক্রম এ সময়ে কেবলমাত্র দশ বা একাদশ বর্ষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাম হরধনু ভগ্ন করিয়া পিতাকে প্রতিজ্ঞাপাশ ও চিন্তাজাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়াছেন ইহা শুনিয়া তিনি রামের প্রতি অনুরাগিণী হইলেন, এবং লোকমুখে ভাবী ভর্ত্তার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও অসামান্য পৌরুষের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় পুলকিত হইতে লাগিলেন। ফলতঃ, যে বয়সে, সীতার বিবাহ হইয়াছিল, সে বয়সে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সত্য বটে, সীতা এ পর্য্যন্ত রামকে একটীবারও নয়ন-গোচর করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বিবাহবিষয়ে যে কঠিন পণ করিয়া মিথিলাধিপতি অত্যন্ত বিমর্ষ হইতেন, সেই কঠিন পণ হইতে পিতাকে যিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি কুরূপ আর

স্বরূপই হউন, গুণবান্ আর নির্গুণই হউন, তিনিই যে ধর্ম্মতঃ সীতার পতি, এবং তিনিই যে সীতার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সীতা এই বয়সে আর কিছু বুঝিতে অক্ষম হইলেও, উক্ত সত্যটি যে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। পরে, তিনি স্বামীর রূপলাবণ্য, পৌরুষ ও পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া, ধনবানের অধিকতর ধনলাভের ন্যায়, আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ফলতঃ স্বামীর গুণাগুণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই আপনার একমাত্র দেবতা মনে করা স্ত্রীজাতির পক্ষে যে পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম, ইহা সীতা আপনার জীবনে পরে যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছিলেন, সামান্যা নারীর পক্ষে সেরূপ করা অতিশয় দুষ্কর কার্য্য। বাস্তবিক, পতিপরায়ণতাই সীতার মাহাত্ম্য, এবং সেই মাহাত্ম্যবলেই তিনি অদ্যাপি জগতে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

বাল্মীকি সীতার এ সময়ের মনোগত ভাবসমূহ বর্ণিত না করিলেও, তাঁহার চরিত্র পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া আমরা মানসচক্ষে তাঁহাকে যেন সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি। সীতার বালিকাসুলভ চপলতা কিঞ্চিৎ অপনীত হইয়াছে; মনোবৃত্তিসকল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ফুরিত হইতেছে, এবং তজ্জন্য গাম্ভীর্য্যও মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুপম চরিত্রকে স্পর্শ করিয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। সরলতা ও পবিত্রতাই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান উপাদান, কিন্তু তাহা হইলেও উষারাগরঞ্জিত প্রভাত যেমন সকলের মনোহর হয়, সেইরূপ

স্বর্গীয় লজ্জার কোমলস্পর্শে তাঁহার সৌন্দর্য্যেও দেবরাজ্যের ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়াতে, প্রতিভার দিব্য জ্যোতি মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিতেছে, এবং পবিত্রতা সুন্দর নয়নযুগল হইতে কোমল দীপ্তিরূপেই যেন উদ্ভাসিত হইতেছে! শুভ্র আলোক যেমন শুভ্র আলোকে মিশিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার নির্ম্মল মনোবৃত্তিনিচয় স্বভাবতঃই ধর্ম্মমুখীন হইয়াছে। পলিতকেশ, বালকের ন্যায় সরলস্বভাব, পবিত্রচেতা ঋষিগণের মুখে সীতা সর্ব্বদা মনোহর ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক উপাখ্যান শুনিয়া দিন দিন আপনার ধর্ম্মবৃত্তি সমুজ্জ্বল করিতেছেন, এবং জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও পবিত্র, তাহারই প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি সর্ব্বদাই ভক্তিমতী, দাসদাসীগণের প্রতি সদয়া ও মধুরভাষিণী, সখীগণের হিতকারিণী, এবং গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের একমাত্র স্নেহময়ী জননী। জ্যোৎস্নালোকে একটি শুভ্র পুষ্প যেন জনকের গৃহাঙ্গনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অথবা স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোন দেবকন্যা যেন কি এক মহদুদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত এই ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন! সীতার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবরূপিণী বালিকামূর্ত্তি সহসা ধ্যান পথে সমুদিত হইয়া আমাদিগকে কোন্ এক দেবরাজ্যে লইয়া যাইতেছে এবং ক্ষণকালের জন্যও এই শোকতাপময় অনিত্য সংসারকে আমাদের পাপকলুষিত মন হইতে ধীরে ধীরে অপ-সারিত করিতেছে। আমরা প্রফুল্লমনে সীতার এই কুমারীমূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অভিবাদন করি, এবং তাঁহার

অলৌকিক গুণাবলির আলোচনা করিতে করিতে হৃদয়মন পবিত্র করি।

সূর্য্য যেমন চন্দ্রকে শুভ্র জ্যোতি প্রদান করেন, সেইরূপ রাজর্ষি জনক শান্তস্বভাব পবিত্রচরিত্র রামচন্দ্রের হস্তে প্রাণতুল্য এই দুহিতারত্নকে সমর্পণ করিতে যত্নবান্ হইলেন। কিয়দ্দিবস মধ্যে ভরতশত্রুঘ্ন, কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অসংখ্য অনুচরের সহিত রাজা দশরথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। জনক দশরথের আগমনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার সমুচিত সংকার করিলেন এবং যজ্ঞসমাপনান্তে সীতার সহিত রামের ও তাঁহার অপরা তনয়া উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র একত্র পরামর্শ করিয়া জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মশীল কুশধ্বজের রূপবতী দুইটি কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজর্ষি জনক তাঁহাদের এই সুসঙ্গত প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। রাজা দশরথও পুত্রগণের একই সময়ে এবং একই স্থলে বিবাহ হইবে শুনিয়া যার-পরনাই আনন্দিত হইলেন।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে, রাজকুমারগণ সুন্দর বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের সহিত বিবাহস্থলে উপনীত হইলেন। রাজকন্যারাও নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া জনকের সঙ্গে তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বেদিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপরি বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিলে, রাজা জনক লজ্জাবনতমুখী সীতাকে রামের অভিমুখে

ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন "রাম, এই সীতা আমার দুহিতা; ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি পাণি দ্বারা ইঁহার পাণি গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। এই মহা-ভাগা পতিব্রতা হউন, এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগত থাকুন।" (১।৭৩) রাজর্ষি এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। সভাস্থ সকলে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি-লেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক রামচন্দ্রকে এইরূপে সীতা সম্প্রদান করিয়া আনন্দিত মনে লক্ষ্মণের হস্তে উর্ম্মিলাকে, ভরতের হস্তে মাণ্ডবীকে এবং শত্রুঘ্নের হস্তে শ্রুতকীর্ত্তিকে সমর্পণ করিলেন। রাজ-কুমারেরাও ভগবান্ বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটি কুমারীর পাণি-গ্রহণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, সঙ্গীত ও বাদিত্র-বাদন হইতে লাগিল এবং লোকের এক মহান্ আনন্দকোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। রাজা দশরথ শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া নববরবধূসমাগমে প্রফুল্লচিত্তে নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

সীতা ভর্ত্তার সহিত সমাগত হইয়া এই প্রথম তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বালিকাহৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। সীতা দেখিলেন যে, রামচন্দ্র নবযৌবনে এই পদার্পণ করিতেছেন; দেবতার সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহে ফুটিয়া উঠিতেছে; সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল অতুল শক্তির আধারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; সুন্দর ভ্রূযুগলে মানসিক তেজ ও চরিত্রের দৃঢ়তা যেন সঞ্চিত রহিয়াছে, সুচারু নয়নযুগল হইতে

প্রতিভা প্রদীপ্ত হইতেছে এবং এক দিব্য জ্যোতি মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে। মূর্ত্তি সৌম্য ও প্রসন্ন, দেখিলেই নিরানন্দমনে আনন্দের সঞ্চার হয়, অপবিত্র ভাবসমূহ লজ্জিত হয়, ও সাধুভাব উজ্জীবিত হয়; যতবার দেখা যায়, কিছুতেই নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না এবং দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিতেই ইচ্ছা হয়। সীতা তাঁহার দেবরূপী স্বামীকে সন্দর্শন করিয়াই ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন এবং আপনাকে চিরকালের জন্য তাঁহার চরণতলে সমর্পণ করিলেন।

রামও নবপরিণীতা সীতাকে একটীবার মাত্র নয়নগোচর করিয়া হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিলেন। সীতার সরল পবিত্র মূর্ত্তি রামের নির্ম্মল হৃদয়পটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। রাম এই মূর্ত্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিলেন; ইহা আর ক্ষণকালের জন্যও কখন তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

বিবাহের পরদিন বরবধূর বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল। জনক কন্যাধনস্বরূপ অসংখ্য গো, অশ্ব, হস্তী, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রজত, নানাবিধ রত্ন, উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, বহুমূল্য বস্ত্র, রথ, পদাতি এবং প্রত্যেককে শতসংখ্য সখী ও দাসদাসী প্রদান করিলেন। তিনি দশরথের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া আনন্দের প্রতিমা প্রিয়তমা দুহিতাকে অশ্রুর সহিত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। চন্দ্রশূন্যা হইয়া পৃথিবী যেমন অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জনকের রাজসংসারও একমাত্র সীতার অভাবে নিরানন্দ হইল। তত্বজ্ঞ রাজর্ষি শোকাবেগ রুদ্ধ করিয়া নির্লিপ্তের ন্যায় পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্র ও বধূগণের সহিত মহানন্দে রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ভীম-দর্শন পরশুরাম রামচন্দ্রের বলবিক্রমে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিনাশসাধনে যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু তিনিই পরিশেষে দশরথ-তনয়ের বলে পরাস্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজকুমার-গণের আগমনসংবাদে অযোধ্যানগরী আনন্দোৎসবে পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিল। রাজমহিষীরা পুত্র ও পুত্রবধূগণের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই পুলকিত হইলেন। রাজা দশরথ এইরূপে পুত্রগণের শুভপরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্যকর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

একটী ক্ষুদ্র তটিনী পর্ব্বতের নিভৃতদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল জলরাশি প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে পতিত হইয়া কোথাও শ্বেত ফেনপুঞ্জ উদ্গিরণ করিতেছে, কোথাও ক্ষুদ্র আবর্ত্তসকল উৎপন্ন করিয়া চঞ্চলস্বভাবা অভিমানিনী বালিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, কোথাও শ্যামতৃণদলশোভিত প্রশস্ত ক্ষেত্র মধ্যে উপস্থিত হইয়া স্থির ও গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছে, আর কোথাও বা নিবিড়-বনরাজিপরিপূর্ণ তটযুগলের মধ্যে বনজাত সুরভি কুসুমের পরাগ মাখিয়া কুলুকুলুতানে আনন্দে যেন নৃত্য করিতে করিতেই ছুটিয়াছে। পর্ব্বতদুহিতা এই ক্ষুদ্রকায়া তটিনী কি মনোহারিণী! দেখিতে দেখিতে তাহার নির্ম্মল জলরাশি এক বৃহৎ নদবক্ষে মিলিত হইল। নদ প্রীতমনে তটিনীর আবেগময় জলোচ্ছ্বাস স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিল; কিন্তু তাহা ধারণ করিতে গিয়া তাহার বিশাল হৃদয় যেন বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। উভয়ের জলরাশি একত্র সম্মিলিত হইয়া ভীমকায় ধারণ করিল বটে, কিন্তু তটিনীর ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বিশাল নদবক্ষে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! অনন্তর মহানদ কৃশাঙ্গী তটিনীর নববলে বলীয়ান্ হইয়া মহোৎসাহে কত শ্যামল ক্ষেত্র প্লাবিত করিল, কত গ্রাম নগর ও জনপদের পদপ্রান্ত বিধৌত করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে

লাগিল, এবং পরিশেষে মহিমায় অনন্তসাগরের সহিত আপনাদের অস্তিত্ব মিশাইয়া জীবন যেন সার্থক করিল।

এই নদ ও তটিনীর মিলনপ্রসঙ্গ কি মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ! পবিত্রস্বভাবা বালিকা জীবনের মধুর প্রভাতকালে ফুল কুড়াইয়া, পক্ষীর কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, হরিণশিশুর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া কখনও চঞ্চল এবং কখনও গম্ভীরভাব ধারণ করিতে থাকে। এই বিশাল সংসারমধ্যে পরমেশ্বর তাহার ক্ষুদ্র জীবনের যে কর্ত্তব্যটুকু নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার পালনের জন্য সেই বালিকাজীবন দিন দিন প্রস্তুত হয়। যথাসময়ে বালা আপনার অনুরূপ এক যুবকের হস্তে প্রদত্ত হইয়া তাঁহাকেই জীবনমন অর্পণ করে; বালিকা আপনার স্বাতন্ত্র্য সেই পতি-রূপিণী প্রত্যক্ষ দেবতার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া ধন্যা হয়। অনন্তর উভয়ে পরস্পরের প্রীতি ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যথাসাধ্য সংসারধর্ম্ম পালন করে। পরে সংসারের কার্য্য শেষ করিয়া দম্পতিযুগল আপনাদের অস্তিত্ব মহান্ পরমেশ্বরের মহাসত্ত্বে নিমজ্জিত করিয়া চরিতার্থ হয়।

আমাদের সীতাদেবীর নির্ম্মল জীবনস্রোত পবিত্রহৃদয় রাম-চন্দ্রের জীবনস্রোতে ধীরে ধীরে মিলিত হইল। তরঙ্গে তরঙ্গে আলিঙ্গন করিল; জলরাশি জলরাশির সহিত মিলিত হইয়া সমভাব প্রাপ্ত হইল, এবং যেদিকে স্বামীর জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল, সেইদিকে সীতাও আপনাকে ভাসমান করিলেন। সীতার আর স্বাতন্ত্র্য নাই। সীতা যখন একবার স্বামীর সহিত মনে মনে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইলেন, তখন কি আর তিনি

ইহজীবনে বা পরজীবনে কখনও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন? এ বিচ্ছেদ জগতে অসম্ভব, এবং পরমেশ্বরেরও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। গঙ্গাযমুনার সম্মিলনের পর গঙ্গাজল হইতে কি যমুনাজল কখনও পৃথক্ করা যায়? পুণ্যসলিলা এই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল যেমন পবিত্র, দুইটি মানবের জীবননদীর সঙ্গমও সেই-রূপ বা ততোঽধিক পবিত্র! এই পবিত্র সঙ্গমের নাম বিবাহ। যাঁহারা বিবাহরূপ এই অভিনব পুণ্যতীর্থের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বিচ্ছেদ বা অন্য কোন প্রকার মিলনের কথা একেবারে অসম্ভব মনে করেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাই তাঁহারা অসদ্বস্তুর ন্যায় পরিহার করিয়া থাকেন।

স্বামীর জীবননদী প্রবাহিত হইতে হইতে বালুকাময়ী মরুভূমির মধ্যেই বিশুষ্ক হউক, অথবা নবতেজে ও নবোৎসাহে নানা দেশ ও নগর প্লাবিত করিতে করিতে মহাসাগরের দিকেই প্রধাবিত হউক, সহধর্ম্মিণী চিরকালই তাঁহার সহচারিণী। স্বামী সুখেই থাকুন আর দুঃখেই থাকুন, পত্নী চিরকালই তাঁহার অনুগামিনী। স্বামী সদয় হউন আর নির্দ্দয় হউন, অনুকূল হউন আর প্রতিকূল হউন, তিনিই পত্নীর একমাত্র দেবতা। স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন না করেন, স্ত্রী কি আপনার কর্ত্তব্য কখনও ভুলিতে পারেন? পতিব্রতা প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া স্বামীর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য কায়মনো-বাক্যে পালন করিয়া থাকেন; পতিপরায়ণতাই তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; সুতরাং সে ধর্ম্ম তিনি নিজ জীবনে সাধন করিতে যত্ন করেন, এবং মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাকে যে অবস্থাতে

রাখিয়া দেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া জগতে কীর্ত্তিস্থাপন করেন। আমাদের সীতাদেবী স্বামীর সহিত সঙ্গত হইলেন; অতঃপর তিনি পাতিব্রত্যধর্ম্ম কিরূপে পালন করেন, তাহা দেখা যাউক।

একটী ক্ষুদ্র পুষ্পমুকুলের দলগুলি ভিন্ন হইতে হইতে যেমন তন্মধ্যে ধীরে ধীরে সুবাস সঞ্চিত হয়, সেইরূপ বিবাহের পর সীতাদেবী বিকাশমান হৃদয়পুষ্পে এক দিব্য সৌরভ অনুভব করিলেন। সে সৌরভে তাঁহার প্রাণ আমোদিত হইল; তিনি যেন কি একটী আশ্চর্য্যভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কখন যে তিনি এরূপ ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে হইল না; ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অভিনব বলিয়াই বোধ হইল! সীতা সে ভাব সকলের কাছে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। সীতার অসামান্য প্রফুল্লতা, স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহদ্বারা তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল; রামের বিষয় মনোমধ্যে ধ্যান করিতে করিতে সীতা যে অন্যমনস্কা হইয়া পড়িতেন, তদ্দ্বারা সে ভাব অপরিস্ফুট রহিল না; সখীগণের নিকট রামের কথা বলিতে তিনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এবং রামের প্রশংসা যেরূপ অবিতৃপ্তভাবে শ্রবণ করিতেন, তদ্দ্বারাও তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সীতা রামের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সহসা যে চক্ষুর্দ্বয় স্বপদে নিহিত করিতেন, এবং কখন কখন নয়নযুগল হইতে যে এক মদিরাময় আলোক নিঃসৃত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিত, তদ্দ্বারাও রাম

তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। সীতা কোন মতেই এই অভিনব মনোভাব লুক্কায়িত করিতে সমর্থ হইলেন না। সীতা ধীরে ধীরে কৈশোর ত্যাগ করিয়া যেমন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে লাগিলেন, অমনই তাঁহার হৃদয়েও পবিত্র-প্রেমের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে উচ্ছ্বাসে সীতার আপন বলিতে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ভাসিয়া গেল; সীতা আপনাকে ভুলিয়া কেবল রামময়প্রাণা হইয়াই জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

দর্শনমাত্রেই বিশুদ্ধস্বভাব রামচন্দ্রের নির্ম্মল হৃদয়ে সীতার পবিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। রাম সযত্নে সে মূর্ত্তি অন্তরের পুষ্পময় নিভৃত দেশে ধারণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত ধ্যান করিতেন। যতই তিনি জনকতনয়ার অনুপম চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি রামচন্দ্রের স্বাভাবিক অনুরাগ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাম সেই সুরবালার ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী সীতাকে তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা করিলেন; তিনি দিন দিন সেই কৃশাঙ্গী নবযৌবনার বড়ই পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন। সীতার বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়া যাইত; অথবা হৃদয়-কুটীরে সীতার স্থান ছিল বলিয়া রাম সযত্নে তাহা নির্ম্মল ও পরিচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। রাম বাল্যকাল হইতেই লোকহিতকর কার্য্যসমূহে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; তিনি প্রজাপুঞ্জকে অতিশয় স্নেহদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন, এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহাদের হিতসাধনে যত্নবান্ হইতেন। এই সকল কারণ-

পরম্পরায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। বিবাহের পর হইতে রাম পরোপকারে যেন অধিকতর আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার অনুরাগ যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং ধনুর্বিদ্যানুশীলনে উৎসাহাগ্নি যেন শতগুণে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রাম পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি যেন অধিকতর কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিলেন, দেবদ্বিজগণের প্রতি যেন অধিকতর ভক্তিমান্ হইলেন এবং বয়স্যগণের মধ্যে যেন সমধিক স্ফূর্ত্তি ও প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম বুঝিতে লাগিলেন, তাঁহার জীবন যেন কঠোর কর্ত্তব্যময়; কিন্তু সে কঠোরতায় কেমন কমনীয়তা আছে! তাঁহার জীবন যেন একটী মহৎ ব্রত, কিন্তু সে ব্রতোদ্‌যাপনে কত সুখ ও আনন্দ আছে! রাম তাঁহার জীবনের এই অভিনব পরিবর্ত্তন অনুভব করিলেন, এবং সীতাদেবীই যে এই পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ, তাহাও স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সীতা যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে রামকে এই সমস্ত সৎ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু রাম দেখিয়াছিলেন যে, একমাত্র সীতার বিদ্যমানতাই সমস্ত সদনুষ্ঠানের যথেষ্ট কারণ; সীতার নিশ্বাসে সৌরভ ছুটিতে থাকে, সীতার বাক্যে অমৃত বর্ষণ হয়, এবং সীতার কোমলচরণস্পর্শে মরুভূমিও পুষ্পময়ী হইয়া উঠে! সীতাকে ভালবাসা একটী মহতী সাধনা; সমস্ত নীচবাসনা ও কুপ্রবৃত্তি দমন না করিলে, তাঁহাকে ভালবাসা যায় না, অথবা তাঁহাকে একবার ভালবাসিতে পারিলে, সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায়, তাহারা আপনাআপনিই কোথায়

অন্তর্হিত হইয়া যায়! রামচন্দ্র সীতার নির্ম্মল আত্মার সহিত স্বকীয় আত্মার সুদৃঢ় যোগ অনুভব করিলেন এবং বুঝিলেন যে, এ যোগ অনন্তকালের জন্য, কখনও কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।

বিবাহের পর রামের বাসের জন্য এক স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাম রাজকার্য্যবিষয়ে পিতার সহায়তা এবং মাতৃগণের সেবা শুশ্রূষা করিয়া সামান্য অবসর পাইলেই সীতার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি প্রীতিবিস্ফারিত-লোচনে প্রিয়তমা জানকীর সহিত কত মনোহর গল্প করিতেন, কত সাধুপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন, সীতাকে কত নীতিগর্ভ শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করাইতেন এবং পাতিব্রত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কত সদালোচনাই করিতেন। সীতার কর্ণযুগল রামের সেই অমৃতময়ী বাণী অতৃপ্তরূপে পান করিত। সীতাও কখন কখন রামের নিকট তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেন; ঋষিগণের মুখে তিনি কেমন আশ্রমের বর্ণনা শুনিতেন, তাঁহার আশ্রমদর্শনলালসা এখনও কেমন বলবতী; এখনও রামের সহিত পুষ্পিত কাননসমূহে ভ্রমণ করিতে সীতার কত ইচ্ছা হয়; রাম কোন দিন আশ্রমপর্য্যটনের সময় সীতাকে কি দয়া পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন? সরলা সীতা রামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আনন্দের কারণ হইতেন। রামও দেবরূপিণী জানকীর যথেষ্ট সমাদর করিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন।

লক্ষ্মণ রামের অতিশয় অনুগত ছিলেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতঃ রামের পক্ষপাতী ও তাঁহার প্রতি অতিশয়

অনুরাগবান্। রাম যেখানে যাইতেন, লক্ষ্মণও ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক সেখানে তাঁহার অনুসরণ করিতেন। লক্ষ্মণ ব্যতীত রামও অধিকক্ষণ কোথাও থাকিতেন না এবং কোন কার্য্যই করিতেন না। লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে সমুচিত ভক্তি করিতেন এবং সুমিত্রা হইতে তাঁহাকে কখনও বিভিন্ন ভাবিতেন না। সীতাদেবীও লক্ষ্মণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন।

সীতা কৌশল্যা প্রভৃতি শ্বশ্রূগণকে যার পর নাই ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিতে পারিলে, তাঁহার অন্তরে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইত। শ্বশ্রূগণও সীতাকে কন্যাপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন; সীতা শ্বশুরালয়ে আসিয়া অবধি একটি দিনও জনক-জননীর অভাব অনুভব করেন নাই। বাস্তবিক সীতা সকলের এমনই প্রিয়পাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার অলৌকিক রূপ ও পবিত্রতাতে গৃহের এমনই অপূর্ব্ব শ্রী হইত, যে আলোক ব্যতীত গৃহ যেমন অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ সীতার অভাবে সেই সুবৃহৎ রাজনিকেতনও শূন্য বোধ হইত।

এইরূপ বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। কালের অবিশ্রান্ত গতিতে দেখিতে দেখিতে সীতার বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। সীতাদেবী এখন আর সেই কচিৎ চাপল্যময়ী, কচিৎ গাম্ভীর্য্যশালিনী বালিকা নহেন; নবযৌবনসমাগমে লজ্জাস্পর্শে তাঁহার যেরূপ শোভা হইত, সে শোভাও এখন আর নাই। তিনি এখন যৌবনসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী, কিন্তু বালিকাবয়সের সেই সরলতা ও পবিত্রতা তাঁহার মুখমণ্ডলে তেমনই প্রদীপ্ত রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যে

চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই; বিদ্যুল্লতা যেন স্থির ও গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছে! এই গাম্ভীর্য্যহেতু সীতাদেবী সাধারণের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন। সহসা তাঁহাকে দেখিলে মনে ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময়ের আবির্ভাব হইত; কিন্তু যাহারা নিয়ত তাঁহার পবিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারা তাঁহার দেব-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া ভক্তি ও আনন্দরসে আপ্লুত হইতেন। মহাবাহু রামচন্দ্র জানকীর প্রতি উত্তরোত্তর শ্রদ্ধাবান্ হইতে লাগিলেন; উভয়ের প্রেম ও প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উভয়ে অভিন্নহৃদয় হইলেন। রাম জানকীর অভিপ্রায় যেমন স্পষ্টই জানিতেন, সুরূপা জানকীও সেইরূপ অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে রামের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। এইরূপে সুখে ও সন্তোষে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে তাহাদের জীবননাটকে একটী নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হইল।

মহারাজ দশরথ বৃদ্ধবয়সে রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি চারিটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চারিটি পুত্রকেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। পুত্রেরাও সকলেই সুশীল, সচ্চরিত্র ও পিতার প্রতি সমান ভক্তিমান্ ছিলেন। কিন্তু তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের যেমন শোভা হয়, সেইরূপ ভ্রাতৃগণের মধ্যে রামই অতিশয় শোভা পাইতেন। তিনি যেমন প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী ছিলেন, সেইরূপ সত্যব্রত ও পরাক্রমশালীও ছিলেন; শাস্ত্রে ও শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার যেরূপ পারদর্শিতা ছিল, সেইরূপ বিনয় ও ক্ষমতাও তাঁহার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার হইয়াছিল। তিনি এক দিকে প্রজা-কুলের হিতসাধনে যেমন সর্ব্বদাই রত থাকিতেন, সেইরূপ

অশিষ্ট ও দণ্ডার্হের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদাও রক্ষা করিতেন। তিনি যেমন প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনের বিবিধ উপায় সুন্দররূপে অবগত ছিলেন, সেইরূপ সর্ব্ববিষয়ে ধর্ম্মকেই জয়যুক্ত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। রাম নৃপতিদুর্লভ এই সমস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকৃতি-বর্গের এবং বিশেষতঃ পিতৃদেবের অতিশয় প্রিয়ভাজন হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক, প্রজাপুঞ্জ যেন বৃদ্ধমহারাজ দশরথ অপেক্ষাও রামের প্রতি সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল! এদিকে মহারাজও প্রিয়তম রামচন্দ্রকে ঈদৃশ লোকপ্রিয় দেখিয়া মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তিনি আর পূর্ব্ববৎ রাজ্যপালনে সমর্থ ছিলেন না, সুতরাং লোকাভি-রাম রামচন্দ্রকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এতদুদ্দেশে তিনি অনতি-বিলম্বে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কোশল রাজ্যের নানা নগর ও জনপদ হইতে অধীন রাজা, সামন্ত ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করাইলেন এবং মর্য্যাদানুসারে তাঁহা-দিগকে বাসগৃহ ও নানাপ্রকার আভরণ প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ প্রবলপ্রতাপান্বিত হইলেও প্রজারঞ্জনবৃত্তি তাঁহাদের অন্তরে বড়ই বলবতী ছিল। প্রজাপুঞ্জ রাজগণকে দেবতুল্য জ্ঞান ও পূজা করিত; আর তাঁহারাও কদাপি যথেচ্ছাচারী হইতেন না। তাঁহারা সুদক্ষ সচিববর্গের পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না; এবং রাজ্য-সম্বন্ধীয় গুরুতর কর্ত্তব্যবিষয়ে রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণেরও

পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই আহূত ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতেন এবং রাজভয়ে ভীত হইয়া কখন কোনও অন্যায় কার্য্যের পোষকতা করিতেন না। রাজগণকেও ইহাঁদের মতামতের উপর শ্রদ্ধাবান্ হইয়া চলিতে হইত। মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষে, এই প্রথানুসারেই, স্বরাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করাইয়া সকলের সহিত সভাভবনে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর সভাভবনে সকলে সমবেত হইয়া উপবেশন করিলে, মহারাজ গম্ভীরস্বরে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদবর্গকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ-পূর্ব্বক রাজ্যের অবস্থা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন; তিনি রাজ্যের কল্যাণকামনায় শরীরক্ষয় করিয়া বহুসংখ্যক বৎসর রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অবসর গ্রহণের অভিলাষী হইয়াছেন। রামচন্দ্র এই গুরুভারবহনের উপযুক্ত কি না, অথবা তদপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ আছেন কি না, এতৎসম্বন্ধে দশরথ সকলের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন।

দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সভামধ্যে এক তুমুল হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ সকলে সমস্বরে "রামচন্দ্রকেই রাজ্যভার প্রদত্ত হউক" এই কথা মহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন, এবং দশরথের সমক্ষে রামের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে নির্ব্বাচিত করিবার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করিলেন।

তখন রাজা দশরথ পারিষদবর্গ ও প্রজাসাধারণের বাক্যে প্রীত হইয়া তদ্দণ্ডেই রামের রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া দিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা তাহা শ্রবণ করিয়া হর্ষোল্লাসে নিমগ্ন হইল। অযোধ্যানগরী উৎসব-তরঙ্গে ভাসমান হইল। সর্ব্বজনপ্রিয় রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গৃহমালা সুধাধৌত ও গৃহচূড়ে বিচিত্র বর্ণের ধ্বজপতাকাসকল উড্ডীন হইতে লাগিল। কেহ কেহ বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া, কেহ নৃত্যগীতে নিমগ্ন হইয়া এবং কেহ কেহ বা দরিদ্রগণের মধ্যে ধনরত্ন বিতরণ করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকটিত করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই আনন্দচিহ্ন বিরাজিত, কোথাও নিরানন্দের ছায়ামাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। মহারাজ দশরথের আদেশে রাজপথসকল পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত হইল এবং অভিষেকোপযোগী দ্রব্যসমূহ সংগৃহীত হইতে লাগিল। কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ শুভক্ষণে রামচন্দ্রের অধিবাসোচিত সমস্ত ক্রিয়া সমাপন করিলেন। সীতাদেবী স্বামীর সহিত ঈশ্বরোপাসনায় প্রায় সমস্ত নিশা যাপন করিলেন এবং উভয়ে প্রশান্তচিত্তে আপনাদের গুরুভার বহনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সীতাদেবী রাজবধূর পদ হইতে রাজমহিষীর পদে সমুন্নীত হইতেছেন, এই চিন্তায় কি তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন? সামান্যা নারীর ন্যায় সীতার প্রকৃতি ছিল না। আত্মসম্মান ও পদগৌরবের কথা একটীবারও সীতার মনে সমুদিত হয় নাই। সীতা আপনার বিষয় কিছুই ভাবিতেন না। পতির সুখ ও

মঙ্গলচিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তাতে তাঁহার আনন্দ হইত না, বরং সেরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া তিনি পাপ মনে করিতেন। সীতা "আমিত্ব" ও "আপনত্ব" বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র স্বামীর জন্যই জীবনধারণ করিতেন। স্বামীর প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া সীতা আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছিলেন; সুতরাং স্বামীতে ও তাঁহাতে আর কোন বিভিন্নতা ছিল না। এই নিমিত্ত পতির সুখ ও আনন্দে সীতা আনন্দিত হইতেন এবং পতির দুঃখ ও বিপদে সীতা ম্রিয়মাণ হইতেন। আজ সীতা রাজমহিষী হইবেন বলিয়া তাঁহার মনে বিশেষ কোন উল্লাস নাই, আর কাল যদি স্বামীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি পথের ভিখারিণী হন, তাহাতেই কি নিজের জন্য তাঁহার কোন কষ্ট হইবে? তবে ইহা সত্য বটে যে, স্বামীর মনোগত ভাবের সহিত তাঁহারও মনোগত ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই নিমিত্ত রামের হৃদয়ে যখন সে ভাব তরঙ্গায়িত হইত, সীতার হৃদয়েও তখন সে ভাবের উচ্ছ্বাস বহিত। আজ হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা প্রেমময় জীবিতনাথ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালনব্রতে দীক্ষিত হইবেন, এই চিন্তায় সীতার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, রাজমহিষী হইবেন বলিয়া সীতার কিছুমাত্র আনন্দ হয় নাই। সীতার চরিত্রগত এই বিশেষত্বটি স্মরণ রাখিলে, সীতার মাহাত্ম্য বুঝিতে বড় বিলম্ব হয় না।

রাত্রি প্রভাত হইতেছিল। এই শুভদিনে রামচন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন। সুষুপ্তা নগরী এতক্ষণ মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট ছিল, ক্রমে ক্রমে যেন তাহাতে জীবনী শক্তির সঞ্চার

হইতে লাগিল। বিহঙ্গমকুল মঙ্গলময় কোলাহল করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মমুহূর্তে ঈশ্বরপরায়ণ সাধুমহাত্মগণের কণ্ঠ হইতে স্তুতিগান নিঃসৃত হইয়া বায়ুমণ্ডল বিকম্পিত করিল। জনসাধারণ ধীরে ধীরে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিনের আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করিল। কল্লোলময় সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায় আবার সেই মহানগরী হইতে হর্ষকোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। বন্দিগণ রামচন্দ্রের স্তুতিগান আরম্ভ করিল। দম্পতীযুগল সমস্তনিশা ঈশ্বরপূজায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; প্রভাতে শুচি ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া প্রশান্তমনে তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের নির্দ্দিষ্টকাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র আসিয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন, এবং মহারাজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন, এই কথা নিবেদন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সংসারে এক জাতীয় লোক এমন জঘন্য প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদিগকে মন্দ দৃষ্টান্ত দ্বারা কখন অসৎ করিতে হয় না, তাহারা স্বভাবতঃই অসৎ। যেখানে যাহা কিছু কুৎসিৎ ও ঘৃণ্য আছে, তদ্দ্বারাই তাহারা আপনাদের প্রকৃতি পুষ্ট করিয়া থাকে ; সুবস্তু দিলে তাহারা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, অথবা আপনাদের দূষিত নিশ্বাসবায়ুদ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা নষ্ট করে। এই প্রকৃতির লোকেরা সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার একান্ত বিরোধী। সৌন্দর্য্য তাহারা দেখিতে পায় না, পবিত্রতা তাহারা বুঝিতে পারে না ; তাহারা চতুর্দ্দিকে কেবল আপনাদের আবিল হৃদয়েরই প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। পরের সুখ ও আনন্দ দেখিলে ঈর্ষাগ্নি তাহাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়, নিষ্কলঙ্ক সাধুতা দেখিলে তাহারা আপনাদের কলুষিত কল্পনা দ্বারা তাহা কলঙ্কিত করে, এবং জগতে অসাধুতা ও পাপের রাজ্য বর্দ্ধিত হইতে দেখিলে তাহাদের নিকট উল্লাসের আর সীমা থাকে না। কেহ অপকার না করিলেও, তাহারা তাহার অপকার করে এবং স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে পরের সুখ দুঃখের প্রতি কদাচ দৃষ্টিপাত করে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই প্রকৃতির লোকেরা মানবসমাজের কলঙ্কস্বরূপ এবং ইহাদের দ্বারাই মানবের সমুদয় অকল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে।

মন্থরা এই জঘন্য প্রকৃতির রমণী। মন্থরা কুব্জা ও বৃদ্ধা, সুতরাং দেখিতে অতিশয় কুরূপা। বাল্মীকি তাহার অন্তরের পরিচয় দিবার জন্যই যেন তাহাকে অতিশয় কুৎসিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কুব্জা মহিষী-কৈকেয়ীর পরিচারিকা; কৈকেয়ী পিত্রালয় হইতে ইহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং মন্থরা কৈকেয়ীর বড়ই শুভাকাঙ্ক্ষিণী। কৈকেয়ী যে উপায় অবলম্বন করিলে, মহারাজের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন. মন্থরা তাঁহাকে সে উপদেশ প্রদান করিত। কৈকেয়ী রাজকন্যা, সুতরাং তাঁহাকে স্বভাবতঃই উন্নতমনা মনে করা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিক, তিনি অতিশয় উচ্চপ্রকৃতির নারী না হইলেও, নারীসাধারণের অপেক্ষা কোন মতেই নিকৃষ্টতর ছিলেন না। তিনি নীচতাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না। স্বয়ং সদসৎ বিষয়ের বিচার করিয়া তিনি কখন কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না; এই নিমিত্ত তিনি মন্থরার উপদেশের উপর অতিশয় নির্ভর করিতেন এবং সর্ব্ববিষয়ে তাহার কূটবুদ্ধি দ্বারাই আপনাকে পরিচালিত হইতে দিতেন। কৈকেয়ীর ইহাতে কোন উপকার না হইয়া বরং অপকারই অধিক হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই মন্থরা অতিশয় বুদ্ধিশালিনী; তাহার বুদ্ধি দূরদর্শিনী ও সূক্ষ্মগামিনী। কৈকেয়ী আপনার মঙ্গলামঙ্গলের কথা বড় চিন্তা করিতেন না, কিন্তু মন্থরার প্ররোচনাতেই যুবতী মহিষী বৃদ্ধ মহারাজকে আপনার করায়ত্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, দশরথ অন্যান্য মহিষী অপেক্ষা কৈকেয়ীর প্রতিই সমধিক অনুরাগ প্রকাশ

করিতেন। কৌশল্যা তাঁহার মান্যা ছিলেন বটে, কিন্তু কৈকেয়ীই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী।

মহিষীগণ অন্তর্বত্নী হইলে, মন্থরার মনে একটি গুরুতর আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কৈকেয়ীর পুত্র সর্ব্বাগ্রে সঞ্জাত না হইয়া অন্য কোন মহিষীর পুত্র জন্মিলে, কৈকেয়ীর রাজমাতা হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না! মন্থরার যাহা আশঙ্কা, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাই ঘটিয়া গেল। ভরত জন্মানুক্রমে রাজার দ্বিতীয় পুত্র হইলেন। কৈকেয়ী সুশীল পুত্র লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, মন্থরার ন্যায় দূরদর্শননিবন্ধন সে আনন্দসম্ভোগে কিছুমাত্র বঞ্চিত হন নাই। তিনি মহারাজের অন্যান্য পুত্রগণকেও নিজ পুত্রের ন্যায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ রামের সাধুতা, সত্যপরায়ণতা ও ভ্রাতৃবৎসলতা দেখিয়া, তাঁহার গুণের বড়ই পক্ষপাতিনী ছিলেন। রাম যখন সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন, তখন কৈকেয়ীর স্নেহভাজন হইবেন না কেন? এ পর্য্যন্ত রামের প্রতি কৈকেয়ীর মনে কোন বিরুদ্ধভাব উৎপন্ন হয় নাই। দুষ্টা মন্থরা হলাহল উদ্গিরণ করিয়া এখনও কৈকেয়ীর সরল মন বিষাক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। মন্থরা বুদ্ধিমতী, তাই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল; এমন সময়ে, দৈবক্রমে সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র, অযোধ্যা-নগরী হইতে এক মহান্ উৎসবকোলাহল সমুত্থিত হইয়াছিল। মন্থরা সেই কোলাহলের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত এক উচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিল, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিতে পাইল যে, গৃহে গৃহে ধ্বজপতাকাসকল উড্ডীন

হইতেছে; রাজপথসকল পরিষ্কৃত, জলসিক্ত ও পুষ্পমালায় সমলঙ্কৃত হইয়াছে; নগরীকে আলোকমালায় সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত পথের উভয়পার্শ্বে বৃক্ষাকার আলোকস্তম্ভসকল সংস্থাপিত হইয়াছে; দেবগৃহসকল সুধাধবলিত হইতেছে এবং নাগরিকেরা বিচিত্র বস্ত্র মাল্য ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া মহোল্লাসে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। মন্থরা এক ধাত্রীকে সম্মুখে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে তাহাকে এই উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

ধাত্রী মন্থরাকে প্রকৃত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। পরদিন প্রভাতে রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কুব্জার আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। এতদিনে কৌশল্যা-কুমার রামচন্দ্র তবে সত্য সত্যই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিলেন, এতদিনে তবে কৈকেয়ীর সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইতে চলিল ও রাজকুমার ভরতের ভাগ্যে পরাধীনতাই নির্দ্দিষ্ট হইল। কুব্জার ক্ষুদ্র হৃদয়রাজ্যে এক তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইল, চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে দুষ্টা অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষে ভরত ও কৈকেয়ীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বোধ হইল। রাত্রি প্রভাত হইলেই রাম রাজা হইবেন; রাম রাজসিংহাসনে একবার আরোহণ করিলে, আর কেহ কি তাঁহাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হইবে? তবে কি ভরতের আর কোন উপায় নাই? সহসা বৃদ্ধা স্থির হইল, সহসা তাহার কুটিল চক্ষু সমুজ্জ্বল ও মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল, বোধ হইল যেন সে অন্ধকা[illegible] [illegible]হিষী বৃদ্ধ মহা[illegible] নৈরাশ্যের মধ্যে আশা পাইয়াছে! কু[illegible] বাস্তবিক, [illegible] আলোক দেখিয় করিয়া ত্বরিতপদে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করি[illegible]

কৈকেয়ী ও মন্থরা।

মন্থরা কৈকেয়ীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিল "কৈকেয়ি, তুমি নিজ সুখ ও সৌভাগ্যচিন্তাতেই নিমগ্ন আছ; তোমার গৃহের বহির্ভাগে যে সকল গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার কি কোন সংবাদ রাখ? তুমি আপনাকে রাজার প্রিয়তমা মহিষী মনে করিয়া সর্ব্বদাই গর্ব্ব করিয়া থাক, কিন্তু এতদিনে তোমার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে।" কৈকেয়ী মন্থরার ব্যঙ্গসূচক এই অভিনব বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া, তাহাকে সমস্ত রহস্যই প্রকাশ করিতে বলিলেন। মন্থরার মুখে রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সরলহৃদয়া কৈকেয়ী হর্ষে আপ্লুত হইলেন : তিনি প্রীতিভরে তৎক্ষণাৎ নিজ অঙ্গ হইতে এক বহুমূল্য ভূষণ উন্মোচন করিয়া মন্থরাকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। স্থূলবুদ্ধি কৈকেয়ীর এই অপ্রত্যাশিত আচরণ দর্শন করিয়া মন্থরা ক্ষোভে ও রোষে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিঙ্করী কৈকেয়ী-প্রদত্ত ভূষণখণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া মহিষীর মন্দবুদ্ধির যথেষ্ট নিন্দা করিল। মন্থরা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, রাম রাজ্যেশ্বর হইলে তাহার ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টই অধিক হইবে; ভরত রামের অধীন হইয়া ভৃত্যের ন্যায় রাজ্যে অবস্থান করিবেন, এবং কৈকেয়ীকেও অতঃপর কৌশল্যা ও সীতার মনস্তুষ্টি করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। অতএব মহিষী যদি আপনার মঙ্গলকামনা করেন, তাহা হইলে রাম যাহাতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না হইয়া ভরতই তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তিনি তাহারই উপায়-বিধান করিতে প্রাণপণে যত্ন করুন। কৈকেয়ী রামের প্রতি স্নেহবশতঃ কুব্জার ঘৃণিত প্রস্তাবে প্রথমে যথেষ্ট অশ্রদ্ধা ও অনাদর

প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে মন্থরার প্রবল যুক্তিবলে তাঁহার সাধুভাব ও সাধুচিন্তা কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল। অসাধু-দর্শিনী কুব্জা মহিষীকে আপনার দুরভিসন্ধিরই অনুবর্ত্তিনী করিল; মহিষীও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে স্বর্ণলতা কালভুজঙ্গীরূপে পরিণত হইয়া গেল।

কৈকেয়ী কহিলেন "মন্থরে, তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী; উপস্থিত বিপদ হইতে যেরূপে মুক্ত হইতে পারি, তুমিই তাহার উপায় বিধান কর। মহারাজ আমার পুত্র ভরতকে রাজা না করিয়া যদি রামকেই রাজ্যভার প্রদান করেন, তাহা হইলে শপথ করিতেছি, আমি আর এ জীবন রাখিব না।" মন্থরা কৈকেয়ীর বাক্যে মনে মনে তুষ্ট হইয়া বলিল "মহিষি, তুমিই ইহার সম্যক্ উপায় অবগত আছ; কিন্তু বোধ হইতেছে, তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। বহুকাল হইল, মহারাজ সম্বরনামা এক অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াছিলেন; তুমিই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সবিশেষ যত্ন ও শুশ্রূষাদ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়াছিলে। মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালে তোমাকে দুইটি অভিলষিত বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তখন সে বর দুইটি চাহিয়া লও নাই; যখন আবশ্যক হইবে, তখনই চাহিয়া লইবে বলিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি মহারাজের নিকট সেই বরের উল্লেখ করিয়া প্রথম বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা কর। রাম অতিশয় লোকপ্রিয়, ইহা সত্য বটে; কিন্তু বুদ্ধিমান্ ভরত

চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে প্রজাগণকে আপনার বশতাপন্ন করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক নয়নজলে ধরাতল অভিষিক্ত কর। মহারাজ নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিতে আসিবেন। সেই সময়ে কৌশলক্রমে তাঁহাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া বর প্রার্থনা করিবে; ইহাতে অবশ্যই তোমার ইষ্টসাধন হইবে।" মন্থরার এই পরামর্শ শ্রবণপূর্ব্বক কৈকেয়ী আহ্লাদে গদ্গদচিত্ত হইলেন, এবং তাহার গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও বহু ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে কৈকেয়ীকে এই আনন্দসমাচার জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। রাজ্ঞী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন, প্রতিহারীর মুখে এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক দশরথ চিন্তাকুলমনে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্যসত্যই কৈকেয়ী মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক ধূলিশয্যায় শয়ানা আছেন এবং নয়নজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছেন। প্রিয়তমা মহিষীর এই অসম্ভাবিত অবস্থা দর্শনে মহারাজ অতিশয় বিচলিত হইলেন। তিনি স্নেহপূর্ণ সুমধুর বাক্যে কৈকেয়ীকে ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অভিমানিনী মহিষী স্বামীর প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না। মহিষীর শরীর কি অসুস্থ হইয়াছে, কেহ কি তাঁহার অবমাননা করিয়াছে, অথবা তাঁহার প্রতি কি কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে? রাজা ব্যাকুল

ভাবে বারম্বার এইরূপ প্রশ্ন করিলেও কৈকেয়ী নিরুত্তর রহিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে তিনি বাষ্পাকুললোচনে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন "নরনাথ, আমার শরীর অসুস্থ হয় নাই, আমাকে কেহ অবজ্ঞা করে নাই এবং আমার প্রতি বিশেষ কোন কর্ত্তব্যেরও ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু তোমার কাছে আমার কোন প্রার্থনা আছে, তুমি যদি তাহা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে আমার মনোমালিন্য দূরীভূত হইতে পারে, অন্যথা আমি তোমার সমক্ষেই এই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"রাজা মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সহাস্যবদনে শপথ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুচতুরা কৈকেয়ীও অবসর বুঝিয়া সত্যব্রত রাজাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিলেন এবং হিতৈষিণী মন্থরার উপদেশক্রমে যে বিষ উদ্গিরণ করিলেন, তাহাতে কিয়ৎকাল মধ্যে সেই বিশাল রাজসংসার জর্জ্জরিত হইয়া শ্মশানতুল্য ভীষণ আকার ধারণ

কৈকেয়ী সম্বরযুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন "রাজন্, তুমি তৎকালে আমার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া আমায় দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে; আমি তখন বর প্রার্থনা করি নাই, উপযুক্ত সময়ে প্রার্থনা করিব বলিয়াছিলাম, অদ্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি। প্রথম বরে কল্যই তুমি রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশবর্ষ দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত কর, আর দ্বিতীয় বরে রামের পরিবর্ত্তে আমার পুত্র প্রাণাধিক ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। তুমি আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর, এক্ষণে তোমার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা।"

কৈকেয়ীর এই নিদারুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দশরথ বজ্রাহত অথবা ভূতাবিষ্টের ন্যায় সহসা নিশ্চেষ্ট হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জাগরিত আছেন কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষোভে ও রোষে তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ এবং নয়নজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। তিনি বহুক্ষণের পর সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে যারপরনাই ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, তিনি স্বর্ণলতাভ্রমে সেই ভুজঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াছেন; রাম সেই পাপীয়সীর কি অপরাধ করিয়াছেন? রাম যে আপন জননী অপেক্ষাও সেই দুর্ব্বৃত্তাকে সমধিক ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন! রামনির্ব্বাসনরূপ অমঙ্গল বাক্য উচ্চারণ করিতে কৈকেয়ীর পাপ রসনা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? রাম ব্যতীত দশরথ যে মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিবেন না! কৈকেয়ী প্রসন্ন হউন, কৈকেয়ী অন্য কোন বর প্রার্থনা করুন, রাজা তাহা পূর্ণ করিবেন।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই করুণাময়ী। তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্র উচ্চভাবের লীলাভূমি; ধর্ম্মবলে বলবতী হইলে তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিময়ী পবিত্রতা বলা যাইতে পারে। নিঃস্বার্থতাই তাঁহাদের চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এই নারীজাতি যখন নীচবাসনা ও অধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহারা অসাধ্যের সাধন এবং দুষ্কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সংসারে অশান্তি, অপবিত্রতা ও অনর্থ আনয়ন করে এবং হৃদয়ে কোমলতার পরিবর্ত্তে কঠোরতা, দয়ার পরিবর্ত্তে নির্দ্দয়তা ও নিঃস্বার্থতার পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা পোষণ করে। কৈকেয়ী জঘন্য স্বার্থপরতার অনুবর্ত্তিনী হইয়া বিমূঢ় রাজার

বিলাপ ও ভর্ৎসনাবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। রাজার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইল না, বরং তিনি বৃদ্ধ নরপতির শোকপীড়িত হৃদয়কে অসহ্য উপহাস ও বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশও ঘটিয়াছিল। তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কখনও কৈকেয়ীর চরণতলে পতিত, কখনও বা শোকে লুপ্তসংজ্ঞ এবং কখন কখন চেতনা লাভ করিয়া ক্ষিপ্তচিত্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুষ্টা কৈকেয়ীর কঠিন হৃদয় কিছুতেই দ্রব হইল না। এইরূপে সেই কালরজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

যামিনী প্রভাত হইলে, রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইল। বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ সভাতে সমবেত হইলেন। কিন্তু মহারাজ তখনও সেখানে উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া, তাঁহারা সুমন্ত্রকে অন্তঃপুরমধ্যে প্রেরণ করিলেন। সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজকে প্রফুল্লহৃদয়ে গাত্রোত্থান এবং রামচন্দ্রের অভিষেকরূপ মঙ্গলোৎসব সম্পাদন করিতে প্রার্থনা করিলেন। দশরথ সুমন্ত্রের সেই বাক্যে অতিশয় কাতর হইলেন এবং সজলনয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন "সুমন্ত্র, তোমার বাক্যে আমার অধিকতর মর্ম্মবেদনা হইতেছে।" মহারাজের মুখে সহসা এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র বিস্মিতমনে সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অপসৃত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৈকেয়ী তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন

"সুমন্ত্র, মহারাজ রামাভিষেকের হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি পরিশ্রমে যৎপরোনাস্তি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছেন, অতএব তুমি ত্বরিতপদে একবার রামচন্দ্রকে এইস্থলে আনয়ন কর।" সুমন্ত্র রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, স্বয়ং রাজারও সেইরূপ আদেশ পাইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ রামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র জানকীর সহিত কুশশয্যায় নিশাযাপন করিয়া প্রভাতোচিত ক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক পবিত্র আসনে সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। রাম ও জানকী উভয়েই মনে করিলেন, মহারাজ বুঝি তাঁহাকে রাজ্যাভিষেকের নিমিত্তই আহ্বান করিতেছেন। রাম পিত্রাজ্ঞা শুনিয়া অনতিবিলম্বে সুমন্ত্রসহ পিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মহারাজ দেবী কৈকেয়ীর সহিত দীনভাবে ও শুষ্কমুখে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন! রাম অগ্রে পিতার চরণবন্দন পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। দশরথ রামকে দেখিয়াই "রাম" এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক সহসা শোকাচ্ছন্ন হইলেন। পিতৃবৎসল রাম পিতার ঈদৃশী দীনদশা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন। তিনি শুষ্কমুখে ব্যাকুলচিত্তে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতঃ, পিতৃদেব আজ আমাকে দেখিয়া সহসা শোকাভিভূত হইলেন কেন? আজ তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত প্রফুল্ল মনে বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন? তিনি কি অসুস্থ হইয়াছেন? আমি কি তাঁহার কোন অপ্রিয়সাধন করিয়া অসন্তোষের কারণ

হইয়াছি? আপনি সকল কথা সবিশেষ বলুন, শুনিতে মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, এবং মহারাজের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া আমা' হৃদয়ও বিদীর্ণ হইতেছে।”

নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন “বৎস, তোমার পিতা অসুস্থ হন নাই, তুমি তাঁহার কোন অসন্তোষেরও কারণ হও নাই; কিন্তু ইনি মনে মনে কোন সঙ্কল্প করিয়াছেন, লজ্জাবশতঃ তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি মহারাজের অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইহাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। রাজা তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না বলিয়া, তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পিতা আমার নিকট কোন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, তুমি যদি তাহা পালন করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে তাঁহার সত্যরক্ষা হয়, আর আমিও তোমাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলি।”

রাম পিতার আদেশে অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিতে পারেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেও পারেন, সুতরাং কৈকেয়ীর এই বাক্যে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন “দেবি, পিতা আমায় যাহা আদেশ করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি তাহাই পালন করিব, আপনি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে আমার প্রতি তাঁহার আদেশ কি, তাহাই বলুন এবং মহারাজকে প্রসন্ন করুন।”

তখন নির্দ্দয়া কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বরসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার হৃষ্টমনে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর

বনবাস করিতে হইবে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে ভরত রাজসিংহাসন অধিকার করিবেন। কৈকেয়ী মহারাজের নিকট এই বরদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি একদিকে রামের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ এবং অপরদিকে ধর্ম্মভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। রাম কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের ন্যায় পিতৃসত্য পালন করিতে যত্নবান্ হউন, এবং অনতিবিলম্বে জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনগমন করুন; অন্যথা মহারাজের শোকাপনোদন হইবে না। রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান না করিলে, তিনি অন্নজল স্পর্শ করিবেন না; অতএব রাম সত্বর হউন।

রাম কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন "দেবি, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হৃষ্টমনে প্রিয়তম ভরতকে ধন, রত্ন, রাজ্য, প্রাণ এবং এমন কি সীতা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারি; যখন স্বয়ং পিতৃদেব আমাকে রাজ্যপরিত্যাগে আদেশ করিতেছেন, তখন আর কথা কি? আপনি মহারাজকে প্রসন্ন করুন; আমি এতদ্দণ্ডেই জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিব; কেবল জননী কৌশল্যাদেবীকে আশ্বস্ত ও জানকীর সহিত একবার সাক্ষাৎকার করিতে যাহা কিছু বিলম্ব হইবে মাত্র। মহারাজ এই কারণে এরূপ শোকাকুল হইয়াছেন কেন? পিতৃদেব নিজমুখে আমাকে এই আদেশ প্রদান করিলে আমি চরিতার্থ হইতাম। যাহা হউক, আমি আপনারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এতদ্দণ্ডেই অরণ্যযাত্রা করিতেছি।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র বৃদ্ধ নরপতির পাদবন্দন ও কৈকেয়ীর

নিকট প্রসন্নচিত্তে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রথম হইতেই লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; তিনি রামের বনবাসের কথা শুনিয়া ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। রাম বিদায় গ্রহণ করিলে, বৃদ্ধ নরপতির শোকসমুদ্র পুনর্ব্বার উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি "হা রাম, হা রাম" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন।

বৃদ্ধ রাজা বিলাপ করিতে থাকুন, ইত্যবসরে আমরা একবার একটি গুরুতর বিষয় বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি। দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া কোন সময়ে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পরে সেই অঙ্গীকারই দশরথের কালস্বরূপ হইয়া উঠিল। সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া রাজা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্রকে বনবাস দিতে বাধ্য হইলেন। কৈকেয়ী দশরথের বশবর্ত্তিনী স্ত্রী মাত্র; চেষ্টা করিলে কি তিনি মহিষীর এই অন্যায় প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না এবং এরূপ প্রার্থনায় অসম্মত হইয়া একবার তাঁহার অসত্যপরায়ণ হওয়াও কি বরং ভাল ছিল না? স্ত্রীর নিকট একবার মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেই কি বিশেষ দোষ হইত? রামায়ণ পড়িতে পড়িতে কোন কোন পাঠকের মনে হয়ত এবম্বিধ নানাপ্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে এবং দশরথের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধও সমুৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যখন মনে করা যায় যে, দশরথ একজন তেজস্বী ও সত্যব্রত রাজা ছিলেন, এবং একমাত্র সত্যপালনের নিমিত্তই তিনি প্রিয়তম পুত্র ও এমন কি তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই, তখনই আমরা তাঁহার

প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, তখনই বুঝিতে পারি দশরথ যথার্থই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। যাঁহারা ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান্, তাঁহারা কি গৃহে আর কি বহির্ভাগে সর্ব্বত্রই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। জগৎ যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহারা সত্য ও ন্যায়ের রাজ্যকে জয়যুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। আর স্ত্রী হইলেই কি তিনি স্বামীর চক্ষে নিকৃষ্ট ও হেয় হইয়া থাকেন? তাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করা যায়, তাহা কি রক্ষণীয় নহে? ইহা ব্যতীত আমাদের আরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পুরাকালে নারীজাতি পুরুষগণকর্ত্তৃক সমুচিত সৎকৃত ও সম্মানিত হইতেন। "দেবি" "আর্য্যে" প্রভৃতি সম্বোধনসূচক শব্দপ্রয়োগই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এস্থলে আমরা পিতৃবৎসল রামচন্দ্রেরও পিতৃভক্তির কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পিতৃভক্তির এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল এবং অদ্বিতীয়ও বটে। যিনি এক পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত অম্লানবদনে করতলগত সমস্ত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসরূপ কঠোর ব্রত আলিঙ্গন করিতে পারেন, তিনি যে সাধারণের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া অদ্যাপি জগতে পূজিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রাম কৌশল্যার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী তাঁহার মঙ্গলকামনায় দেবপূজায় নিযুক্ত আছেন। রাম জননীর চরণে প্রণত হইলে, তিনি প্রিয়তম পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং আজ রাম রাজা হইবেন, এই কথা ভাবিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাম জননীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "মা, আজ তোমার আনন্দের

কোন কারণ নাই; তোমার, সীতার ও লক্ষ্মণের বড় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। পিতৃদেব জননী কৈকেয়ীর প্রার্থনায় ভরতকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া আমাকে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস আদেশ করিয়াছেন।” এই বাক্য শ্রবণমাত্র কৌশল্যা ছিন্নমূল লতার ন্যায় সহসা ভূমিতলে পতিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে বহুকষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কৌশল্যা শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া বহু বিলাপ ও নিজ অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে রামনির্ব্বাসনসংবাদ অন্তঃপুরমধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে এক হাহাকার শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাম ও কৌশল্যার সমক্ষেই বৃদ্ধ নরপতির সমুচিত নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহারাজের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, স্ত্রীপরায়ণ রাজার আদেশপালনের আবশ্যকতা নাই। লক্ষ্মণ তদ্দণ্ডেই ধনুর্ধারণপূর্ব্বক দশরথ, কৈকেয়ী ও ভরত প্রভৃতি বিপক্ষগণকে বিনাশ করিবেন। লক্ষ্মণ সহায় থাকিলে, রামের বিরুদ্ধে কে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে? সুধীর রাম, লক্ষ্মণের বাক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মৃদুমধুর তিরস্কার করিলেন। পিতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; পিতা আকাশ হইতেও মহত্তর; পিতা অপেক্ষা গুরুতর ব্যক্তি এজগতে আর কে আছেন? পিত্রাদেশ ও পিতৃসত্যপালন দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করিতে না পারিলে, রামের জীবনধারণে প্রয়োজন কি? ভরত সুশীল ও ভ্রাতৃবৎসল; ভরত রামলক্ষ্মণের কি অপকার করিয়াছেন? দেবী কৈকেয়ী জননী; তাঁহার নিন্দা করিতে নাই। লক্ষ্মণ রামের তিরস্কারবাক্যে লজ্জিত হইলেন। রামের

স্থিরপ্রতিজ্ঞাদর্শনে কৌশল্যা বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামকে না দেখিয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিবেন না; রাম যদি একান্তই বনগমন করেন, তবে তিনিও তাঁহার সহিত অরণ্যযাত্রা করিবেন। রাম জননীকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, বলিলেন স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করিতে নাই, তাহাতে অধর্ম্ম ও অপযশ উভয়ই সঞ্চিত হয়। পতিশুশ্রূষাই স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম। রাম বনগমন করিলে মহারাজ শোকাকুল হইবেন; কৌশল্যা সন্নিকটে না থাকিলে, তাঁহার পরিচর্য্যা কে করিবেন?

রামকে বনগমনে একান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া কৌশল্যা প্রণত পুত্রকে সজলনয়নে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সর্ব্বত্র তাঁহাকে সুস্থ ও কুশলে রাখিতে দেবতাকুলের নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাম জননীর পাদবন্দন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া সীতার আবাসে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মানুষ তীব্র যন্ত্রণা ও দারুণ মনঃকষ্ট প্রাপ্ত হইলেও অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায় সে যদি কোন অভিন্নহৃদয় বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হয়, অথবা কোন ব্যক্তি যদি তৎকালে সহানুভূতিসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও আর তাহার আত্মসংযম রক্ষিত হয় না, মানবের দৌর্ব্বল্য তৎক্ষণাৎ অশ্রুরূপে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। রাম এতক্ষণ আপনার মনোভাব সংগোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দশরথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশের সময়ে, এবং কৌশল্যার অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনের সময়েও, তাঁহার মুখমণ্ডলে কেহ কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু যেমন তিনি সীতার আবাসের সন্নিহিত হইলেন, অমনই তাঁহার সংরুদ্ধ শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। রামের লোচন অশ্রুপূর্ণ হইল, মুখমণ্ডল সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল, এবং হৃদয়রাজ্যে নানাভাবের তুমুল বিসম্বাদ আরম্ভ হইল। সীতাদেবী রাজধর্ম্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম লজ্জাবনতবদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। জানকী প্রিয়তমকে চিন্তিত ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিতকলেবরে উত্থিত হইলেন এবং ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"নাথ, সহসা কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত? আজিকার শুভদিনই তোমার রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ? শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল আবৃত নাই কেন? ধবল চামরযুগল লইয়া ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত তোমায় বীজন করিতেছে না? সূত মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গলগীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমার স্তুতিবাদ করিল? বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই? গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান পারিষদ্গণ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না? সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান্ অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না? সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই? পরিচারকেরা সুবর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল? যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল? কেনই বা তোমার সেইরূপ মধুর হাস্য দেখিতে পাই না?" (২। ২৬)

রামচন্দ্র বৈদেহীর ঈদৃশ করুণ বিলাপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, "জানকি, পূজ্যপাদ পিতা আমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি প্রিয়তমার কাছে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

তারপর তিনি বলিলেন "প্রিয়ে, আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম।"

রাম উপদেশচ্ছলে সীতাকে আরও কহিতে লাগিলেন,

"জানকি, আমি পিতার অঙ্গীকার রক্ষার্থ এক্ষণে বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে, তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্ব্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতি দুঃখিনী, বিশেষতঃ তাঁহার শেষদশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবা ভক্তি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপ স্নেহ ও ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। সৌজন্য ও যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে, মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার ঔরসজাত পুত্রকেও অহিতকারী দেখিলে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে একজন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি, আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম; আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিলাম, তাহার একটিও যেন বিফল না হয়।" (২।২৬)

জানকী মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে কোথায় রাজমহিষীর পদে উন্নীত হইতেছিলেন, আর কোথায় প্রাণেশ্বর রাজকুমার জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক তখনই বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন! সীতা সামান্যা

নারী হইলে হয়ত অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ও আশার এই মর্ম্মভেদিনী ছলনায় একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িতেন; হয়ত তৎক্ষণাৎ তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুসম্বলিত কাতরোক্তিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেন, কৈকেয়ীর প্রতি অজস্র অভিশাপ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতেন, অদৃষ্টলিপির কতই নিন্দাবাদ করিতেন ও বিধাতার কার্য্যের উপর দোষারোপ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় পরিলক্ষিতা হইতেন; হয়ত তিনি স্বার্থপরবশ হইয়া রামকে বনগমনরূপ এই ক্লেশকর দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং এমন কি স্বামীকে সত্যপথ হইতেও পরিভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন! কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সীতাদেবী সে প্রকৃতির নারী ছিলেন না; সীতা আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, এবং পতির সহিত একাত্ম হইয়া তাঁহাতেই জীবিত ছিলেন। সীতা রাজমহিষী হইবেন *না, তজ্জন্য তাহার মনে দুঃখের ছায়াপাতমাত্র নাই; স্বামী* পিতৃসত্যপালনার্থ ভীষণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছেন, তজ্জন্য সীতার মনে বরং আহ্লাদই হইতেছে; সীতার তাৎকালিক কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন; রাম বনগমন করিবেন, এই কথা শুনিবামাত্র সীতা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থিরীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। সীতার একমাত্র দুঃখ এই যে, রামচন্দ্র নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহাকে ভরতের আশ্রয়ে গৃহেই কালযাপন করিতে বলিতেছেন! এতদিনেও যে রাম সীতাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, ইহাই তাঁহার অভিমানের কারণ। তাই প্রিয়বাদিনী সীতা স্বামীর

উল্লিখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,

"নাথ, তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না! তুমি যাহা কহিলে, ইহা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অপযশের, বলিতে কি, এ কথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে। নাথ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাসের আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও বনবাস ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোক আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদশিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্ত্রী স্বামীর চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব, নাথ, তুমি যদি অদ্যই গহনবনে গমন কর আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমিও অশঙ্কিতমনে আমায় সঙ্গিনী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই যে, আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, কেবল

তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহণীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে আমায় কোন কথাই কহিও না।” (২।২৭)।

বাল্মীকির রামায়ণ হইতে আমরা সীতার বাক্যগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। রাম সীতাকে গৃহে অবস্থান করিতে বলিতেছেন, এই কথা শুনিয়া সীতার হাস্য সম্বরণে অক্ষমতা; রামের যখন বনবাসের আদেশ হইয়াছে, ফলে সীতারও তাহাই ঘটিতেছে, সীতার এই সরল স্বাভাবিক যুক্তি; রাম বনগমন করিলে, সীতা তাঁহার অগ্রে অগ্রে কুশকণ্টক দলন করিয়া যাই বেন, সীতার পবিত্রপ্রেমপ্রণোদিত এই সৎসাহস; পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, সেইরূপ রামও সীতাকে সঙ্গিনী করুন, সীতার এই মর্ম্মস্পর্শিনী করুণ উক্তি, এবং সীতা যাহা করিবেন, রাম যেন তাহাতে বাধা না দেন, সীতার সুন্দর কর্ত্তব্যজ্ঞানজনিত এই আশ্চর্য্য তেজস্বিতা, এই সমস্ত বিষয় যখন আমরা মনে মনে আলোচনা করিতে থাকি, তখন সীতাচরিত্রের অপরিমেয় গভীরতা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাই!

সীতা বড়ই বুদ্ধিমতী। পাছে স্বামী বনবাসের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, এইজন্য প্রথম হইতেই তিনি নিজের স্বাভাবিক বনবাসস্পৃহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সীতা বলিলেন “জীবিতনাথ, আমার একান্ত অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্রসকল বাস করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণসেবা

করি ; যে জলাশয়ে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডবসকল কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক তথায় অবগাহন করি ; সেই বানরসঙ্কুল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও পল্বলসকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পরিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে। আমি উৎকৃষ্ট অন্নপানের নিমিত্ত তোমায় কোন কষ্টই দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।" (২।২৭)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সীতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অতিশয় অনুরাগিণী ; বাল্যকালে পিতৃগৃহে তাপসতাপসীগণের মুখে তিনি আশ্রমের বর্ণনা শুনিয়াছেন ; তাই নির্জ্জন বনে তাপসী হইয়া স্বামীর চরণসেবা করিতে তাঁহার বড় সাধ হইয়াছে। আশ্রমের সন্নিকটে ও চতুর্দ্দিকে যে প্রকার বন থাকে, সীতা সেই প্রকার বনের শোভার কথাই উল্লেখ করিলেন; নিবিড় ও দুর্গম অরণ্য যে কিরূপ, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। তাই রামচন্দ্র মনে মনে বনবাসের

দুঃখসকল আলোচনা করিয়া সীতাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না এবং গৃহেই অবস্থান করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

রাম বলিলেন "প্রিয়ে, অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দরবিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে; দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুসকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে; তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথ কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভারবহন, বল্কলধারণ এবং প্রতিদিন দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করা আবশ্যক। যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুমচয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্ত্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে; কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার সরীসৃপ আছে, নদীগর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া

রহিয়াছে। বৃশ্চিক, কীট এবং পতঙ্গ ও দংশমশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর। এই কারণেই কহিতেছি, অরণ্য সুখের নহে। তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্বেও নির্ভয় হইতে হইবে। অতএব নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না; বনবাস তোমায় সাজিবে না; জানকি, এখন হইতেই দেখিতেছি, তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক।" (২।২৮)

সীতা রামের বাক্য শুনিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন "নাথ, তুমি অরণ্যে যে সকল দুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু তোমার সন্নিহিত থাকিলে, সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন বনবাসের ইচ্ছা করিতেছি, তখন বনবাসের দুঃখসকল আমার পক্ষে সুখেরই হইবে। আমি তোমার বিরহে মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিব না; অতএব তোমার সহিত আমার বনগমন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় হইতেছে। নাথ, যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়; কিন্তু তুমি নির্লোভ, সুতরাং তোমার কোন আশঙ্কাই নাই।" (২।২৯)

রাম সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন সীতাদেবী সহজযুক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া আর এক যুক্তিপথ অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, "পূর্ব্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদ

বধি বনবাসবিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি যখন বালিকা ছিলাম, তখন এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি অলীক? আর তোমার সহিত বনবাসে আমারও অত্যন্ত অভিলাষ, আমি পূর্ব্বে এমন অনেকদিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হইয়াছিলে। অতএব নাথ, তুমি এই দুঃখিনীকে সঙ্গে লইয়া চল।" (২।২৯)

জানকীর সহস্র চেষ্টা বিফল হইল; রাম সীতাকে সঙ্গে লইতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না। নয়নজলে সীতার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। অনুনয়, বিনয়, যুক্তি, দৈবজ্ঞের উক্তি কিছুই সফল হইল না দেখিয়া, সীতা আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। সীতা প্রীতিভরে অভিমানসহকারে মহাবীর রামকে উপহাস করিয়া কহিলেন "নাথ, আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে, রামের যেরূপ তেজ প্রখর সূর্য্যেরও সে প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে প্রলাপমাত্র হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষণ্ণ হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশঙ্কা যে, অনন্যপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ? আমি কুলকলঙ্কিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে আমি কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব।" (২।৩০)

অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি বলিতেছি যাহা আমার ধর্ম্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে, তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তুমি আপনার ধনরত্ন, বস্ত্রভূষণ, ক্রীড়াসামগ্রী সমস্তই ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া অদ্যই অরণ্যযাত্রা করিতে প্রস্তুত হও।” (২।৩০)

প্রেমের জয় হইল। সীতার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মেঘমুক্ত হইলে পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, বনবাসে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে সম্মতি পাইয়া সীতারও তদ্রূপ শোভা হইল। সীতা তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে আপনার সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ এতক্ষণ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন; তিনি রামকে বনগমন করিতে একান্তই কৃতনিশ্চয় দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন “প্রভো, যদি বনবাসই স্থির করিলেন, তবে আপনার এই চির অনুচরকেও সঙ্গে লউন।” রাম লক্ষ্মণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে তিনজনেই অরণ্যগমনের সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। অনন্তর সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দশরথের নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। যে সীতাকে কেহ কখনও নয়নগোচর করে নাই, সেই রাজকুমারী ও রাজবধূ সীতাদেবীকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল এবং দশরথ ও কৈকেয়ীর যথেষ্ট নিন্দা করিল।

দশরথ, রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কৌশল্যাপ্রমুখ রাজমহিষীগণ শোকাকুল হইলেন। রাম দশরথের পাদবন্দন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দশরথ বাষ্পাকুললোচনে প্রিয়তম পুত্রকে বিসর্জ্জন করিলেন। দুর্বৃত্তা কৈকেয়ী রামলক্ষ্মণের পরিধানের নিমিত্ত চীরবস্ত্র আনয়ন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই স্থলেই তাপসবেশ ধারণ করিলেন। মুগ্ধস্বভাবা সীতাও, কিরূপে চীর ধারণ করিতে হয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাহা আপনার কৌশেয় বস্ত্রের উপরই বন্ধন করিতেছিলেন; এমন সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনেরা তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। দশরথ বৎসর সংখ্যা করিয়া সীতার জন্য বহুমূল্য বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান করিলেন। অনন্তর রামলক্ষ্মণ ও সীতা গুরুজনবর্গের নিকট যথাক্রমে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাদেবী সীতাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন,

"বৎসে, যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে, উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখভোগ করে, এবং বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানাদোষে দূষিত, অধিক কি পরিত্যাগও করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অল্পকারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে। এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসনভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন

হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষপ্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশগ্রহণ এবং আপনাদের কুলমর্য্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদিনী ও শুদ্ধস্বভাবা, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাঁকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।" (২।৩৯)

জানকী কৌশল্যাদেবীর ঈদৃশ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "আর্য্যে, আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য বিবেচনা করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি; পিতামাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কে না আদর করিবে? আর্য্যে, আমি কি কারণে স্বামীর অবমাননা করিব? পতিই আমার পরম দেবতা।" (২।৩৯)

কৌশল্যা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ করিলেন। রথ ঘর্ঘরশব্দে রাজপথে ধাবমান হইল। রাজপুরীর মধ্যে ভীষণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম

বনগমন করিতেছেন দেখিয়া, নাগরিকেরা আপনাদিগকে অনাথ মনে করিল, এবং বালক বৃদ্ধ, যুবক প্রৌঢ়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সৈন্য সামন্ত, সকলে হাহাকার করিয়া তাঁহার রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাম সন্তপ্তমনে একবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যাবাসিগণ শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার রথের অনুসরণ করিতেছে। রাম তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিল না। রাম যেখানে যাইবেন, তাহারাও সেখানে যাইবে; রামশূন্যা অযোধ্যানগরীতে তাহারা আর বাস করিবে না। ভক্ত প্রজাগণের ঈদৃশ অনুরাগ দেখিয়া রাম অশ্রু সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া সুমন্ত্রকে মহাবেগে অশ্বচালনা করিতে বলিলেন। প্রজাপুঞ্জও কিছুতেই নিরস্ত হইল না; অন্যের কথা দূরে থাকুক, তপোনিরত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণও হাহাকার করিতে করিতে রামের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং বার্দ্ধক্যনিবন্ধন বেগে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজেই অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসন্নপ্রায় হইলে, সকলে তমসাতীরে উপনীত হইলেন। সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আহার সামগ্রী প্রদান করিলেন। এদিকে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া অবতীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে যাবতীয় পদার্থকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। বৃক্ষসকল অস্পষ্ট ও নিস্পন্দ হইল। পক্ষিগণ নীড়ে বসিয়া কোলাহল করিতে করিতে অকস্মাৎ নীরব হইল। অদূরে তমসার কৃষ্ণজলরাশি তিমিরগর্ভে কোথায়

বিলীন হইতে লাগিল। পরিশ্রান্ত অযোধ্যাবাসিগণ সেই সুরম্য নদীতটে একে একে উপনীত হইয়া শোকে অবসন্ন হইতে লাগিল, এবং রামের সমীপে ও দূরে, চতুর্দ্দিকে শয়ন ও উপবেশন করিয়া, প্রগাঢ়নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। রামচন্দ্র সেই প্রশান্ত সন্ধ্যাকালে, তমসাতটে, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া, বিষাদজালে আচ্ছন্ন হইলেন। শোকার্ত্ত বৃদ্ধপিতা, বিলপমানা জননী, দুঃখিত মাতৃগণ এবং অনুরক্ত অযোধ্যাবাসিগণ স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া তাঁহার সুকোমল মনকে অতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিল। তিনি কষ্টে শোক সম্বরণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস, আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা উপস্থিত; আজ আমরা এই নদীতীরেই আশ্রম লইলাম; এইস্থানে বন্য ফলমূল যথেষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু সঙ্কল্প করিয়াছি, আজিকার এই রাত্রি কেবল জলপান করিয়াই থাকিব।" সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ রামের জন্য পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিলেন। তিনি ভার্য্যার সহিত তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন; আর মহাবীর লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের সহিত তাঁহার গুণালোচনা করিতে করিতে নিশা যাপন করিলেন।

রাম প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রজামণ্ডলীকে ঘোর নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া, তাহারা জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। রথ মহাবেগে চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষণকালমধ্যে বহুদূরে লইয়া গেল। অনন্তর কোশলরাজ্যের অন্ত্যসীমায় বেদশ্রুতি নদী পার হইয়া তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পরে কিয়দ্দূরে গোমতী ও

স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিয়া সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন। অনতিদূরে পবিত্রসলিলা জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিল। রাম সীতাকে সুরম্যতটশোভিনী কলনাদিনী সেই জাহ্নবীর বিচিত্র শোভা দেখাইতে দেখাইতে এক মনোহর ইঙ্গুদী বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, এবং সেই বৃক্ষতলেই নিশাযাপনমানসে সুমন্ত্রকে অশ্বরশ্মি সংযত করিতে বলিলেন।

গুহ নামে এক নিষাদরাজ ঐস্থলে বাস করিতেন। তিনি রামের বাল্য সখা ছিলেন। সুহৃদ্বর রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে আগমন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণমাত্র গুহ, বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, সুস্বাদু ফলমূল ও অর্ঘ্যসহকারে রামের নিকট সমাগত হইলেন। বন্ধুদ্বয় প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। গুহকর্তৃক সৎকৃত হইয়া রাম পরম আনন্দ লাভ করিলেন, এবং তাপসব্রতপালনের অনুরোধে অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর রামচন্দ্র সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার নিমিত্ত সুশীতল পানীয় জল আনয়ন করিলেন। রাম জলপান করিয়া সীতার সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন; লক্ষ্মণও তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

লক্ষ্মণ রামের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রিজাগরণ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া নিষাদরাজ তাঁহার ভ্রাতৃভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। গুহ মহামতি লক্ষ্মণকে শয়ন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামলাভ করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। লক্ষ্মণ সন্তপ্তমনে

[illegible]

[illegible]

By permission of the Proprietor, Indian Press, Allahabad

কহিতে লাগিলেন "দেখ, এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আমার আর আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি ?" এই বলিয়া লক্ষ্মণ একমাত্র রামের অভাবে পিতা-মাতা আত্মীয় বন্ধু এবং অযোধ্যাবাসিগণের যে কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, শোকাকুলমনে তাহাই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। রাম জাগরিত হইয়া গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে নিষাদরাজ কর্ণ ও ক্ষেপণীযুক্ত, নাবিক সহিত একখানি সুদৃঢ় নৌকা আনয়ন করিলেন। রামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই নৌকায় আরোহণ করিতে সমুদ্যত হইলেন। সুমন্ত্রকে এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে, তাই রাম তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "সুমন্ত্র, তুমি পুনরায় ত্বরায় মহারাজের নিকট গমন কর ; আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল ; অতঃপর আমি পদব্রজে গহনবনে প্রবেশ করিব।" ভর্ত্তৃবৎসল সুমন্ত্র রামের এই অনুজ্ঞা শ্রবনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রামের সহবাসে ছিলেন বলিয়া এতক্ষণ তাঁহার শোকাবেগ সংরুদ্ধ ছিল, কিন্তু অতঃপর সত্যসত্যই রামকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইতে হইতেছে, ইহা ভাবিয়া তিনি শোকাকুল হইলেন। রাম তাঁহাকে সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া জনকজননী ও অন্যান্য গুরুজনের চরণে প্রণাম, প্রোষিত ভরতশত্রুঘ্নকে স্নেহ, এবং প্রজাপুঞ্জকে আন্তরিক সদ্ভাব জানাইলেন। তৎপরে ভ্রাতৃদ্বয় বটনির্য্যাস দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া ঋষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বীরযুগল এইরূপে তাপসোচিত বেশ ধারণ করিয়া নিষাদরাজ গুহ ও সুমন্ত্রের নিকট

বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং দেবী জানকীর সহিত নৌকারোহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতীর্ণ হইলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র ঘোর অরণ্যপ্রবেশের উপক্রম করিতেছেন; সীতাদেবী সঙ্গে আছেন এবং লক্ষ্মণই তাঁহার একমাত্র সহায়। তাই তিনি গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইয়াই, ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া, লক্ষ্মণকে উপদেশ প্রদান করিলেন "ভাই, অরণ্য সজন বা বিজনই হউক, সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিতে হইবে, সুতরাং এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জনমানুষের সঞ্চার নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং গর্ত্ত ও নিম্নোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন, এবং বনবাসের যে কি দুঃখ, আজই তাহা জানিতে পারিবেন।" (২।৫২)

স্বামীর এইরূপ আশঙ্কা ও সতর্কতা দেখিয়া, অরণ্যবাস যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার, জানকী অবশ্যই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও অনুরাগ, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর বলবীর্য্যে অটল বিশ্বাস, এবং তৃতীয়তঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে আপনার অতৃপ্ত লালসা, এই ত্রিবিধ কারণে সীতার মনে বনবাসসম্ভাবিত কোন ত্রাসই উৎপন্ন হইল না। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইব, সীতাদেবী গভীর অরণ্যকেও কেমন স্বায়ত্তাধীন গৃহাঙ্গন

বা পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন! উল্লিখিত ত্রিবিধ কারণ একাধারে বর্ত্তমান না থাকিলে, সীতার ন্যায় তেজস্বিনী নারীর পক্ষেও অরণ্যবাস এক প্রকার অসম্ভব হইত।

যতক্ষণ রাম লক্ষ্মণ ও সীতা দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, ততক্ষণ সুমন্ত্র নির্নিমেষলোচনে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেও, তিনি বহুক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শূন্যরথ লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। আজ অযোধ্যাবাসী প্রজাবর্গ, সুমন্ত্র, অথবা সুহৃদ্বর গুহ, কেহই সঙ্গে নাই। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা জনপদের বাহিরে সবে মাত্র এই প্রথম নিশা দর্শন করিতেছেন। অদ্যাবধি রামলক্ষ্মণকে আলস্যশূন্য হইয়া রাত্রিজাগরণ করিতে হইবে, স্বহস্তে তৃণপত্র আহরণ পূর্ব্বক শয্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং সীতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিস্তর কায়ক্লেশও সহ্য করিতে হইবে। তাই রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন "বৎস, আর তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না।" রাম লক্ষ্মণকে উৎকণ্ঠা দূরীভূত করিতে উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভূমিশয্যাতে শয়ন করিয়াই আপনার মানসিক উদ্বেগ নিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। যথার্থ বটে, রাম এক পিতৃসত্যপালন ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই পিতা মাতা ও জানপদবর্গের মনে ক্লেশপ্রদান করিয়াও মহোৎসাহে বনবাস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি কুপুত্রের ন্যায় জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছেন এবং

পিতারও শোকের যথেষ্ট কারণ হইয়াছেন; এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তিনি অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে সীতা এবং লক্ষ্মণও অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সুধীর লক্ষ্মণ শান্তচিত্ত হইয়া রামচন্দ্রকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম কনিষ্ঠ ভ্রাতার সুমধুর বাক্যে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া সেই জনসঞ্চারশূন্য অরণ্যে নিশা যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল লক্ষ্য করিয়া বনেবনে গমন করিতে লাগিলেন। সীতা ভর্ত্তার সহিত কত রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন, কিন্তু রামের বিষাদপূর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া কিছুতেই আনন্দ-লাভ করিলেন না। রাজবালা ও রাজবধূ সীতাদেবী একমাত্র পতিপ্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই কণ্টকপূর্ণ, প্রস্তরময়, নিম্নোন্নত-ভূমিসঙ্কুল বনপ্রদেশকে কুসুমাকীর্ণ পথের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা সন্ধ্যাকালে প্রয়াগসন্নিধানে উপনীত হইলেন, এবং যেস্থানে মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রম বিরাজ করিতেছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করিয়া মহর্ষির পাদবন্দন করিলেন। রাম আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, মহর্ষি তাঁহাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। তিনি তাঁহাদের সৎকারার্থ উৎকৃষ্ট ফল মূল ও সুস্বাদু জল প্রদান করিলেন, এবং অবস্থিতির নিমিত্ত একটী সুন্দর স্থান নিরূপিত

করিয়া দিলেন। পরে মহর্ষি অন্যান্য মুনিগণের সহিত রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক নানা প্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, সেই পবিত্র রমণীয় আশ্রমেই তাঁহাকে বনবাসকাল যাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। অদূরে লোকালয় আছে, পৌরবর্গ রাম ও জানকীকে জানিতে পারিলে সততই আশ্রমে গমনাগমন করিবে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না, এই নিমিত্ত রাম মহর্ষির সেই সুসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাম বলিলেন "ভগবন্, জানকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম দেখাইয়া দিন্।" ভরদ্বাজ চিন্তা করিয়া তাঁহাদের বাসের জন্য দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সেই নিশা যাপন ও প্রভাতে তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র, প্রিয়তমা জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, মহর্ষিনির্দ্দিষ্ট পথে চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মুনির অনুকম্পার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যমুনাতটে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মণ শুষ্ককাষ্ঠ আহরণ ও উশীরদ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া এক ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদুপরি সীতার উপবেশনার্থ একটা কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরে সকলে সেই ভেলার সাহায্যে ধীরে ধীরে যমুনা পার হইয়া তাহার দক্ষিণতটে অবতীর্ণ হইলেন। সীতাদেবী ইতঃপূর্ব্বে গুহের নৌকায় গঙ্গা এবং এক্ষণে ভেলার সাহায্যে যমুনা উত্তীর্ণ হইবার সময়, নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া, প্রত্যেকের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "দেবি

এই রাজকুমার তোমার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে পিতৃনিদেশ পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাধে তোমার পূজা করিব। দেবি, আমি তোমাকে প্রণাম করি।" (২।৫২,৫৫) যমুনা সমুত্তীর্ণ হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে জানকী শ্যাম নামে এক অত্যুচ্চ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। এই প্রকাণ্ড মহীরুহ দিগন্তপ্রসারী শাখাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দূর হইতে ঘনকৃষ্ণ নীরদখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে-ছিল। দেবী জানকী বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "তরুবর, আমার পতি ব্রতকাল পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার।" এই বলিয়া তিনি সেই বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

পুণ্যতোয়া গঙ্গাযমুনা ও এই বিশাল বটবৃক্ষের নিকট সীতার ঈদৃশী সরল প্রার্থনা তাঁহার সরল হৃদয়ের কি সুন্দর পরিচায়ক! তিনি স্বামীর কল্যাণের নিমিত্ত কি প্রকার সমুৎসুক ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে। সেই শ্যামবট পরিত্যাগ করিয়া একক্রোশ দূরেই তাঁহারা নীলবর্ণ এক মনোহর কানন দেখিতে পাইলেন। রামচন্দ্র সীতার পুষ্পপ্রিয়তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অনুরাগের বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন "ভাই, দেখ, সীতা যে পুষ্প চাহিবেন এবং যে বস্তুতে তাঁহার স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে।" (২।৫৫) সীতাদেবী

যাইতে যাইতে বৃক্ষগুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব্বপুষ্পগুচ্ছশোভিত লতা যাহা কিছু দেখেন, অমনই রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য আনিয়া দেন। এইরূপে সমস্তদিন তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ মৃগবধ ও ফলমূলাদি আহরণ পূর্ব্বক ক্ষুধা শান্তি করিলেন এবং সকলে এক মনোহর নদীতীরে সেই নিশা যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া অনতিবিলম্বে চিত্রকূটের সমীপবর্ত্তী হইলেন। চিত্রকূটপর্ব্বত অতিশয় রমণীয়; তাহা নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাজালে মণ্ডিত। সেখানে ফলমূল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জলও অতিশয় সুস্বাদু। অসংখ্য অগ্নিকল্প ঋষি সেই মনোরম প্রদেশ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে কোথাও নদী. কোথাও প্রস্রবণ, কোথাও গিরি গুহা, কোথাও উচ্চাবচ ভূমি এবং কোথাও বা তৃণগুল্মসমাচ্ছাদিত বিচিত্র সমতল ক্ষেত্র। কোথাও সুরভি আরণ্যকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বনস্থল সমুজ্জ্বল করিতেছে; কোথাও ভ্রমর ও বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতিদল পুষ্পে পুষ্পে উড্ডীন হইতেছে। রামচন্দ্র বসন্তকালে অরণ্যযাত্রা করিয়াছিলেন। তখন বনে বনে কিংশুক পুষ্পসকল বিকশিত হইয়া প্রজ্বলিত দাবানলশিখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কোথাও কোকিলের কুহুস্বর, কোথাও ময়ূরের কেকাধ্বনি, কোথাও টিট্টিভের কূজন এবং কোথাও বা দাত্যূহের চীৎকার। কোথাও চকিত হরিণহরিণীদল বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইতেছে; কোথাও বা দূরে মাতঙ্গদল সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে।

জানকী রামের বাহু অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সমুদয় বিচিত্র শোভা দেখিয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করিলেন। তাঁহার পরিম্লান মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল এবং চক্ষুর্দ্বয় প্রভাসম্পন্ন হইল। তিনি ভাবাবেশে নির্ব্বাক্ ও বনভ্রমণজনিত ক্লেশরাশি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তিনি একবার সেই বনস্থলীর সৌন্দর্য্যের দিকে এবং একবার প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে স্বামীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনোমধ্যে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিমল প্রীতিলাভ করিলেন এবং সমুচিত অভ্যর্থনা ও সংকার দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন।

যে কারুণিক কবির অমৃতময়ী লেখনী হইতে এই পবিত্র রামকথা নিঃসৃত হইয়া ভারতবাসিগণের কর্ণকুহরে আজ সহস্র সহস্র বৎসর সুধাবর্ষণ করিতেছে এবং প্রতিনিয়ত কোটি কোটি দুর্ব্বল মানবকে সাধুতা সত্যপরায়ণতা ও পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করিয়া সংসারে ধর্ম্মের প্রভাব এখনও অপ্রতিহত রাখিয়াছে, সেই কবিকুলচূড়ামণি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে মহানুভব রামচন্দ্রের এই প্রথম পদার্পণকথা মনোমধ্যে কি সুগম্ভীর ভাবরাশিরই সমুদ্রেক করিতেছে! এখনও মহর্ষি ক্রৌঞ্চবধে শোকসন্তপ্ত হইয়া অকস্মাৎ সুললিত শ্লোক উচ্চারণ করেন নাই, এখনও রামায়ণ রচনা করিবার কোন ইচ্ছাই তাঁহার মনে সমুদিত হয় নাই; এখনও তিনি একটীবার স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে, তাঁহার অতিথি এই সত্যব্রত অরণ্যচারী রাজকুমারের অলৌকিক গুণরাশিই জগতে তাঁহার অতুল

কীর্ত্তিস্থাপনের একমাত্র কারণ হইবে! হয়ত বাল্মীকি তৎকালে রামচন্দ্রের অসাধারণ পিতৃভক্তির কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কেবলমাত্র বিস্ময়সম্বলিত এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে ভাসমান হইয়াছিলেন, হয়ত সেই আশ্রমে দেবরূপিণী, পবিত্রতার দীপ্তিময়ী প্রতিমূর্ত্তি, স্বামীর সহিত অরণ্যচারিণী, নবযৌবনসম্পন্না জানকীদেবীকে সেই প্রথম সন্দর্শন পূর্ব্বক মানসচক্ষে দেবরাজ্যের অস্পষ্ট ছায়া অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং অমিততেজা লক্ষ্মণের অলোকসাধারণ ভ্রাতৃভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন পর্য্যন্তও রামচন্দ্রের সহিত আপনার দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা একটীবারও চিন্তা করেন নাই। দশরথতনয় রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রিয়তমা পত্নীর সহিত অরণ্যপর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ রাজভক্তি ও আতিথেয়তার বশবর্ত্তী হইয়াই বাল্মীকি তখন তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন মাত্র।

সেই নির্জ্জন রমণীয় বনপ্রদেশে বাস করিতে রামের একান্ত ইচ্ছা হইল। তিনি লক্ষ্মণকে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা এক কুটীর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিক্ কাষ্ঠাবরণে আবৃত এবং উপরিভাগ শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইল। তাহার অভ্যন্তরে একটী বেদিও প্রস্তুত হইল। কুটীরখানি পরম সুন্দর হইয়াছে দেখিয়া, রামচন্দ্র যথাবিধি যাগযজ্ঞাদি সমাপনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সীতার

সহবাসে ও লক্ষ্মণের পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রম ও তৎসন্নিহিত বন ও উপবনের শোভা দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; তিনি স্বামীর সহিত চিত্রকূটের নানাস্থানে হরিণীর ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ ও প্রিয়তমের প্রণয়োজ্জ্বল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া স্বর্গসুখও তুচ্ছ করিয়াছিলেন। শ্যামলবিটপিশোভিত মনোহর বন অথবা পবিত্র আশ্রমই যেন তাঁহার প্রকৃত গৃহ ছিল। হায়, মন্দভাগিনী জানকী স্বামীসহ বাল্মীকির আশ্রমের চতুর্দ্দিকে মহোল্লাসে পরিভ্রমণ করিতে করিতে একটী দিনও আশঙ্কা করেন নাই যে, অন্যত্র তাঁহারই রমণীয় আশ্রমে আবার একদিন তাঁহাকে স্বামিবিরহে বিলাপ করিয়া রোদনধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে হইবে!

রাম প্রিয়তমা পত্নী ও অনুগত ভ্রাতার সহিত চিত্রকূটে সুখে বাস করিতে থাকুন, ইত্যবসরে আমরা তাঁহার বিরহে অযোধ্যা-নগরীর কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা একবার দেখিয়া আসি। শূন্যরথ লইয়া সুমন্ত্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, রামের বনবাসসম্বন্ধে লোকে নিঃসংশয় হইয়া আবার শোকে অভিভূত হইল। মহারাজ দশরথ বিলাপ করিতে করিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তিনি শোকাকুল মহিষীগণকে বিশেষতঃ কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে; তিনি রামের অদর্শনে আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না। তখন কৌশল্যা স্বয়ং সংযতচিত্ত হইয়া রাজাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্রনির্ব্বাসনের ষষ্ঠ দিবসের রজনীতে মহারাজ দশরথ রামের

জন্য বিলাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার শয্যাসন্নিধানে মহিষীগণ নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মৃত্যুরূপিণী শোকাবহ দুর্ঘটনা অবগত হইলেন না।

রজনী প্রভাত হইলে, তাৎকালিক প্রথানুসারে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিয়া স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূত-পূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিয়া করতালিপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালিশব্দে বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে যে সকল পক্ষী ছিল, তাহারা জাগরিত হইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল। পবিত্রস্থান ও তীর্থের নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। সেবানিপুণ স্ত্রীলোকেরা ও বৃদ্ধ পরিচারকগণ আগমন করিল। কেহ কলসে স্নানার্থ হরিচন্দনসুরভিত সুশীতল জল লইয়া আসিল। কুমারী ও সাধ্বী মহিলাগণ মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক, এবং পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে মহারাজের যে যে দ্রব্য আবশ্যক হয়, সমস্তই আনীত হইল; কিন্তু সুপ্ত রাজা কিছুতেই যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হইলেন না। তখন মহিষীগণ সোৎকণ্ঠচিত্তে মহারাজের শয্যাসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক সভয়ে দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে! শোকের উপর এইরূপ দারুণ শোক উপস্থিত হইলে, সেই সুন্দর রাজসংসার মুহূর্ত্ত মধ্যে এক ভীষণ দৃশ্যে পরিণত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে শোক-তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতে লাগিল এবং নাগরিকেরা বিষাদে আপনাপন

কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া ম্লানমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। রামলক্ষ্মণ বনবাসে আছেন; সুশীল ভরত, কুমার শত্রুঘ্নের সহিত, মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন; তাঁহারা অযোধ্যা নগরীতে এই দুই আকস্মিক বিপৎপাতের কথা কিছুই অবগত নহেন। মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কোন পুত্রই নিকটে নাই। সুতরাং বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মৃতদেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপিত করিতে আদেশ করিলেন এবং ভরতকে অযোধ্যায় শীঘ্র আনয়নের নিমিত্ত তদ্দণ্ডেই দ্রুতগামী দূতসকল প্রেরণ করিলেন।

দূতেরা যথাসময়ে কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইয়া ভরতকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে ত্বরা প্রদান করিল; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে কোন কথাই প্রকাশ করিয়া বলিল না। ভরত গিরিব্রজ নগর হইতে অযোধ্যায় সপ্তমদিনে উপস্থিত হইলেন। তিনি উৎকণ্ঠিতমনে আগমন করিতেছিলেন, দূর হইতে অযোধ্যাকে শ্রীহীন দেখিয়া আরও ব্যাকুল হইলেন। ভরত দীনমুখে ব্যাকুলচিত্তে জননীর গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতা ও রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি প্রিয়জনগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈকেয়ী বহুকাল পরে বৎস ভরতকে দেখিয়া প্রথমে পিত্রালয়ের শুভসংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে অম্লানবদনে রামের বিরহে রাজা দশরথের মৃত্যুকথা উদ্গীর্ণ করিলেন এবং ভরতের সন্তোষবিধানার্থ সেই সঙ্গে রাম-বনবাস-সংক্রান্ত সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন! কুমার ভরত এই দুই মর্ম্মঘাতী অপ্রিয়সংবাদ শ্রবণমাত্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সহসা ধরাতলে পতিত হইলেন; তিনি বহুক্ষণপরে চেতনালাভ করিয়া শোকে ও রোষে কখনও

বিলাপ এবং কখনও বা দুর্ব্বৃত্তা কৈকেয়ীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শোকার্ত্ত শত্রুঘ্ন পাপীয়সী মন্থরাকে সমস্ত অনিষ্টের মূল জানিয়া তাহার অতিশয় দুরবস্থা সম্পাদন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠাদি অমাত্যগণ কুমার ভরতের শোকাপনোদন করিয়া তাঁহাকে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। দশরথেব মৃতদেহ তৈলদ্রোণি হইতে উত্তোলিত হইয়া সরযূতীরে আনীত এবং চন্দনাদি সুগন্ধকাষ্ঠরচিত প্রজ্বলিত চিতামধ্যে সংস্থাপিত হইয়া ভস্মীকৃত হইল। ভরত শত্রুঘ্ন ও কৌশল্যাদি মহিষীগণ মহারাজের দেহরত্ন ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে পৌরবর্গ হাহাকার করিয়া উঠিল। ভরত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক পরলোকগত পিতা এবং বনস্থিত রাম লক্ষ্মণ ও সীতার শোকে বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। অমাত্যগণ অনেক অনুনয় সহকারে তাঁহাকে পিতৃপ্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে তদ্বিষয়ে সম্মত করিতে পারিলেন না। ভরত সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া লোকাভিরাম রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং তদুদ্দেশে অশৌচান্তে অমাত্যবর্গ, মাতৃগণ, সৈন্যসামন্ত, অনুচরবর্গ এবং অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভরতের আজ্ঞানুসারে পথশোধকেরা পূর্ব্ব হইতেই পথসকল প্রস্তুত, পরিষ্কৃত ও সমতল করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা গমনকালে কোন ক্লেশই প্রাপ্ত হইলেন না। রাম যেখানে যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সেই

স্থান অবলোকন করিয়া ভরত শোকসন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে নিষাদরাজ গুহের নৌকাযোগে গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের আগমনসংবাদ অবগত হইয়া পুলকিত, এবং তপঃ-প্রভাবে সকলের সমুচিত সংকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষিপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারা অনতিবিলম্বে চিত্রকূটে উপনীত হইলেন। ভরত, সৈন্য ও অনুচরবর্গকে দূরে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কেবলমাত্র শত্রুঘ্ন সুমন্ত্র ও নিষাদরাজের সমভিব্যাহারে, রামচন্দ্রের পর্ণকুটীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে রামচন্দ্র দূর হইতে সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণ এবং অরণ্যমধ্যে সন্ত্রস্ত মৃগসকলের ইতস্ততঃ পলায়ন দর্শন করিয়া, কুমার লক্ষ্মণের সাহায্যে, প্রকৃত ঘটনা অবগত হইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি মনোমধ্যে নানারূপ বিতর্ক করিয়া অবশেষে ইহাই অবধারণ করিলেন যে, সর্ব্বাধিপতি পিতা অথবা কুমার ভরতই তাঁহার নিকট আগমন করিতেছেন। এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে ভরত আসিয়া তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইলেন, এবং রামলক্ষ্মণের তাপসবেশ অবলোকন ও পিতার পরলোকগমন স্মরণ করিয়া অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামচন্দ্রের তাপসবেশে বনগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবধি স্বয়ং জটাবল্কল ধারণ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি পিতৃশোকে কাতর হইয়া অতিশয় কৃশ এবং

দুর্ব্বলও হইয়াছিলেন; সুতরাং রাম তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারিলেন না। নিমেষমধ্যে ভ্রম বিদূরিত হইলে, রামচন্দ্র ব্যগ্রতা-সহকারে সস্নেহে ভরতকে উত্তোলন পূর্ব্বক গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন, এবং জনক জননী ও রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরতের মুখে মহারাজের মৃত্যুরূপ দুঃসংবাদ অবগত হইবামাত্র, রাম ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, মন্দাকিনীজলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে মহারাজের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণক্রিয়া সমাধা করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে ভগবান্ বশিষ্ঠের সহিত, কৌশল্যাদি মহিষীগণ কুটীরে উপস্থিত হইলে, সকলে আবার প্রবল শোকতরঙ্গে ভাসমান হইতে লাগিলেন। আতপ-তাপে মলিনমুখী জানকী, শ্বশ্রূগণের সহিত মিলিত হইয়া, পরলোক-বাসী শ্বশুরের জন্য অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ভরত বিনয় ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্য-ভার গ্রহণ করিতে অনুনয় করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণ-গণ, অমাত্যগণ, পৌরগণ ও জানপদবর্গ সকলেই ভরতের প্রার্থনা সমর্থন করিলেন, কিন্তু সত্যব্রত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র তাঁহাদের সে প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। রাম তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ভরতকেই রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং তিনি যে পিতৃসত্য পালন না করিয়া অযোধ্যায়

প্রত্যাগত হইবেন না, তাহাও স্পষ্টরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। ভরত রামচন্দ্রের অটল সঙ্কল্পদর্শনে নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাঁহার স্বর্ণপাদুকাদুটি ন্যাসস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। ভরত অমাত্যগণের পরামর্শে রামের পাদুকা লইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অনুক্রমে মাতৃগণ ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সকলে শোকসন্তপ্তহৃদয়ে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেই ঘোর বনে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। ভরত পাদুকাযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে তাহা রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া তথায় তপস্বিবেশে অবস্থান ও সেই স্থান হইতেই সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে, রাম চিত্রকূটেই পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, চিত্রকূটবাসী তাপসগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে গোপনে কি জল্পনা করিতেছেন এবং এক একবার রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রূকুটীসঞ্চালন করিতেছেন। রামচন্দ্র তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া কুলপতিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং প্রত্যুত্তরে অবগত হইলেন যে, তাপসগণ রাম লক্ষ্মণ অথবা সীতার ব্যবহারে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই; পরন্তু সেই অরণ্যচারী খরদূষণ প্রভৃতি দুষ্ট রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া নিরীহ ঋষিগণের উপর ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, এই নিমিত্ত তাঁহারা চিত্রকূটসন্নিহিত আশ্রমসকল পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণ অন্য কোনও প্রদেশে গমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। তাঁহারা কহিলেন, রামচন্দ্র ভার্য্যার সহিত অরণ্যে বাস করিতেছেন; তাঁহারও সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। তিনিও ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদের সহিত সেই নিরুপদ্রব স্থানে গমন করিতে পারেন।

অনেকানেক ঋষি সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন; যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহারা রামের ভুজবলের আশ্রয়ে চিত্রকূটেই বাস করিতে লাগিলেন। স্বরূপা জানকী ঋষিগণের পরিচর্য্যা করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেন, কখনও বা

স্বামীর সহিত মন্দাকিনীতটে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার শোভা এবং হংসসারস ও কারণ্ডবগণের জলক্রীড়া দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেন। কিন্তু ভরতের সৈন্য ও অনুচরবর্গ এবং হস্ত্যশ্বসকল সেই অরণ্যের অপূর্ব্ব শ্রী বিনষ্ট করিয়াছিল; সুতরাং রাম চিত্রকূটে আর পূর্ব্ববৎ আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। বিশেষতঃ লোকালয়ের সন্নিহিত বলিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন; অধিকন্তু, চিত্রকূটে তিনি ভরত, মাতৃগণ ও পুরবাসীদিগকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা সকলেই রামের শোকে আকুল, রামও তাঁহাদিগকে কোন মতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না, এই কারণে অন্যত্র গমন করাই তাঁহার শ্রেয়স্কর বোধ হইল।

রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, ঋষিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি আতিথ্যসৎকার দ্বারা তাঁহাদের যথেষ্ট সমাদর করিতেছেন, ইত্যবসরে অত্রিপত্নী ধর্ম্মপরায়ণা অনসূয়া তথায় আগমন করিলেন। এই মহাভাগা তপোবলসম্পন্না, সর্ব্বজনপূজনীয়া ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধা, সর্ব্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল ও কেশরাশি জরাপ্রভাবে শুক্ল। বায়ুভরে কদলীতরুর ন্যায় তিনি অনবরত কম্পিত হইতেছিলেন। সীতা স্বামীর আদেশে তাপসীর সন্নিধানে গমন করিয়া স্বনাম উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অনসূয়া তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন,

"জানকি, তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয়বোধ করেন, তাঁহার সদ্গতিলাভ হয়। পতি দুঃশীল স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সঞ্চিত-তপস্যার ন্যায় সর্ব্বাংশে স্পৃহণীয় স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগসাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল স্বৈরিণী এই সমস্ত গুণদোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জানকি, তাদৃশী দুশ্চরিত্রারা অধর্ম্মে পতিত ও অযশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায়, স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক।" (২।১১৭)

বৃদ্ধা ঋষিপত্নীর এই উপদেশবাক্যের প্রকৃত মূল্য জগতে পাওয়া যায় না। পাতিব্রত্যধর্ম্মের এরূপ উচ্চ আদর্শ সংসারে অতিশয় দুর্লভ। এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নারীগণ আপনাদিগকে পরিচালিত করিলে সংসারক্ষেত্র স্বর্গের শোভা ধারণ করিবে। প্রার্থনা করি, এই অমূল্য উপদেশমালা নারী-মাত্রেরই কণ্ঠহার হউক!

যিনি যে বিষয়টি প্রাণতুল্য ভালবাসেন এবং তাহার পালনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন ও তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহাকে সে বিষয়ে কোন উপদেশ প্রদান করিলে,

তাঁহার মনোমধ্যে কেমন এক প্রকার অসহিষ্ণুতা আসিয়া উপস্থিত হয়, কেমন এক প্রকার বিরক্তিভাবে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। জননীকে পুত্রস্নেহ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলে, তাঁহার মনে যেরূপ বিচিত্রভাবের উদয় হয়, পতিব্রতাকেও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলে, তাঁহার হৃদয়ও তদ্রূপ ভাবের লীলাভূমি হইয়া থাকে। সীতাকে যখনই কেহ পতিপরায়ণতা-সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখনই আমরা তাঁহার বাক্যে কেমন এক প্রকার অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তি লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহাকে যেন সে সম্বন্ধে কোন উপদেশপ্রদানের আবশ্যকতাই নাই! সত্য বটে, সীতার মনে কোন অহঙ্কার ছিল না এবং তিনি আপনাকে পতিভক্তিসম্বন্ধে সমস্ত উপদেশের বহির্ভূতও মনে করিতেন না; বরং স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনসম্বন্ধে তাঁহাকে যাহা বলা হইত, তিনি সযত্নে তাহা গ্রহণ করিতেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। বালিকাবয়সে এরূপ উপদেশ সীতার পক্ষে অমূল্য রত্নস্বরূপ ছিল। কিন্তু এখন তিনি যৌবনারূঢ়া; এ সময়ে বিশেষ কোন উপদেশের সাহায্য ব্যতিরেকেও, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামীর চরণতলে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং অকপট অনুরাগভরে সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। সামান্য উপদেশমধ্যে সাধারণতঃ যে কার্য্যানুষ্ঠানের শাসন থাকে, সীতাদেবী পতিপ্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া তদপেক্ষাও গুরুতর কর্ত্তব্যপালনে সর্ব্বদাই তৎপর আছেন এবং উপযুক্তস্থলে নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞানের সমুচিত পরিচয়ও প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে সীতাদেবী এক্ষণে পাতিব্রত্যরূপ ধর্ম্মরাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে পতিভক্তি সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিষয়ের উপদেশ দিলে, তাঁহার মনে যে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? তাই রামের বনগমনসময়ে কৌশল্যার উপদেশের প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এই অসহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এবং এই বৃদ্ধা তাপসীকেও প্রত্যুত্তরে যাহা বলিলেন, তাহাতেও পাঠকপাঠিকাগণ উক্ত ভাব লক্ষ্য করিবেন। ফলতঃ এতদ্দ্বারা আমরা সীতার আশ্চর্য্য তেজস্বিতা, উচ্চ প্রকৃতি ও ধর্ম্মবলেরই সম্যক্ পরিচয় পাইতেছি মাত্র।

সীতা অনুসূয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "দেবি, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু আর্য্যে, স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা সবিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দরিদ্র ও দুশ্চরিত্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয়, গুণবান্, দয়ালু, স্থিরানুরাগী ও ধার্ম্মিক এবং যিনি মাতৃসেবাতৎপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজপত্নীকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাম নারীমাত্রকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাপসি, আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্য্যা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই, এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই।

ফলতঃ পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা, আত্মীয় স্বজন এ কথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন এবং আপনিও উহাঁর ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন * * *।" (২।১১৮)

অনসূয়া জানকীর বাক্যে প্রীত হইয়া সস্নেহে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে সুরুচির মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিলেন। সেই অঙ্গরাগে সীতার দেহ অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইল। ঋষিপত্নী এইরূপে সীতার সম্মান ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া তাঁহার নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ও স্বয়ম্বর প্রভৃতি অপূর্ব্ব কথা শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রি সমাগত হইলে, অনসূয়া বলিলেন "জানকি, সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিসেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধুর কথা কীর্ত্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করিলে, এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।"

সীতা তাঁহার আদেশানুসারে নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম সীতাকে সন্দর্শন করিয়া অনসূয়ার প্রীতিদানে পরম সন্তোষলাভ করিলেন। লক্ষ্মণও সীতাদেবীর এই সৎকারনিরীক্ষণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীষণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই মহারণ্য দূর হইতে ঘনকৃষ্ণ নিবিড় মেঘমালার ন্যায় পরিদৃষ্ট

হইতেছিল। তাহা সুবিশাল তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও দুশ্ছেদ্য লতাজালে সমাকীর্ণ; তন্মধ্যে নিরন্তর ঝিল্লিকাধ্বনি হইতেছে এবং বিহঙ্গমকুল ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতেছে। কোথাও ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, কোথাও বা বিকটাকার রাক্ষসগণ সকলের মনে সন্ত্রাস সমুৎপন্ন করিয়া নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতেছে। স্থলে স্থলে ঋষিজনসেবিত মনোহর আশ্রম-সকলও বনবিভাগ আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, তাহাদের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিলেন এবং পবিত্রস্বভাব তপস্বিগণও তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী এতদিন মহারণ্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যদর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছিলেন এবং বনভ্রমণলালসাও তাঁহার মনে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। মহাবীর রামচন্দ্রের ভুজবলের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত বনবাসজনিত বিশেষ কোন কষ্টই প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু বনবাস যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের নহে এবং সেখানে যে মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর বিপদ সকলও উপস্থিত হয়, একদিন সীতা তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। একদা প্রভাতকালে রামচন্দ্র মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই, বিরাধনামে এক বিকটদর্শন রাক্ষস আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং সীতাকে স্কন্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক রাম-লক্ষ্মণের বিনাশসাধনে যত্নবান্ হইল। রাম সীতার এই আকস্মিক বিপৎপাতে শোকাকুল হইলেন, এবং তদ্দণ্ডেই ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দুষ্ট নিশাচরকে

শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। রাক্ষস রামশরে তাড়িত হইয়া সীতাকে ভূমিতলে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভ্রাতৃযুগলকে রোষভরে আক্রমণ করিল, এবং তাঁহাদিগকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। সীতাদেবী স্বামী ও দেবরের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া, বিগ্না কুররীর ন্যায়, ক্রন্দন করিতে করিতে রাক্ষসের অনুসরণ করিলেন এবং করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন "রাক্ষস, তুমি এই সুশীল ও সত্যপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর এবং উহাঁদের পরিবর্ত্তে আমাকে লইয়া যাও।" রাম-লক্ষ্মণ সীতার বিলাপ শ্রবণ করিয়া বিরাধের বাহুযুগল ভগ্ন করিলেন এবং তাহাকে ভূমিতলে আকর্ষণ ও অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিলেন। বিরাধ প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহারা অচিরে ভয়বিহ্বলা জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন।

জানকী এই এক ঘটনা হইতেই বনবাসের দুঃখসকল অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। স্বামীর সহিত যে কোন কষ্ট সহ্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। স্বামিবিরহিত হইয়া স্বর্গসুখও মিথ্যা। যাহা হউক, সীতার মনে কোন শঙ্কা না হইলেও রাম ও লক্ষ্মণ অতঃপর বিশেষ সতর্কতার সহিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অরণ্য অতিশয় দুর্গম, এরূপ অরণ্যে তাঁহারা আর কখনও প্রবেশ করেন নাই। তাই রামচন্দ্র একটী নিরুপদ্রব ও ভয়শূন্য স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনতিদূরে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রম ছিল। তাঁহারা আশ্রম

মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে, রাম বলিলেন "তপোধন, এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন।" তখন শরভঙ্গ রামকে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়া তাঁহারই সমক্ষে অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, সেই আশ্রমবাসী ঋষিবর্গ রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দুরন্ত রাক্ষসগণের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন। রাজাই ধর্ম্মের রক্ষক; সুতরাং তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা না করিলে কে আর তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে? ঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। রাম পিতৃসত্যপালনার্থ দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই ঋষিগণের আজ্ঞাধীন; যাহাতে তাঁহারা নিরুপদ্রবে ধর্ম্মসাধন করিতে পারেন, রাম তদ্বিষয়ে অবশ্যই প্রাণপণে সহায়তা করিবেন। তিনি বীর লক্ষ্মণের সাহায্যে ঋষিকুলকণ্টক রাক্ষসগণকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন। এইরূপে ঋষিগণকে আশ্বস্ত করিয়া রাম তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে উপনীত হইলেন।

সুতীক্ষ্ণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে তাঁহারই আশ্রমে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু রাম মহর্ষির প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনন্তর সকলে সুখে সেই নিশা মহর্ষির আশ্রমে যাপন করিলেন।

পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে, রাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “ভগবন্, আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে অনুমতি করুন, প্রস্থান করি। এই দণ্ডকারণ্যে পুণ্যশীল ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে আমাদের একান্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং এই তাপসেরাও আমাদিগকে তদ্বিষয়ে বারম্বার ত্বরা দিতেছেন। অতএব এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি ইহাঁদের সহিত আমাদিগকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন।” এই বলিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিও তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দণ্ডকারণ্য-পর্য্যটনের পর পুনরায় তাঁহার আশ্রমে আগমন করিতে অনুরোধ করিলেন।

যেদিন রামচন্দ্র ঋষিগণের সমক্ষে রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সীতার মন নানা চিন্তায় আকুল হইয়াছিল। সীতাদেবী রামকে কোন একটী কথা বলিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত অবসরাভাবে তিনি এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। সীতা রামচন্দ্রের কেবলমাত্র পত্নী বা সহচারিণী সখী ছিলেন না, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও জীবনপথের একমাত্র সঙ্গিনী। সীতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, ধর্ম্মসাধনই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং বিবাহই সেই ধর্ম্মসাধনের পরম সহায়। এই নিমিত্তই বিবাহের এত পবিত্রতা! পবিত্র বিবাহসূত্রে গ্রথিত হইয়া দুইটী মানবাত্মা একত্রীভূত হয় এবং উভয়ে পরস্পরের বলে বলীয়ান্ হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। কেবল বিবাহদ্বারাই দুইটি অপূর্ণ মানব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বামী

আপনার পুণ্যবলে স্ত্রীকে রক্ষা করেন এবং স্ত্রীও আপনার পুণ্যবলে স্বামীকে রক্ষা করেন। দুইয়ের মধ্যে একের হীনতা থাকিলে অন্যেরও হীনদশা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত মানবজীবনের পূর্ণত্ব বিকাশ করিতে হইলে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই অক্ষয় ধর্ম্মবল সঞ্চয় করিতে হয়। যেখানে ধর্ম্মে স্ত্রীর অধিকার নাই এবং স্বামীও তৎকর্তৃক পরিচালিত হন না, সেখানে বিবাহ প্রকৃত বিবাহনামের যোগ্যই নহে, সেখানে পত্নীর আবার পত্নীত্ব কোথায়? স্ত্রীর কর্ত্তব্য ও অধিকার কি, আমাদের সীতাদেবী তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি স্বামীর কেবলমাত্র দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলচিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন না, তিনি তাঁহার আত্মারও মঙ্গলকামনা করিতেন। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বামী ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে পারেন, সীতা সযত্নে ও সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন। সত্য বটে, জনকতনয়া স্বামীকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও নির্ম্মল ধর্ম্মজ্ঞানেও বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিতেন। রামচন্দ্র যে সীতা অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং তিনি যে কদাচই সীতার উপদেশের পাত্র নহেন, সীতাদেবীর ইহাও বিলক্ষণ হৃদ্বোধ ছিল। কিন্তু তাঁহার এ জ্ঞান থাকিলেও, তিনি প্রিয়তম আর্য্যপুত্রকে কখন কোনও অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে, মৃদুমধুর বাক্যে তাঁহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেন এবং তাহা হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সীতাদেবী আপনার এই অধিকারটি উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, রামচন্দ্রও

কখনও সীতার হিতকর বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিতেন না; তিনি শুদ্ধস্বভাবা জানকীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রদ্ধাই তাঁহাদের প্রেমের মূলভিত্তি ছিল। যেখানে এই মূলভিত্তি বিদ্যমান নাই, সেখানে পবিত্র প্রেম কিরূপে বিরাজিত থাকিবে?

যাহা হউক, ভর্ত্তাকে কোন একটী কথা জ্ঞাপন করিতে সীতা বড় সমুৎসুক হইয়াছিলেন। রাম, ঋষিগণসমক্ষে রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করিলে, সীতার ধর্ম্মপ্রবণ সরল মন চমকিত হইয়া উঠিল। সীতা সম্ভবতঃ বিদুষী ছিলেন না; ইদানীন্তন কালের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষা তৎকালে বহুলরূপে প্রচলিত ছিল না; সুতরাং সীতাদেবী হয়ত স্বয়ং কোন শাস্ত্রগ্রন্থই পাঠ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানলাভের কোনও ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই। পিতৃগৃহে পূজ্যপাদ জনক ও ঋষিগণের মুখে, এবং শ্বশুরালয়ে স্বয়ং স্বামীর নিকটে, তিনি অনেক শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। উপদেশ লাভ করিলেই যে বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞান হয়, আমরা সে কথা বলিতেছি না; ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জীবনে সাধনের সামগ্রী। সীতা বিদুষী না হইলেও, নিজজীবনে এই ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, সুতরাং ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। স্বামী তাপসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক যে হিংসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। রামচন্দ্র যখন রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করেন, তখনই সীতা তাঁহাকে নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সম্মুখে লজ্জাবশতঃ তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। আজ সুতীক্ষ্ণের আশ্রম হইতে পথে যাইতে যাইতে, সীতা অবসর বুঝিয়া রামকে

বলিতে লাগিলেন "নাথ, ধর্ম্ম অতিশয় সূক্ষ্মবিধানের গম্য; সর্ব্ব প্রকার ব্যসন হইতে মুক্ত না হইলে কদাপি ধর্ম্মলাভ হয় না। ব্যসন তিনপ্রকার;—মিথ্যাকথন, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা ও বৈর ব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি দোষ তোমাকে কখনও স্পর্শ করে নাই; তুমি সততই সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জগদ্বিখ্যাত আছ। কিন্তু, নাথ, তোমাতে অকারণ প্রাণিহিংসারূপ কঠোর ব্যসনটি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। তুমি বনবাসী ঋষিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষসবধ স্বীকার করিয়াছ; এবং সেই নিমিত্তই ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্মণের সহিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে। আমি তোমার কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতেছি, তোমার সুখ ও সুখসাধনই বা কি, চিন্তা করিতেছি; চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরূপ ইচ্ছা নহে। তথায় গমন করিলে, নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে, ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সবিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।" (৩।৯)

এই বলিয়া সীতা এক আখ্যা কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্র কোন এক ঋষির তপোবিঘ্নমানসে তাঁহার নিকট একটী খড়্গ ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া যান। ঋষি ন্যাসরক্ষাতৎপর হইয়া খড়্গ ব্যতীত কোথাও যাইতেন না। এইরূপে খড়্গের নিত্যসংস্পর্শে ঋষি প্রাণিহত্যায় মত্ত হইলেন, এবং অত্যল্পকালমধ্যে তাঁহার সমুদায় তপস্যাও বিনষ্ট হইয়া গেল! অতঃপর সীতা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহি-

লেন "নাথ, আমি তোমায় শিক্ষাদান করিতেছি না; অস্ত্রসংস্রবে লোকের যে চিত্তবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, আমি স্নেহ ও বহুমান-বশতঃ তোমাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিলাম। অপরাধ না পাইলে, কাহাকেও হত্যা করা উচিত নহে; বনবাসী আর্ত্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয়বীর শরাসনে এই পর্য্যন্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, আর বনই বা কোথায়? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কোথায়, আর তপস্যাই বা কোথায়? এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী; ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম্ম, তুমি তাহারই সম্মান কর। তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম্ম হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়; তুমি সকলই জান; তোমায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে, এমন কে আছে? আমি কেবল স্ত্রীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং যাহা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান কর।" (৩৷৯)

সীতা এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, ধর্ম্মপরায়ণ রাম পতিপ্রণয়িণী প্রিয়তমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। দণ্ডকারণ্যচারী রাক্ষসগণ তপোনিরত নিরীহ ঋষিবর্গকে বিনষ্ট এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদের তপোবিঘ্ন সমুপন্ন করিতেছে। ঋষিকুল রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আর্ত্তকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। রাম সেই ক্ষাত্র-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাদিগকে অভয়প্রদান করিয়াছেন। নরমাংসলোলুপ রাক্ষসগণকে বধ করিয়া অরণ্যকে নিরুপদ্রব করা রামের একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে বলিতে লাগিলেন "জানকি, আমি ঋষিগণের

রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু একবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। প্রার্থনা না করিলেও যাহা করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব? জানকি, তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্যনিবন্ধন যাহা কহিলে, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে না। তুমি যেরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও অনুরূপ সন্দেহ নাই। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সঙ্কল্পে অনুমোদন কর।" (৩।১০)

সীতাদেবীর ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে রামের প্রত্যুত্তর যাহাই হউক না কেন, পরস্পরের মধ্যে রাম ও সীতার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, এবং সীতা স্বামীর প্রতি আপনার কর্ত্তব্যগুলি কেমন সুন্দররূপে পালন করিতে যত্নবতী ছিলেন, ইহাই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা রামায়ণ হইতে উল্লিখিত কথোপকথনগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি, পাঠকপাঠিকাগণ স্বামী স্ত্রীর এই সম্বন্ধটি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

রাম, সুরূপা জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সহিত, সেই দণ্ডকারণ্যের নানাস্থল পর্য্যটন করিলেন। তাঁহারা কত আশ্রম, নদ নদী, গিরি গুহা, বন উপবন, পল্বল সরোবর দর্শন করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন; কোথাও নানাবিধ জলচর ও খেচর পক্ষী, কোথাও যূথবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত সশৃঙ্গ মহিষ ও দলবদ্ধ

হস্তী, কোথাও ভীষণ বরাহ ও শাখারূঢ় বানর, এবং কোথাও বা বিকটাকার রাক্ষস দর্শন করিয়া, তাঁহারা হৃদয়মধ্যে কখনও ভয় এবং কখনও বা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রামলক্ষ্মণ কত যে ঋষিতপস্বীর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বিমল প্রীতি লাভ করিলেন, সীতাদেবী কত যে ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যার সহিত সদালাপ করিয়া আনন্দিত হইলেন, এস্থলে তাহা বর্ণনীয় নহে। তাঁহারা কোথাও সম্বৎসর, কোথাও দশ মাস, কোথাও চারি মাস কোথাও দুই মাস, এবং কোথাও বা তদপেক্ষাও অল্প দিন বাস করিয়া সেই অরণ্য মধ্যেই দশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে দণ্ডকারণ্যপর্য্যটন শেষ হইলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়দ্দিন সেই স্থলেই সুখে বাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র, ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত, মহর্ষির আশ্রমে আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, সহসা একদিন মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে তাঁহার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী হইল। মহর্ষির আশ্রম তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল; সুতরাং সুতীক্ষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে তিনি, লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে, তথায় গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সুতীক্ষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা সেই স্থান হইতে দক্ষিণে চারিযোজন পথ অতিক্রম করিয়া অগস্ত্যের ভ্রাতা মহর্ষি ইধ্মবাহের তপোবনে উপস্থিত হইলেন। এই তপোবন অতিশয় রমণীয়। রাম ভ্রাতা ও স্ত্রীর সহিত, তথায় রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন প্রভাতে অগস্ত্যের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে, বনের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত ও পুলকিত হইতে লাগিলেন।

ন্যূনাধিক এক যোজন পথ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই, অদূরে অগস্ত্যাশ্রম পরিদৃষ্ট হইল। রাম তেজঃপ্রদীপ্ত মহর্ষির পবিত্র আশ্রমের শান্তভাব ও শোভা দেখিয়া তৎসন্নিহিত স্থানেই বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

তাঁহারা আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, মহাবীর লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া মহর্ষিসন্নিধানে রামচন্দ্র ও দেবী জানকীর আগমনসংবাদ প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই তাঁহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক আশ্রম মধ্যে আনয়ন করিতে এক সুযোগ্য শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে স্বয়ং অগস্ত্যও রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমনার্থ ঋষিগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন; তিনি অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি প্রীতিসহকারে তাঁহাদের যথাবিধি সৎকার করিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহাকেই দেখিতে আসিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন,

"তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ; রাম, ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ, আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে, অধ্বশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই সুকুমারী কখনও ক্লেশ সহ্য করেন নাই, কেবল পতিস্নেহে দুঃখপূর্ণ বনে আসিয়াছেন। রাম, এস্থানে ইনি যেরূপে সুখে থাকেন, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া, ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য

সাধন করিতেছেন। ইনি সকল প্রকার দোষশূন্যা হইয়া, সুর-সমাজে দেবী অরুন্ধতীর ন্যায়, পতিব্রতার অগ্রগণ্যা হইয়াছেন। বৎস, তুমি ইহাঁকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে, এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।”

রাম মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবচনে কহিলেন “তপোধন, আপনি গুরু; যখন আপনি আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমরা ধন্য ও অনুগৃহীত হই-লাম। যেখানে বন আছে এবং জলও সুলভ, আপনি আমাকে এমন একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন; আমি তথায় কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুখে বাস করিব।” মহর্ষি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামকে সেই স্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামক রমণীয় বনে বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। রাম তাঁহার পরামর্শানুসারে পঞ্চবটী যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় উপনীত হইলেন।

পঞ্চবটী একটী সুন্দর পুষ্পিত কানন। অদূরে নির্ম্মলসলিলা গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছে; স্থলে স্থলে রমণীয় সরোবরে সুগন্ধি পদ্মসকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। গোদাবরীনীরে হংস, সারস ও চক্রবাকসকল অনবরত ক্রীড়া করিতেছে। তীরভূমি কুসুমিত বৃক্ষসকলে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে গভীর অরণ্য; তন্মধ্যে দলে দলে মৃগ সকল সঞ্চরণ করিতেছে। ময়ূরের কেকাধ্বনি ও কোকি-লের কুহু রবে বায়ুমণ্ডল নিরন্তর মুখরিত হইতেছে। কিয়দ্দূরে পর্ব্বতশ্রেণী ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অরণ্যে নানাজাতি বৃক্ষ; শাল, তাল, তমাল, খর্জ্জূর, আম্র, অশোক,

তিলক, চম্পক, কেতকী, চন্দন, শমী, ধব, খদির, কিংশুক প্রভৃতি তরুরাজি, কুসুমিত লতাজালে জড়িত হইয়া, রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। রাম প্রিয়তমা জানকীর সহিত আনন্দোৎফুল্লমনে সেই স্থান অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণকে একটী সুন্দর সমতল ও পুষ্পবৃক্ষপরিপূর্ণ স্থলে কুটীর নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্টস্তম্ভশোভিত সুরম্য এক পর্ণ-শালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল; এবং উহা শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। কুটীরখানি মনোরম হইয়াছে দেখিয়া, রাম অতিশয় প্রীত হইয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সীতাদেবী, সেই নির্জ্জনপ্রদেশের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। মনোরম পঞ্চবটী তাঁহার চক্ষে পিতৃগৃহ অপেক্ষাও সুখকর বোধ হইতে লাগিল।

অষ্টম অধ্যায়।

সুরম্য পঞ্চবটী বনে রাম পরম সুখেই কালযাপন করিয়াছিলেন। নির্জ্জন বন, তাহাতে অগণ্য কুসুমিত বৃক্ষ ও লতা; নানাবিধ পক্ষী তাহাতে বাস করিত। ময়ূরসকল, ময়ূরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাঁহাদের পরিচ্ছন্ন কুটীরাঙ্গনে নৃত্য করিত। রাম জানকীর সহিত মৃগচর্ম্মে উপবেশন পূর্ব্বক তাহাদের নৃত্য দেখিয়া কতই আনন্দলাভ করিতেন। কখন কখন হরিণহরিণীদল শান্তভাবে তাঁহাদের আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিত, এবং এক এক বার হরিণনয়না সীতার মুখপানে বিশ্বাসপূর্ণ বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার নিঃশঙ্কচিত্তে সুকোমল তৃণভক্ষণে রত হইত। সীতার অমানুষী মূর্ত্তি দর্শনে তাহারা সমস্ত আশঙ্কাই পরিহার পূর্ব্বক, গৃহপালিত পশুর ন্যায়, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। কত মনোহর সুকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ পুষ্পিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত গানে সীতার কর্ণকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করিত! সীতা কখন কখন স্বামীর সহিত অরণ্যে ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণকালে তিনি কত সুগন্ধি পুষ্পই চয়ন করিতেন! সেই পুষ্পসকলে সীতা নানা প্রকার ভূষণ রচনা করিয়া অঙ্গে ধারণ করিতেন। রামচন্দ্র জানকীর বনদেবীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতেন। কখন বা রামও তমালবৃক্ষের সুগন্ধি পল্লব দ্বারা সীতার নিমিত্ত মনোহর কর্ণভূষণ রচনা করিতেন, এবং স্বহস্তে তাহা প্রিয়তমার শুভ্র গণ্ডদেশে লম্বিত করিয়া আনন্দিত হইতেন। সীতাও প্রিয়তমের ঈদৃশ আদর ও প্রীতিদানে সম্বর্দ্ধিত

হইয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতেন। লজ্জা ও আনন্দ একত্র সম্মিলিত হইয়া সীতার মুখমণ্ডলে স্বর্গের শোভা আনয়ন করিত। কোন কোন দিন সীতা পতির সহিত কমলদলশোভিত স্বচ্ছ সরোবরে গমন করিয়া স্বহস্তে নানাজাতি কমল উত্তোলন করিতেন; কখনও বা হংসসারসনিনাদিত গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইয়া স্বামীর সহিত তাহার বিচিত্র শোভা দর্শন করিতেন। সীতার চরণে শ্রুতিমধুর নূপুরধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক রাজহংসশ্রেণী গ্রীবা নত করিয়া অস্ফুট স্বরে বিরাব করিতে করিতে তাঁহার পদানুসরণ করিত। কখনও বা সীতা রামের সহিত নির্ভয়ে শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া ভীষণ গুহা, নিম্নোন্নত ভূমি ও কত ভয়ঙ্কর স্থান দর্শন করিতেন। লক্ষ্মণ আলস্যশূন্য হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভ্রাতৃবৎসল এই বীর রাজকুমার ধনুর্ব্বাণহস্তে সেই আশ্রমকে সমস্ত বিপদাশঙ্কা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি গোদাবরী হইতে প্রত্যহ নির্ম্মল জল আনয়ন করিতেন; স্বহস্তে ফল মূল, পুষ্প, কুশ, কাশ ও সমিধ আহরণ করিতেন এবং রাম ও সীতার পরিচর্য্যাতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতেন। সীতাদেবী রামচন্দ্রের সহিত পরিচ্ছন্ন শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক দেবর লক্ষ্মণের প্রশংসা করিয়া কতই আনন্দলাভ করিতেন। রামও লক্ষ্মণের উপর সীতার স্নেহ দর্শন করিয়া অতিশয় পুলকিত হইতেন।

রামচন্দ্র তাপসোচিত সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন করিতেন। তিনি ত্রিকালীন স্নান, দেবোপাসনা, বন্য ফলমূলে জীবনধারণ ও অন্যান্য সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মই সম্পাদন করিতেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী

হইয়া তিনি লক্ষ্মণের সহিত কখন কখন মৃগবরাহ প্রভৃতি জন্তু গণকে বধ করিয়া তাহাদের পবিত্র মাংস ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু তিনি কদাপি অকারণ প্রাণিহিংসাতে মত্ত হইতেন না। তিনি সীতার সহিত বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্নপ্রকার শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতেন। ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন বর্ষাকালে কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহারা স্মৃতির সাহায্যে কখন কখন আপনাদের পূর্ব্বকথা স্মরণ পূর্ব্বক বিষাদের মধ্যেও কেমন এক প্রকার মধুর আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রসন্ন শরৎকালে শুভ্রনীরদখণ্ডশোভিত সুনীল আকাশ, পুষ্পিত কাশ, কুমুদকহ্লার-শোভিত নির্ম্মল সরোবর, পরিস্কৃত বনস্থলী, তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন শ্যামল ক্ষেত্র, পল্লবিত তরু, দোদুল্যমানা কুসুমিতা লতা প্রভৃতি সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহারা অযোধ্যার কত কথাই স্মরণ করিতেন। দারুণ হিমঋতুতে পত্রপুষ্পশূন্য বৃক্ষরাজি, নীহারক্লিষ্ট বিশুষ্ক কমল, তৃণশূন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র, ক্ষীণতেজা সূর্য্য, কুজ্ঝটিসমাচ্ছন্ন প্রভাত, নিরানন্দ পক্ষী, ক্ষীয়মাণ দিবস, সুদীর্ঘ যামিনী, তুষারশীতল বায়ু ও ক্বচিৎ মেঘাবৃত আকাশ দেখিয়া তাঁহাদের মনে আনন্দের উদ্রেক হইত না, বরং হৃদয় কখন কখন বিষাদভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িত। সীতা পট্টবস্ত্র ও কাষায়বসন দ্বারা শীত নিবারণ করিতেন; জটাবল্কলধারী রামলক্ষ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ এবং মৃগ ও বন্য মহিষের শুষ্কপুরীষপ্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা কথঞ্চিৎ শীতক্লেশ বিদূরিত করিতেন। কিন্তু যখন বসন্তের মৃদুপদসঞ্চারে মলয়সমীরস্পর্শে পক্ষীর কণ্ঠে সুমধুর গান ফুটিত, তরুদেহে কোমল পল্লবরাজি উদ্ভিন্ন ও পুষ্পরাশি বিকশিত হইত, যখন জলে, স্থলে ও শূন্যদেশে

সঞ্জীবতা ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষিত হইত না, যখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া ধরাকে পুষ্পময়ী বা আনন্দময়ী বলা যাইতে পারিত, তখন তাঁহারা সকলেই হৃদয়ে নববল, নবোৎসাহ ও নব নব আনন্দ অনুভব করিতেন। সীতাদেবী তখন কেবল পুষ্প-চয়নেই ব্যগ্র থাকিতেন, স্বহস্তরোপিত শিশু বৃক্ষগুলির লালন পালনেই ব্যস্ত থাকিতেন, হরিণশিশুদের সহিত ক্রীড়াতেই মত্ত থাকিতেন, এবং ভর্ত্তার সহিত বন, উপবন, গিরি, নির্ঝর প্রভৃতি দর্শন করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক হইতেন।

এইরূপ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে সেই পঞ্চবটীবনে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহাদের একটী গুরুতর বিপৎপাতের উপক্রম হইল। একদিন রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, নিশ্চিন্তমনে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শূর্পণখানাম্নী এক রাক্ষসী সেই অরণ্যে যদৃচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদের সমীপস্থ হইল। রাক্ষসী রামলক্ষ্মণের অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল, এবং নিলর্জ্জার ন্যায় সীতার সমক্ষেই আপনার ঘৃণিত মনোভাব ব্যক্ত করিল। রামলক্ষ্মণ দুর্ব্বৃত্তার নীচাকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন শূর্পণখা তাঁহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়বিহ্বলা সীতাকে ভক্ষণমানসে মুখব্যাদান পূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইল। লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই আচরণ দর্শন করিয়া খড়্গাদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন, কেবল স্ত্রীবধে ঘৃণাবশতঃই তাহার প্রাণনাশ করিলেন না। রাক্ষসী এইরূপে

বিরূপা হইয়া যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

শূর্পণখা রাবণ নামে এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাক্ষসের ভগিনী। রাবণ লঙ্কাদ্বীপের অধীশ্বর। খরদূষণ নামে দুই ভ্রাতা, চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস সৈন্যের সাহায্যে, এই দুর্ব্বৃত্তাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত। পঞ্চবটীর অদূরেই জনস্থান নামক প্রদেশে ইহারা বাস করিত, এবং ঋষিগণের আশ্রমে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের তপোবিঘ্ন সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রাণবিনাশ করিত। শূর্পণখা নাসাকর্ণ-বিহীন হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভ্রাতৃগণের সম্মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিল। রাক্ষসেরা শূর্পণখার দুর্দ্দশাদর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রামলক্ষ্মণের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতে মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। রামচন্দ্র দূর হইতেই রাক্ষসগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া সতর্ক হইলেন। ঘোর সংগ্রাম অনিবার্য্য ভাবিয়া তিনি সীতাদেবীর জন্য চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি লক্ষ্মণকে জানকীর সহিত শত্রুর দুষ্প্রবেশ্য এক গিরিগুহায় আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার ভয় ও বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এদিকে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে চতুর্দ্দিক্‌ হইতে রাক্ষস সৈন্যগণ, প্রবল বন্যাজলের ন্যায়, ভীমপরাক্রমে ও অমিততেজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। মহাবীর রামচন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একাকী তাহাদের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস সৈন্যগণ তাঁহার তীক্ষ্ণ শরজাল সহ্য করিতে অক্ষম হইলে, খরদূষণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তুমুল

সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুতেই রামকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপ বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, তাহারা উভয়েই সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের সহিত রামশরে নিহত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, সীতাদেবী দেবরের সহিত গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং জীবিতেশ্বরকে অক্ষতশরীর দেখিয়া প্রবল বেগে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অশুভক্ষণেই লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে বিকৃতাঙ্গী করিয়াছিলেন। রাক্ষসী সমস্ত সৈন্যের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়কে বনস্থলে নিপাতিত দেখিয়া লঙ্কায় পলায়ন করিল। তথায় সেই অসাধুদর্শিনী অশ্রুপূর্ণলোচনে রাবণকে আপনার দুর্দ্দশা ও খর দূষণ প্রভৃতির বিনাশসংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং রাম লক্ষ্মণকে সংহার করিয়া সেই অসহ্য অপমানের প্রতিশোধ লইতেও উৎসাহিত করিতে লাগিল। সে রাবণকে বলিল যে, সীতার তুল্য রূপবতী রমণী জগতে কোথাও বিদ্যমান নাই। সীতা রূপের ছটায় বনস্থলী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। সীতা অতিশয় পতিপ্রণয়িনী, রাম সীতাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে এবং লক্ষ্মণও রামের একান্ত অনুগত। রাবণ যদি সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে একমাত্র কার্য্য দ্বারা দুই উদ্দেশ্য অনায়াসে সংসাধিত হইবে। প্রথমতঃ, সীতার অভাবে রাম নিশ্চয় প্রাণ-ত্যাগ করিবে, এবং ভ্রাতার মৃত্যু হইলে লক্ষ্মণও আর জীবিত থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাবণ সীতার ন্যায় এক দুর্লভ রমণীরত্ন লাভ করিবেন। রাবণ যে সমস্ত সুন্দরী দেবকন্যা অপহরণ করিয়াছেন, তাহারা কেহই রূপে সীতার সমকক্ষ নহে। এই

উপায় অবলম্বন না করিলে, রাবণ সম্মুখযুদ্ধে রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া কখনই সীতাকে লইয়া আসিতে পারিবেন না। রক্তপাত ব্যতিরেকে যে উপায়দ্বারা অনায়াসেই শত্রুর সমুচ্ছেদ হয়, রাবণের তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

এই রাবণ অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিল! তাহার অমিত পরাক্রম ও প্রভূত ঐশ্বর্য্য; দেবতারাও তাহার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন। রাক্ষস কেবল পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও পাশবিক ক্ষমতালাভের জন্যই বহুকাল দুস্কর তপস্যা করিয়াছিল। সে ঘোর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অনাচারী ও কদাচারী ছিল। সে যে কত শত সুরূপা কুললনাকে পিতা-মাতা ও স্বামীর ক্রোড় হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার জঘন্য চরিত্রের আলোচনা করিলে মনোমধ্যে কেবল বিজাতীয় ঘৃণারই উদ্রেক হইয়া থাকে।

এই দুরন্ত রাক্ষস দুর্ব্বৃত্তা ভগিনীর মুখে সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তল্লাভবাসনায় চঞ্চল হইল। সে ভগিনীর বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিল; এবং স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনার্থ তদ্দণ্ডেই গর্দ্দভবাহিত রথে লঙ্কা হইতে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া রাবণ মায়াবী মারীচের আশ্রমে উপনীত হইল। রাবণ মারীচের নিকট মনোগত দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া তাহাকে নিজ উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়তা করিতে বলিল। মারীচ রামচন্দ্রকে বিলক্ষণ চিনিত। সে সিদ্ধাশ্রমে ষোড়শবর্ষীয় বালকের শরে তাড়িত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং সে রাবণের প্রার্থনায়

কোন মতেই সম্মত হইল না, বরং তাহাকে ঈদৃশ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত করিতে অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিল। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ রাবণ মারীচের বাক্যে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে বিস্তর ভৎর্সনা করিল এবং ভ্রূকুটি সঞ্চালন করিয়া মৃত্যুভয়ও প্রদর্শন করিল। তখন মারীচ আপনার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া, রামশরেই প্রাণত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। রাবণ মারীচকে রজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণময় এক মৃগের রূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের আশ্রমে সীতার মনোহরণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ প্রদান করিল। সীতা সেই অপূর্ব্ব মৃগ দেখিয়া নিশ্চয়ই রামকে তাহা ধরিয়া দিতে বলিবে। রাম মৃগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, মারীচ তাহাকে প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে লইয়া যাইবে এবং অকস্মাৎ "হা লক্ষ্মণ, হা সীতে" এই আর্ত্ত-নাদসূচক বাক্যগুলি তারস্বরে উচ্চারণ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইবে। অনন্তর সীতা সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণমাত্র রামের বিপদা-শঙ্কা করিয়া লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই রামের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিবে। সীতা তখন কুটীরে একাকিনী অবস্থান করিবে। রাবণ সেই অবসরে সীতাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আকাশপথে লঙ্কায় আগমন করিবেন। মারীচ রাবণের এই অসাধু প্রস্তাবে সম্মত হইবামাত্র মন্দভাগিনী সীতার সুখের দিন অবসন্ন হইল।

* * * * *

একদিন সীতাদেবী প্রফুল্লচিত্তে আশ্রমসন্নিহিত কদলীবনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং কখন কখন কর্ণিকার ও অশোকবৃক্ষ

হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনন্দে নানাবিধ ভূষণ রচনা করিতেছেন। অদূরে রামলক্ষ্মণ এক বৃহৎ শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। হরিণহরিণীসকল সীতার নিকটে সুকোমল তৃণদল ভক্ষণ করিতেছে, কখনও বা হরিণশিশুগুলি আনন্দে লম্ফন ও কুর্দ্দন করিতে করিতে এক একবার সীতার সন্নিহিত হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ তড়িদ্বেগে জননীর নিকটে ছুটিয়া যাইতেছে। সীতাদেবী পুষ্পচয়ন করিতে করিতে তাহাদের আনন্দপূর্ণ ক্রীড়া দর্শন পূর্ব্বক মনে মনে কতই আহ্লাদিত হইতেছেন এবং কখন কখন মৃদুমধুর সম্বোধনে তাহাদিগকে আপনার নিকটে আহ্বান করিতেছেন, এমন সময়ে মৃগসকল কোনও কারণে সন্ত্রাসিত হইয়া সহসা বেগে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল! তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, সুন্দর স্বর্ণচর্ম্ম একটী অপরূপ মৃগ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাদের আশ্রমস্থিত মৃগগণের মধ্য উপস্থিত হইয়াছে! সে কখনও কদলীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, কখনও বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, কখনও স্থির হইয়া তৃণপত্র ভক্ষণ করিতেছে, আবার সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ সীতার নয়নপথে পতিত হইতেছে। সেই অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া সীতা হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন "আর্য্যপুত্র, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া একবার এখানে আইস।" রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন করিয়া মৃগকে দর্শন করিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি লক্ষ্মণ মৃগকে দেখিয়াই অতিশয় সন্দিহান হইলেন, এবং উহাকে কোন মায়াবী রাক্ষস জানিয়া রামকে

সীতা ও স্বর্ণ মৃগ।

RAJA RAVI VARMA

সতর্ক করিয়া দিলেন। জানকী সেই মৃগ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন "আর্য্যপুত্র, ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে, এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্যক মৃগ ভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ শান্তস্বভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। এই নানাবর্ণচিত্রিত, শশাঙ্কশোভন, রত্নময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা, উহার কি রূপ! কি শোভা! কি কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ব্ব মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। তুমি যদি উহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, যখন আমরা পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিব, তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে এবং ভরত, তুমি, শ্বশ্রূগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যার পর নাই বিস্মিত করিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।" (৩।৪৩)

স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ বটে, কিন্তু মুগ্ধস্বভাবা সীতা স্ত্রীর কর্ত্তব্যটি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। কত নারী যে কেবল আত্ম-সুখসাধনের নিমিত্তই স্বামীকে কত দুরূহ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সীতার ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে? আমরা অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, স্ত্রী কখনও স্বামীর কাছে কোনও ঈপ্সিত দ্রব্য প্রার্থনা করিবেন না; আমাদের কেবল ইহাই বক্তব্য যে, স্বামীর পক্ষে যাহা দুরূহ, অথবা যাহা করিতে তিনি অক্ষম, এরূপ কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োগ করা পতিপরায়ণার নিতান্তই অকর্ত্তব্য। সীতা রামের নিকট যাহা প্রার্থনা করি-লেন, অবশ্য তাহা রামের পক্ষে অসম্ভব নহে; সীতা তাঁহার সামর্থ্য জানিতেন, তাই তিনি সেই মৃগের অসামান্যরূপে বিমুগ্ধ হইয়া স্বামীর নিকট মৃগ অথবা তাহার সুন্দর চর্ম্মটি প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে আমরা সীতার কোনও দোষ দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু এই ঘটনাটি হইতে সীতার যে দুরবস্থা সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়াই একবার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, সীতা স্ত্রীর কর্ত্তব্যসম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা যদি অন্ততঃ এই ক্ষেত্রেও পালন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখভোগ ঘটিত না।

যাহা হউক, প্রিয়তমা জানকীর এই আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রাম অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, মৃগ যদি সত্য সত্যই মৃগ হয়, তবে তিনি তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া অথবা তাহার মনোহর চর্ম্ম আনিয়া জানকীর

প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। আর সে যদি কোন মায়াবী রাক্ষস হয়, তবে তাহাকে বধ করাই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া রাম হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইলেন। রাক্ষসগণের সহিত রামের সম্প্রতি বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তিনি যাইবার সময় লক্ষ্মণকে জানকীর সহিত কুটীরে সতর্কে অবস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ জানকীকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া যেন কোথাও গমন না করেন। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশে তৎক্ষণাৎ দেবী জানকীর সহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

চর্ম্মের জন্য মৃগকে কেবল বধ করিবার অভিলাষ থাকিলে, রাম সেই স্থান হইতেই শরনিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিতে পারিতেন। কিন্তু সীতার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি তাহাকে জীবিত অবস্থায় ধরিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। মৃগ রামকে ধনুর্ব্বাণহস্তে আসিতে দেখিয়া পলায়নপর হইল। কখনও সে রামের অতিশয় সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিল, কখনও বা সহসা বহুদূরে চলিয়া গেল। এইরূপে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে, রাম আশ্রম হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন; তখন কেমন এক প্রকার সন্দেহ আসিয়া তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিল। তিনি অনতিবিলম্বে ধনুকে এক তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া মৃগকে লক্ষ্য করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে মৃগশরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, একটা বিকটাকার রাক্ষস "হা লক্ষ্মণ, হা সীতে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভূমিতলে পড়িয়াই প্রাণত্যাগ করিল। রাম তদ্দর্শনে সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং রাক্ষসের চীৎকার শ্রবণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল হইলেন।

সীতা ও লক্ষ্মণ কুটীরমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রামের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই দারুণ আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। পতিপ্রাণা সীতা তৎশ্রবণে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। প্রাণনাথ আর্য্যপুত্র কোন রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন; হায়, তাঁহার কি ভয়ঙ্কর বিপদই উপস্থিত হইয়াছে; তিনি আর্ত্তের ন্যায় ভাই লক্ষ্মণ ও মন্দভাগিনী সীতাকে আহ্বান করিতেছেন! সীতার গণ্ডস্থল নয়নজলে ভাসিয়া গেল; তিনি স্থাণুবদ্ধা বন্য-করিণীর ন্যায় সহসা অতিশয় চঞ্চল হইলেন। লক্ষ্মণ সত্বর হউন; লক্ষ্মণ আর্য্যপুত্রকে বিপদ হইতে মুক্ত করুন; লক্ষ্মণ বিলম্ব করিতেছেন কেন? হায়, সীতার অদৃষ্টে যে কত দুঃখই আছে, তাহা কে বলিবে? সীতাকে উন্মত্তার ন্যায় এই রূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, রামের কোথাও ভয় নাই; রাম আর্ত্তের ন্যায় কখনও এইরূপে চীৎকার করেন না; সংসারে কেহই তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে না। কোন মায়াবী রাক্ষস তাঁহাদের অমঙ্গলসাধনের জন্যই তারস্বরে লক্ষ্মণ ও সীতার নাম উচ্চারণ করিতেছে। সীতাদেবী স্থির ও আশ্বস্ত হউন, অধীরা হইলে গুরুতর অনর্থপাতের সম্ভাবনা।

সীতা স্থির ও আশ্বস্ত হইলেন না। লক্ষ্মণের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণ দেখিয়া সীতা তাঁহার সাধুতাসম্বন্ধে দারুণ সন্দেহকে মনোমধ্যে স্থান দিলেন। হায়, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আজ এই কথা স্মরণ করিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সীতা স্ত্রীজনোচিত দুর্ব্বলতাবশতঃ স্বামীর আশঙ্কিত বিপৎপাতে একেবারে

কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সহসা দেবর লক্ষ্মণের গুণগ্রাম ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে স্বামীর স্নেহশূন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতামাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণকে অবিচলিত ও নিশ্চিন্ত দেখিয়া জানকী রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন "নৃশংস, কুলাধম, তুই অতি কুকার্য্য করিতেছিস্; বোধ হয় রামের বিপদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, এই নিমিত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট, ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট, এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে, বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্। কিন্তু তোদের মনোরথ কখনই সফল হইবার নহে। এক্ষণে তোর সমক্ষেই আমি প্রাণত্যাগ করিব; নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি রাম বিনা ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিব না" (৩।৪৫)

পাঠকপাঠিকাগণ, আপনারা কি এই দুর্ম্মুখী সীতাকে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কোথাও দেখিয়াছেন? হায়, দুষ্টা সরস্বতী কি সীতার কণ্ঠে বসিয়া তাঁহাকে এই ঘৃণিত, অযশস্কর ও নীচ বাক্যগুলি উদ্গীর্ণ করাইল? উক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে উন্মাদিনী সীতার জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? সীতা স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে কি একেবারে নরকের মধ্যে নিপতিত হইলেন? দেবর লক্ষ্মণের সাধুতাসম্বন্ধে সীতার সন্দেহ? যিনি সমস্ত আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র ভ্রাতৃপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়াই, জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক, অরণ্যে জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিতেছেন, যিনি বনবাসের প্রারম্ভ হইতে রাম ও সীতার পরি-

চর্য্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত একপ্রকার আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি, আত্মত্যাগের আধার ও অলৌকিক অনুরাগের দৃষ্টান্ত স্থল, যিনি এ পর্য্যন্ত একটী দিনও সীতার বদনমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, যিনি সীতাকে সুমিত্রা অপেক্ষাও অধিকতর ভক্তি করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সীতাও শতমুখে যাঁহার কতবার প্রশংসা করিয়াছেন, সেই দেবর লক্ষ্মণের প্রতি আজ সীতার এই দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ! আমরা প্রথমে বাল্মীকির রামায়ণে সীতার কণ্ঠ হইতে এই পূতিগন্ধময় ঘৃণিত বাক্যগুলি উচ্চারিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলাম! সাধুশীল লক্ষ্মণের সম্বন্ধে সীতার ঈদৃশী ধারণা দেখিয়া আমরা কোন মতেই তাঁহাকে দোষমুক্তা করিতে সমর্থ হই নাই। বলিতে কি, আমরা তাঁহার মুখ হইতে এতাদৃশ বাক্যশ্রবণের কোন প্রত্যাশাই করি নাই। সীতার স্বভাবও পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারকে নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করিয়াছিলাম। তবে সীতার এবম্বিধ মনোবিকার সংঘটিত হইল কেন? সীতা এত আত্মবিস্মৃত হইলেন কেন? আমাদের সেই স্নেহময়ী প্রিয়বাদিনী রমণীশিরোমণি সীতাদেবী আজ প্রাকৃতার ন্যায় পরিলক্ষিতা হইলেন কেন? ইহার সদুত্তর পাইতে হইলে, আমাদিগকে ধীর ভাবে সীতার তাৎকালিক মানসিক অবস্থাটি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। লক্ষ্মণ বীরপুরুষ, তিনি বীর ভ্রাতার সাহস ও তেজস্বিতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন; তিনি আরও জানিতেন যে, রাক্ষসগণের সহিত বিবাদ হওয়া অবধি, তাহারা নানাপ্রকারে তাঁহা-

দের অমঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিতেছে। যে অপূর্ব্ব মৃগ দেখিয়া সীতাদেবী বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই লক্ষ্মণের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দিনের মৃগয়া হইতে যে উল্লিখিত আর্ত্তনাদের ন্যায় কোন একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইবে, তাহাও তিনি এক প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই তিনি শোকবিহ্বলা জানকীকে রামের আর্ত্তনাদ-সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু সীতা কুসুমকোমলপ্রাণা রমণী; তিনি একান্তই পতিপরায়ণা; পতির সামান্য কষ্টেই তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয় ও তাঁহার সামান্য বিপদাশঙ্কাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ তিনি অতিশয় মুগ্ধস্বভাবা; লক্ষ্মণের ন্যায় তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারক্ষমতা ছিল না; সুতরাং তাঁহার ন্যায় তিনি সেই মৃগকে কোন মায়াবী রাক্ষস বলিয়া বিশ্বাস করিতেও সমর্থ হন নাই। মায়াবী রাক্ষসেরা যে উক্তপ্রকার আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহাদের কোন অনিষ্টচেষ্টা করিতে পারে, তাহা তাঁহার হৃদ্বোধই ছিল না। ইহা ব্যতীত তিনি মনোমধ্যে রামচন্দ্রের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা না করিয়া নিশ্চিন্তমনে কুটীরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ সেই হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। পতিপ্রাণার কোমল প্রাণ বিকম্পিত হইল। অবলা সীতা মনে করিলেন, বীরবর লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বেই ধনুর্ব্বাণ-হস্তে বিপন্ন ভ্রাতার রক্ষার্থ ধাবমান হইবেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে স্থির ও অবিচলিত দেখিয়া সহসা ধৈর্য্যসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক একেবারে উন্মাদিনীর

ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সীতা পতিশোকে আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষণকালের জন্য পুত্রস্থানীয় দেবর লক্ষ্মণকে, এবং এমন কি আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া গেলেন! সীতা ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার মন বিকৃত অবস্থায় উপনীত হইল। মনের এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে, লোকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়। সীতাদেবীও তাই স্নেহভাজন লক্ষ্মণের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন। ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহার ন্যায় পতিপ্রাণা রমণীর যে এই প্রকার মানসিক বিকার ঘটিতে পারে, আমরা তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি। যাহা হউক, উল্লিখিত অদ্ভুত বাক্যগুলি যেমন একদিকে সীতার মানসিক দুরবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তেমনই অপরদিকে আবার পতির জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যাকুলতাও পরিব্যক্ত করিতেছে। কিন্তু জানকী কুক্ষণেই এই বিষময় বাক্যগুলি উদ্গীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও কাহারও প্রতি এমন কুবাক্য উচ্চারণ করেন নাই। পরন্তু এতদ্দ্বারাই তাঁহার ভাগ্যে যে দারুণ কষ্টভোগের সূত্রপাত হইল, তাহা হইতে তিনি ইহজীবনে আর নির্ম্মুক্ত হইতে পারিলেন না। আমরা কত সময়েই যে জিহ্বাকে অসংযত রাখিয়া জানকীর ন্যায় মনস্তাপ পাইয়া থাকি, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

সুশীল লক্ষ্মণ জানকীর সেই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও অভিমানে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং সহসা দৃপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "আর্য্যে

তুমি আমার পরম দেবতা, তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে; উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতেই আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে, তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায়, একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যায্যই কহিতেছিলাম; কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপরনাই কটূক্তি করিলে। দেবি, যখন তুমি আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমায় ধিক্; মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতেছিলাম; তুমি স্ত্রীসুলভ দুষ্টস্বভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমায় ঐরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক; যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতঃই আমার মনে নানা আশঙ্কা হয়; এক্ষণে বনদেবতারা তোমায় রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।" (৩।৪৫)

সীতা লক্ষ্মণকে আর কিছু না কহিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

মহাবীর লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলে, সীতাদেবী রামলক্ষ্মণের আগমন-প্রতীক্ষায় অশ্রুপূর্ণলোচনে উৎকণ্ঠিতমনে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে ব্রাহ্মণবেশী এক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধান কাষায় বসন, মস্তকে শিখা,

বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা। সে ধীরে ধীরে ভর্ত্তৃশোকার্ত্তা সীতার সন্নিহিত হইয়া উহাঁকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সীতার বদনমণ্ডল অশ্রুকলঙ্কিত হইয়া নীহারক্লিষ্ট কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল; শোকে পরিম্লান হইলেও, তাঁহার দেহ হইতে এক দিব্য জ্যোতিঃ পরিস্ফুট হইতেছিল। ভিক্ষুক সীতার অলৌকিক রূপে বিমুগ্ধ হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং তিনি সেই বিপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য আলোকিত করিয়া একাকিনী তথায় বিরাজ করিতেছেন কেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল। সরলা সীতা ভিক্ষুককে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া সংক্ষেপে আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং শোকে মন উদ্বিগ্ন থাকিলেও অতিথিসৎকার করিতে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন "ব্রহ্মণ্, অন্ন প্রস্তত; এই আসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্যদ্রব্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্তমনে ভোজন করুন। ভোজনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন এস্থানে অবশ্যই বাস করিতে পাইবেন। আমার স্বামী, ভ্রাতার সহিত, নানাপ্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্রই কুটীরে প্রত্যাগমন করিবেন।" (৩। ৪৬, ৪৭) সীতাদেবী এই প্রকারে ভিক্ষুকের অভ্যর্থনা করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং রামলক্ষ্মণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতমনে বনের দিকে বারম্বার দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি আকুলমনে হতাশহৃদয়ে দেখিলেন, ভ্রাতৃযুগলের শীঘ্র প্রত্যাগমনের কোথাও কোনও

লক্ষণ নাই; কেবলমাত্র দিগন্তপ্রসারী শ্যামলবন মধ্যে মধ্যে বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া বিষাদভরেই যেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে!

সীতাদেবী ভিক্ষুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, দুষ্ট সাহসভরে দারুণবাক্যে আপনার পরিচয় প্রদান করিল। সে কহিল "জানকি, যাহার প্রতাপে দেবাসুরমনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। তুমি স্বর্ণবর্ণা ও কৌশেয়বসনা, তোমায় দেখিয়া আমি বিমোহিত হইয়াছি। আমি নানাস্থান হইতে বহু-সংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রধানা মহিষী হও! লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে; উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত ও পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। তুমি রাজমহিষী হইলে, পঞ্চসহস্র সুবেশা দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। তখন এই বনবাসে তোমার আর ইচ্ছাও হইবে না। তুমি আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমার সর্ব্বাংশে অনুরূপ। আমা হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার হইবে না। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া আমাতেই অনু-রক্ত হও। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য বিসর্জ্জন করিয়া এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্টসঙ্কল্প অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ?"

অকস্মাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বিমূঢ়া সীতা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সহসা তাঁহার মূর্ত্তি অগ্নিময়ী, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, চক্ষু ভ্রূকুটিসম্পন্ন, নাসা বিস্ফারিত, দেহ দীর্ঘায়ত ও কেশ-পাশ আলুলায়িত হইল। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত হইতে

লাগিল। তিনি রোষভরে কিয়ংক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না, পরে দুরাকাঙ্ক্ষ রাবণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন “রে দুরাত্মন্, যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজতুল্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বটবৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, কীর্ত্তিমান্ ও সুলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যাঁহার বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়; যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহবৎ মন্থরগামী, সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। রাক্ষস, তুই শৃগাল হইয়া দুর্ল্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস্? যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকেও স্পর্শ করিতে পারিবি না। নীচ, যখন রামের প্রিয়পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহুসংখ্য স্বর্ণবৃক্ষ দেখিতেছিস্; তুই ক্ষুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিতেছিস্, সূচীমুখে চক্ষু মার্জ্জন এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুরলেহনের অভিলাষ করিতেছিস্! তুই কণ্ঠে শিলা বন্ধন পূর্ব্বক সমুদ্র-সন্তরণ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধন, এবং লৌহময় শূলের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ বাসনা করিতেছিস্! দেখ্, সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর, সমুদ্র ও ক্ষুদ্রনদীর যে অন্তর, সুবর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, গরুড় ও কাকের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, এবং হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, রামের এবং তোরও সেইরূপ অন্তর! তুই আর কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর্, এখনই ধনুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্র, বীর লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া, তোর উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবেন। রে

পামর, তুই নীচ, জঘন্যচরিত্র ও পাপাচারী। তুই আমাকে অসহায়া দেখিয়া অপহরণ করিলে, আমি প্রাণত্যাগ করিব ;কোন মতেই তোর বশতাপন্ন হইব না। আমাকে স্পর্শ করিলে, তুই সবংশে বিধ্বস্ত হইবি। কাপুরুষ, তুই আমাকে একাকিনী দেখিয়া কুবাক্য কহিতেছিস্, কিন্তু দেখিতেছি রামের হস্তে তোর আর রক্ষা নাই!" (৩।৪৭)

অগ্নিমূর্ত্তি সীতা দুরাত্মা রাবণের প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়া ভীমরূপ ধারণ করিলেন। সে ভীষণ রূপ দর্শনে পামর রাবণেরও হৃৎকম্প হইল। দুর্ব্বৃত্ত সীতার প্রতিকূলভাব অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিল, এবং তদ্দণ্ডেই নিরীহ ভিক্ষুকবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিল। সীতা রাবণকে দেখিয়া বাত্যা-তাড়িতা কদলীর ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন এবং চক্ষে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন। রাবণ ক্রোধকষায়িতলোচনে সীতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলপূর্ব্বক বামহস্তে তাঁহার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পদযুগল ধারণ করিল ; সহসা এক খরবাহিত রথ কুটীরের সন্নিহিত হইল! সীতাদেবী রাবণকর্ত্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইবামাত্র তাহার পাপ হস্তবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ঘোরতর তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া রথে আরোহণ করিল। মন্দভাগিনী সীতা এই অসম্ভাবিত বিপদে অতিমাত্র কাতর হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং চীৎকার ও বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ

করিলেন। বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইল, মৃগসকল চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল; সর্ব্বস্থল যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বায়ু যেন নিশ্চল এবং সূর্য্যও যেন প্রভাশূন্য হইল! চতুর্দ্দিক্ হইতে এক হাহাকার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, এবং ধরিত্রী যেন ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। রামের সহধর্ম্মিণী ত্রিলোকপূজ্যা সীতাদেবী রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃত হইতেছেন, ধর্ম্ম অধর্ম্মকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে, পাপ পুণ্যকে দলন করিতেছে। হায়, সংসারে আর ধর্ম্ম নাই; জগৎ হইতে সত্যলোপ হইল, এবং সরলতা ও দয়ার নামও আর কোথাও রহিল না। সীতাদেবী রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের নিমিত্ত, গরুড়কবলিতা ভুজঙ্গীর ন্যায়, বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুরন্ত রাক্ষস তাঁহাকে লইয়া সহসা আকাশপথে উত্থিত হইল। জানকী ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র রক্ষক দেবর লক্ষ্মণকে অন্যায় কটূক্তি করিয়া রামের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কারণে তাঁহার দারুণ মনস্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি আর কাহাকেও পরিত্রাতা না দেখিয়া নৈরাশ্যের প্রগাঢ় তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত হইলেন, এবং শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ ও স্থাবরজঙ্গমকে উন্মত্তার ন্যায় সম্বোধন করিতে লাগিলেন;—"হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ, কামরূপী রাক্ষস আমায় লইয়া যায়, তুমি তাহা জানিতে পারিলে না! হা রাম, ধর্ম্মের জন্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বলপূর্ব্বক আমায় লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না! বীর, তুমি দুর্ব্বৃত্তদিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? রে রাক্ষস-কুলাধম রাবণ, তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য করিলি,

এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর্। হায়, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্ম্মপত্নীকে রাক্ষসে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, কেহ কি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না? হায়, এতদিনে কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; এতদিনে আমরা স্বজনগণের সহিত বিনষ্ট হইলাম। হা জনস্থান, তোমাকে নমস্কার করি; পুষ্পিত কর্ণিকারসকল, তোমাদিগকে অভিবাদন করি; রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। পুণ্যসলিলে গোদাবরি, তোমায় বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া পলাইতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এইস্থানে যে কোন জীবজন্তু আছ, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হায়, যমও যদি লইয়া যায়, যদি ইহলোক হইতেও অন্তর্হিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনয়ন করিবেন। হা তাত জটায়ু, দেখ, এই দুরাত্মা রাক্ষস আমায় অনাথার ন্যায় লইয়া যাইতেছে, ইহার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, তুমি কি ইহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে? এক্ষণে, রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, তুমি তাহাই করিও।" (৩।৪৯)

জটায়ু নামে এক বিহগরাজ আশ্রমের অনতিদূরে বাস করিতেন। তিনি রামচন্দ্রের অতিশয় শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সহসা সীতার এই হৃদয়বিদারী বিলাপ শ্রবণ পূর্ব্বক জটায়ু ঊর্দ্ধদিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, রাক্ষসাধম রাবণ রামের বনিতা সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া শূন্যমার্গে পলায়ন করিতেছে। বিহগরাজ তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীন হইয়া রাবণের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, নখর ও চঞ্চুপ্রহারে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত এবং পদাঘাতে তাহার রথ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। রাবণ সীতাকে ভূমিতলে স্থাপন করিয়া জটায়ুকে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল, এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পর খড়্গ দ্বারা পক্ষদ্বয় ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিয়া দিল। বিহগরাজ সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া মরণাপন্ন হইলেন দেখিয়া, মন্দভাগিনী জানকী বিলাপ করিতে করিতে এক লতাকে হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। দুরন্ত রাক্ষস ক্রোধে সীতাকে লতা হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া, আবার আকাশপথে পলায়ন-প্রবৃত্ত হইল। সীতাদেবী নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে করিতে আপনার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারসকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত এবং "হা রাম, হা লক্ষ্মণ" এই আর্ত্তনাদসম্বলিত করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাবণকে কখনও অনুনয় বিনয়, কখনও কটূক্তি ও ভৎ‌র্সনা করিয়া, মুক্তিপথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত করিল না। অনন্তর শোকাকুলা সীতাদেবী এক পর্ব্বতের উপরিভাগে পাঁচটি বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া, উহারা রামকে বলিবে এই প্রত্যাশায়, উহাদের মধ্যে কিয়দংশ কনকবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরীয়খণ্ড এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রাবণ গমনত্বরানিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না।

রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ।

RAJA RAVI VARMA.

বানরেরা সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক রোরুদ্যমানা কামিনীকে দেখিতে পাইল।

রাবণ তড়িদ্বেগে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সাগর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দুরাত্মা একেবারে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে ভয়বিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিল। সীতা কোথায় কিয়ৎকাল পূর্ব্বে স্বামীর সহিত অরণ্যচারিণী হইয়াও তৎসহবাসে স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিতেছিলেন, আর কোথায় সহসা রাক্ষসকবলিত হইয়া প্রিয়তম প্রাণনাথ এবং গুরুবৎসল দেবর হইতে শত শত যোজন দূরে অবস্থান করিতেছেন! হায়, সীতার এ কি হইল? রামময়-জীবিতা পতিব্রতা সীতাদেবী স্বামীর মঙ্গলময় ক্রোড় হইতে আচ্ছিন্ন হইলেন কেন? সত্যসত্যই কি সীতা আর জীবিতেশ্বর আর্য্যপুত্রকে দেখিতে পাইবেন না? তবে সীতার আর জীবন-ধারণে প্রয়োজন কি? সীতা অপহৃত হইয়াছেন, ইহা বাস্তব ঘটনা, না স্বপ্নমাত্র? কিয়ৎক্ষণ সীতা ভূতাবিষ্টার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; পরে, আপনার দুরবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া অসহায়ার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রাবণ লঙ্কাতে আসিয়াই ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিল এবং তাঁহার সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিল। সীতার যাহা আবশ্যক হইবে, রাক্ষসীরা যেন তৎক্ষণাৎ তাহা আনয়ন করে, এবং কেহ যেন ভ্রমেও সীতার প্রতি কোন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ না করে।

রাবণ এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া আট জন মহাবল রাক্ষসকে

রামলক্ষ্মণের প্রাণনাশ করিতে জনস্থানে প্রেরণ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সীতার মনস্তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই রাক্ষসীরক্ষিতা অনাথিনীকে আপনার ধন-বৈভব দেখাইতে লাগিল। সীতাদেবী রাক্ষসাধমকে দেখিয়াই তাহার ও আপনার মধ্যে একটী তৃণ ব্যবধান রাখিলেন, এবং তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কেবল প্রবলবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন! তদ্দর্শনে রাবণ সীতাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ক্ষীণপ্রাণ রামের দোষ ও অক্ষমতাপ্রদর্শন এবং আপনার গুণ, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মনোহরণ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

পতিপরায়ণা সীতাদেবী পতিনিন্দাশ্রবণপূর্ব্বক সেই শত্রুগৃহেই কালভূজঙ্গীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া রাবণের প্রতি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের ভয়প্রদর্শনে কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া বলিলেন "দেখ, এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা বন্ধন কর, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না, এবং জগতে অসতীরূপ অপবাদও রাখিতে পারিব না। আমি ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবি না।" (৩।৫৬)

রাবণ সীতার অনন্যপরায়ণতা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইল। সে সীতাকে তখন বশতাপন্ন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া মনে করিল যে, এই দুষ্টাকে কখনও ভয়প্রদর্শন এবং কখনও বা প্রবোধ বাক্যদ্বারা, বন্যকরিণীর ন্যায়, বশীভূত করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষস সীতাকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল "সীতে,

শুন, আমি আর দ্বাদশমাস প্রতীক্ষা করিব। তুমি যদি এতদিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমাকে আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।" (৩।৫৬) এই বলিয়া রাবণ বৃক্ষলতাশোভিত বিহঙ্গমপূর্ণ মনোহর অশোককাননে সীতাকে লইয়া যাইতে রাক্ষসীগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। সীতাও ভয়শোকে বিহ্বল হইয়া রামলক্ষ্মণের চিন্তায় সেই অশোক-কাননে জীবন্মৃতার ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায়।

মারীচ রামের স্বর অনুকরণপূর্ব্বক আর্ত্তের ন্যায় সীতা ও লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া গতাসু হইলে, রামের বীরহৃদয় সহসা বিকম্পিত হইল। নানাপ্রকার ভয় ও দুর্ভাবনা আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অতিশয় চঞ্চল করিল। রামের যেন কোন গুরু-তর বিপদ আসন্ন হইয়াছে! রাক্ষসের এই ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ শ্রবণপূর্ব্বক লক্ষ্মণ ত সীতাকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া আসিবেন না? সুবুদ্ধি লক্ষ্মণও কি রামের ন্যায় রাক্ষসের মায়ায় বিমুগ্ধ হইবেন? দুরাত্মা রাক্ষসেরা রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সর্ব্বনাশসাধনের নিমিত্তই যে এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে, তদ্বিষয়ে রামের আর কোনই সন্দেহ রহিল না। তিনি সীতার নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং মনোমধ্যে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে করিতে দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ও চরণযুগল ত্বরানিবন্ধন স্খলিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে দেখিয়া, তিনি আরও চঞ্চল হইলেন; পৃথিবী তাঁহার চক্ষে যেন ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক্ যেন তমোজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল! হায়, রামের আনন্দদায়িনী পত্যনুরাগিণী জনকনন্দিনীর কি কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ কি তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন? রামচন্দ্র এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে ব্যগ্রতা সহকারে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা লক্ষ্মণকে সম্মুখে

দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত, তালু বিশুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইল। তিনি কোনও প্রকারে সীতার কুশল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ সীতাকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছেন, ইহা শ্রবণমাত্র শোকে ও চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাম দুঃখাবেগে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস, আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আসিলাম, তখন তুমি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিলে? না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে! হয় ত সীতা অপহৃত হইয়াছেন, কিম্বা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। লক্ষ্মণ, যদি সেই সুশীলা জানকী জীবিত থাকেন, তবে আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব; আর যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া, হাস্যমুখে বাক্যালাপ না করিলে, আমি কি প্রকারে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব?" লক্ষ্মণ রামকে একান্ত শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন "আর্য্য, আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই।" এই বলিয়া তিনি অগ্রজকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। সীতার ক্রোধবাক্যে লক্ষ্মণ আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া রামের নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া রাম বিস্তর পরিতাপ করিতে করিতে বলিলেন "ভাই সীতার নিয়োগে আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে।" এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ভ্রাতৃযুগল উৎকণ্ঠিতমনে কুটীরসন্নিধানে উপনীত হইলেন। দূর হইতে আশ্রমকে শ্রীহীন

দেখিয়া রামের আশঙ্কা পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি ত্বরিতপদে চিন্তাকুলচিত্তে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে জানকী নাই। জানকী নাই! তবে কি রামের যাহা আশঙ্কা, তাহাই সত্য হইল? রাম বিশ্ব অন্ধকারময় দেখিলেন, এবং সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। জানকী তবে কোথায় গিয়াছেন? রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত উদ্বিগ্নমনে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে সীতার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম কাতরস্বরে হতাশহৃদয়ে একবার সীতাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন। সেই প্রশান্ত অরণ্যমধ্যে রামের কণ্ঠস্বর বায়ুরাশির সহিত তরঙ্গায়িত হইতে হইতে অদূরে কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু কোন স্থান হইতে কোনও প্রত্যুত্তর আসিল না। কেবলমাত্র সেই কাতর কণ্ঠস্বরশ্রবণে চকিত হরিণহরিণীসকল একবার রামের দিকে দীনভাবে দৃষ্টিপাত করিল, এবং তরুরাজি যেন বিষাদভরেই একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! মুহূর্ত্তমধ্যে আবার সব নীরব ও নিস্পন্দ, যেন স্থাবর জঙ্গম সকলেই শোকে অবসন্ন হইয়াছে। রাম মনের উদ্বেগ আর সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; "ভাই রে লক্ষ্মণ" এই কথা উচ্চারণ করিয়াই তিনি ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার চেতনাসম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রবোধবচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। দেবী জানকী কুটীরে নাই বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি কোথাও পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন; "অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর রহিয়াছে; অরণ্যপর্য্যটন জানকীর একান্তই প্রিয়, হয়ত তিনি বনে গিয়াছেন," (৩৬১) কিম্বা কুসুমিত সরোবরে ও বেতসাচ্ছন্ন

নদীতে গমন করিয়াছেন, অথবা তাঁহারা কি প্রকার অনুসন্ধান করেন, ইহা জানিবার আশয়ে ভয়প্রদর্শনের জন্যই কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। আর্য্য শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হউন, তাঁহারা উভয়ে সর্ব্বত্রই সীতার অনুসন্ধান করিবেন।

রাম শোকে উন্মত্ত হইয়া লক্ষণের সহিত সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, যাহাকেই সম্মুখে দেখেন, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে তাহাকেই সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন ;—"হে কদম্ব, আমার প্রেয়সী তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, তুমি যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। করবীর, তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অতিশয় স্নেহের পাত্র, তিনি জীবিত আছেন কি না, বল। তিলক, তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দ্দিকে গুঞ্জন করিতেছে, তুমি জানকীর বিশেষ আদরের বস্তু, তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহা কি অবগত আছ? হে অশোক, শোকনাশক, আমি শোকভরে হতচেতন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। কর্ণিকার, তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে তুমি যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। হে মৃগ, তুমি মৃগনয়না জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মৃগীগণের সহিত অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন? মাতঙ্গ, বোধ হয় আমার জানকী তোমার পরিচিত, এক্ষণে তুমি যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল।" (৩৬০) রাম অরণ্যমধ্যে ভ্রান্ত ও উন্মত্তবৎ এইরূপে সকলকেই সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন উত্তর

প্রদান করিল না। সহসা তাঁহার বিষম ভ্রান্তি উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন, যেন প্রিয়তমা জানকী একবার তাঁহার নয়নগোচর হইয়া পরিহাসচ্ছলে আবার বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছেন। তাই তিনি সেই মনঃকল্পিতা সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কমললোচনে, তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ? এই যে তোমায় দেখিতে পাইলাম! তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যের উত্তর দিতেছ না? একবার স্থির হও, এক্ষণে নিতান্তই নির্দ্দয় হইয়াছ। তুমি ত পূর্ব্বে এই-রূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করি-তেছ? প্রিয়ে, আমি তোমাকে পীতবর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ, তাহাও দেখিয়াছি; তোমার অন্তরে যদি স্নেহসঞ্চার থাকে, তবে থাম, আর যাইও না। জানকি, আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকট আইস। তুমি যে সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ দেখ, তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে।" (৩।৬০, ৬১) কিয়ৎক্ষণ পরে রাম আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। সীতাকে কেহ হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, এই চিন্তাই আবার তাঁহার মনে বলবতী হইল। তিনি লক্ষ্মণকে "ভাই, আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না" এইকথাগুলি বলিয়া শোকে অতিশয় অবসন্ন ও মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাম তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া সীতার জন্য অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন পূর্ব্বক কাতরকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে অতিকষ্টে আশ্বস্ত করিয়া উভয়ে আবার বনে, উপবনে, সরোবরে, গোদাবরীতীরে, এবং সীতার সমস্ত গন্তব্যস্থানেই তাঁহাকে যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। রাম উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সরিদ্বরা গোদাবরী ও পর্ব্বতশ্রেণীকে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না। তদ্দর্শনে তিনি রোষে প্রজ্বলিত হইয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্তই কটিতটে বল্কল ও চর্ম্ম পরিবেষ্টন এবং মস্তকে জটাভার বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন গ্রহণ ও সুদৃঢ় মুষ্টিদ্বারা তাহা ধারণ করিয়া, তাহাতে এক প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মৃদুবচনে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধশান্তি করিলেন।

রাম লক্ষ্মণের বাক্যে স্থির হইয়া সীতার অন্বেষণার্থ পুনর্ব্বার নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেন এবং একস্থলে রুধিরাক্ত জটায়ুকে দেখিয়া তাঁহাকেই সীতার হন্তা মনে করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণশরদ্বারা জটায়ুর প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আসন্নমৃত্যু বিহগরাজ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া সীতাহরণসংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ অতিশয় কষ্টে নিবেদন করিলেন। রাবণ সীতাকে একাকিনী পাইয়া অপহরণ করিয়া পলাইতেছিল, জটায়ু তদ্দর্শনে সীতার রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া দুরাত্মা রাক্ষসের সাংগ্রামিক রথ, সারথি ও ছত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই বিনষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে ছিন্নপক্ষ ও শরবিদ্ধ করিয়া আকাশপথে সীতাকে লইয়া পলায়ন করি-

য়াছে। জটায়ু রামের আগমন কাল পর্য্যন্ত কষ্টে জীবন রক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সফেন শোণিত উদ্গার করিতে করিতে গতাসু হইলেন।

রাম হিতাকাঙ্ক্ষী জটায়ুর মৃত্যুশোকে অধিকতর কাতর হইয়া লক্ষ্মণের সাহায্যে এক চিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং তদুপরি তাঁহাকে আরোপণ করিয়া তাঁহার অগ্নিক্রিয়া সমাধা করিলেন। অনন্তর গোদাবরীজলে তাঁহারা স্নান তর্পণ করিয়া সীতার অন্বেষণে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাঁহারা এক গহনবনে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বনের নাম ক্রৌঞ্চারণ্য। তাঁহারা যত্নসহকারে সেই অরণ্যে সীতার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। অনতিদূরে মতঙ্গাশ্রম নামে এক নিবিড় বন; রামলক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক অভিনব বিপজ্জালে জড়িত হইলেন। কবন্ধনামা এক দীর্ঘবাহু রাক্ষস তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের সুকোমল মাংসে উদরপূরণের বাসনা করিল। তাহার বিকৃত আকার ও ভীষণ মূর্ত্তি। সে শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃযুগলকে বাহুদ্বারা অনায়াসে গ্রহণ করিয়া নিপীড়িত করিতে লাগিল। সুকুমার লক্ষ্মণ, রাক্ষসের হস্তে বিবশ হইয়া, কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং উভয়ে বীরোচিত সাহস প্রদর্শন করিয়া রাক্ষসের বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীররবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া শোণিতলিপ্তদেহে ভূমিতলে পতিত হইল, এবং মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া রামলক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিল। কবন্ধ তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত ও রাবণকর্তৃক সীতাহরণ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীবনামা বানরপ্রধানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে উপদেশ প্রদান করিল, এবং ঋষ্যমূক যাইবার পথ প্রদর্শন করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে কবন্ধের প্রার্থনানুসারে, রামলক্ষ্মণ করিশুণ্ডভগ্ন শুষ্ককাষ্ঠদ্বারা এক চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাহার দেহ দগ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কমনে ঋষ্যমূকপর্ব্বতোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কত যে মনোহর বন ও ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। এক পর্ব্বতপৃষ্ঠে নিশা যাপন করিয়া তাঁহারা পরদিন প্রাতঃকালে পম্পাসরোবরের পশ্চিমতটে উপনীত হইলেন। অদূরে তাপসী শবরীর আশ্রম ছিল; রামলক্ষ্মণ তাপসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। তাপসীও তাঁহাদের শুভাগমনে আপনাকে ধন্য মনে করিলেন, এবং সেই মনোহর আশ্রমের যে যে স্থলে শুদ্ধসত্ত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহা-দিগকে দর্শন করাইলেন। অনন্তর সেই চীরচর্ম্মধারিণী জটিলা শবরী পৃথিবীতে আপনার অবস্থানকাল নিঃশেষপ্রায় জানিয়া রামের সম্মুখেই অগ্নিকুণ্ডে নিজ দেহ ভস্মীভূত করিলেন। তাপসী স্বর্গারোহণ করিলে, রামলক্ষ্মণ সেই স্থান হইতে মনোরম পম্পাতটে উপনীত হইলেন, এবং তাহার বিচিত্র শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। পম্পার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছসলিলে কমলদল

বিকশিত রহিয়াছে; কোথাও কর্দ্দম নাই, সর্ব্বত্রই কোমল বালুকাকণা; জলমধ্যে মৎস্যকচ্ছপেরা নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থান কহ্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ, এবং কোন স্থান কুবলয়সমূহে নীলবর্ণ। উহার তীরভূমি তিলক, অশোক, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত; কোথাও কুসুমিত আম্রবন, কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতাসকল, সহচরী সখীর ন্যায়, বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, এবং কোন স্থান বা ময়ূররবে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাম পম্পাদর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া তাঁহার মনকে অতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিল, এবং তিনি প্রিয়তমা জানকীর বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। স্থিরবুদ্ধি লক্ষ্মণ শোকবিহ্বল রামকে বিপদে ধৈর্য্যধারণ করিতে, এবং যাহাতে পাপিষ্ঠ রাবণের দণ্ডবিধান করিয়া তাঁহারা দেবী জানকীকে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে বলিলেন। রাম লক্ষ্মণের বাক্যে সংযতচিত্ত হইয়া ঋষ্যমূকপর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পম্পার অনতিদূরেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত অবস্থিত ছিল। কপিরাজ সুগ্রীব পর্ব্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি অস্ত্রধারী রামলক্ষ্মণকে সহসা সেই দিকে আসিতে দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে আগমন করিয়া মন্ত্রিগণের নিকট আপনার ভয়কারণ বিবৃত করিলেন। অনন্তর সকলের পরামর্শে হনূমান্ নামে এক বুদ্ধিমান্ বানর এই

বীরযুগলের গতিবিধি ও সবিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত ভিক্ষুকবেশে তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন এবং বিনীতবচনে সুমধুরকণ্ঠে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিলেও রামলক্ষ্মণকে নিরুত্তর দেখিয়া হনুমান্ আপনার ও সুগ্রীবাদি বানরগণের পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, সুগ্রীব বানরগণের অধিপতি ও পরম ধার্ম্মিক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তিনি দুঃখিতমনে সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন। হনুমান্ তাঁহারই নিয়োগে বীরদ্বয়ের নিকট আগমন করিয়াছেন; সুগ্রীব তাঁহাদের সহিত মৈত্রীস্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। অপ্রতিহতগতি হনুমান্ তাঁহারই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুকরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া ঋষ্যমূক হইতে তাঁহাদের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামলক্ষ্মণ উভয়েই যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। যাঁহাকে তাঁহারা অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই মহাবল সুগ্রীবই তাঁহাদের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে সমুৎসুক, ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। রামচন্দ্র হনুমানের সুসংস্কৃত, ব্যাকরণ-শুদ্ধ, স্পষ্টাক্ষর, সরল ও মধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে হনুমানের সহিত আলাপ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুধীর লক্ষ্মণ হনুমানকে প্রত্যুত্তরে আপনাদের সমস্ত পরিচয়ই প্রদান করিলেন, এবং কবন্ধের বাক্যে মহাত্মা সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করিতেই যে তাঁহারা সেইস্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশিত করিয়া বলিলেন। দুরাত্মা

রাবণ সীতাদেবীকে একাকিনী পাইয়া অপহরণ করিয়াছে, রাম-লক্ষ্মণ তাহার বাসস্থান অবগত নহেন। মহামতি সুগ্রীবের কোন স্থান অপরিজ্ঞাত নহে, তিনি জানকীর অনুসন্ধান করিয়া দিয়া শোকার্ত্ত রামের শোকাপনোদন করিলেও করিতে পারেন। রামলক্ষ্মণ এক্ষণে সেই কপিরাজেরই শরণাপন্ন হইতেছেন। সৌভাগ্যক্রমেই তাঁহারা মহাবীর হনুমানের দর্শন পাইলেন।

হনুমান্ লক্ষ্মণের নিকট তাঁহাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সমুচিত আশা ও উৎসাহ প্রদান করিলেন, এবং বীরকেশরী সুগ্রীবের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইতে অভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণপূর্ব্বক ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। হনুমানের মুখে রামলক্ষ্মণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া সুগ্রীব পুলকিতমনে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাম, হনুমানের নিকট তোমার গুণগ্রাম প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর; তুমি আমার সহিত বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই আমার সম্মান। এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীস্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিলাম, গ্রহণ কর এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।" (৪।৫)

রাম আনন্দিতমনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে হনুমান্ দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক পুষ্প দ্বারা তাহা অর্চ্চনা করিলেন,

এবং বহ্নিদ্বয়ের মধ্যস্থলে তাহা রক্ষা করিলেন। রাম ও সুগ্রীব উভয়ে সেই প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া প্রীতিভরে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব শালবৃক্ষের এক পত্রশোভিত কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন ও নানাপ্রকার সুখদুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। সীতা আকাশ বা রসাতলেই থাকুন, সুগ্রীব তাঁহাকে আনয়ন করিয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিবেন। রামচন্দ্র বিষাদ ও শোক পরিত্যাগ করুন। সুগ্রীব যাহা প্রতিজ্ঞা করিলেন, কদাচই তাহার অন্যথা হইবে না। সীতাহরণের কথা শুনিতে শুনিতে একটা ঘটনা সুগ্রীবের সহসা মনে পড়িয়া গেল। একদিন সুগ্রীব প্রভৃতি পাঁচটী বানর পর্ব্বতোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে এক নিশাচর একটী রমণীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আকাশ-পথে পলায়ন করিতেছিল। সেই নারী হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেছিলেন, এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণকে গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটী উত্তরীয় ও কতকগুলি অলঙ্কার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুগ্রীব সেই দ্রব্যগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন; সম্ভবতঃ সেই দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরই রাবণ এবং সেই রোরুদ্যমানা রমণীই সীতা হইবেন। এই বলিয়া সুগ্রীব একটী গুহা হইতে উত্তরীয় ও অলঙ্কারগুলি আনয়ন করিলেন। রাম তৎসমুদয় দেখিয়াই সীতার বলিয়া চিনিতে পারিলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় বাষ্পজলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; তিনি সীতাকে স্মরণ করিয়া রোদন এবং সেই অলঙ্কারগুলি বারংবার হৃদয়ে স্থাপন

করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন; রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া অনর্গল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, "লক্ষ্মণ, দেখ, রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার কালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে এই অলঙ্কারগুলি ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এই গুলি কদাচই পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকিত না।" তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, "আর্য্য, আমি কেয়ূর জানি না, কুণ্ডলও জানি না; প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এই জন্য এই দুই নূপুরকেই জানি।" (৪।৬)

রামকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া সুগ্রীব সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন, বলিলেন শোকবিহ্বল হইলে কোন ফলোদয় হইবে না; মনীষিগণের পৌরুষ আশ্রয় করিয়া কার্য্যোদ্ধার করাই কর্ত্তব্য। সুগ্রীবও বিপদাপন্ন হইয়াছেন, বালী তাঁহার রাজ্য ও স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মিত্রবর্গকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন। সুগ্রীবের দুঃখ ও শোকের অবধি নাই, কিন্তু তথাপি তিনি কখনও শোকবিহ্বল হন নাই, বরং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্যায়প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের বাক্যে শোকপরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যচিন্তা করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "সুগ্রীব, তোমার অনুনয়ে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপদ্‌কালে ঈদৃশ বন্ধুলাভ নিতান্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ ও সেই দুরাচার রাক্ষসের বধসাধন, এই দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর

আমিই বা তোমার কি করিব, তুমি অকপটে তাহাও বল।" ৪।৭)
রাম যাহার সহায়, তাহার আর অভাব কি? রামের সাহায্যে সুগ্রীব স্বরাজ্য কেন, দেবরাজ্যও আয়ত্ত করিতে পারিবেন। সুগ্রীব এই বলিয়া বালীর সহিত আপনার বৈরিতার কারণ ও তদবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই রামকে বলিতে লাগিলেন। তিনি অগ্রজের বিক্রম ও পৌরুষ কীর্ত্তন করিলেন, বলিলেন বালীর ন্যায় বীর জগতে কোথাও বিদ্যমান নাই। সুগ্রীব তৎকর্ত্তৃক পরাস্ত ও পুত্রকলত্রবিরহিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখে ও মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বন্ধুকে বিপজ্জাল ও বালীত্রাস হইতে সর্ব্বাগ্রে মুক্ত না করিলে সুগ্রীব কিরূপেই বা রামের উপকার করিতে সমর্থ হইবেন?

রাম সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বালীবধে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সপ্ততাল ভেদ করিয়া স্বীয় বাহুবলে বন্ধুর প্রত্যয় সমুৎপাদন করিলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণ বিস্মিত হইয়া রামের বলবীর্য্যের নিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বালীকে সংহার করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধা রাজ্য প্রদান না করিলে সুগ্রীব সীতান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইবেন না, ইহা বিবেচনা করিয়া রঘুবীর রামচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং সেইদিনই তাঁহাকে বালীর সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। রামের বাক্যে সুগ্রীব অতিশয় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কিষ্কিন্ধা-যাত্রা করিলেন, এবং পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ বালীকে

ঘোররবে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাবীর বালী সুগ্রীবের সিংহনাদশ্রবণ করিবা মাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহির্গত হইলেন, এবং আহ্বানকারী ভ্রাতার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রামচন্দ্র ধনুর্ধারণপূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন; তিনি ভ্রাতৃযুগলকে তুল্যাকার ও অভিন্নরূপ দেখিয়া তাঁহাদের প্রভেদ বুঝিতে সমর্থ হইলেন না এবং মিত্রবধভয়ে শরমোচনও করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইলে সুগ্রীব প্রবল বালীর নিকট পরাস্ত হইলেন, এবং রাম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না বুঝিয়া, ঋষ্যমূকাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বালীর প্রহারে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত, অবসন্ন ও রক্তাক্ত হইয়াছিল; তিনি অতিকষ্টে এক গহনবনে প্রবেশপূর্ব্বক লক্কায়িত হইলেন; বালীও মুনির শাপ স্মরণ করিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। এদিকে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত অনতিবিলম্বে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুগ্রীব লজ্জা ও অপমানে ম্রিয়মাণ হইয়া অভিমানভরে রামের প্রতি মর্ম্মভেদী কঠোর বাক্যসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রাম তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে কহিলেন, "সখে, ক্রোধ করিও না। আমি যে কারণে শরত্যাগ করি নাই, শ্রবণ কর। তোমরা উভয়েই তুল্যরূপ ছিলে, আমি তোমাদের সৌসাদৃশ্যে একান্ত মোহিত ও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করি নাই। পাছে আমাদের মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছিল। * * * সখে, অধিক আর কি বলিব, আমি

লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত, তোমারই আশ্রয়ে আছি; এই অরণ্য মধ্যে তুমিই আমাদিগের গতি। এক্ষণে পুনর্ব্বার গিয়া নির্ভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তুমি এই মুহূর্ত্তেই দেখিবে বালী আমার একমাত্র শরে নিরস্ত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।” (৪।১২) এই বলিয়া রামচন্দ্র সুগ্রীবকে চিহ্নিত করিবার জন্য তাঁহার কণ্ঠে এক কুসুমিত নাগপুষ্পী লতা বন্ধন করিয়া দিলেন।

অনন্তর সকলে পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধায় উপনীত হইলেন। সুগ্রীব সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া বালীকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বালী সুগ্রীবকে পুনরাগত দেখিয়া ক্রোধকষায়িতলোচনে মহাবেগে গৃহ হইতে বহির্গমন করিতে লাগিলেন। তারা বালীর মহিষী; তিনি অতিশয় পতিপ্রণয়িনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। সুগ্রীব কিয়ৎ-ক্ষণ পূর্ব্বে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, আবার তিনি কিষ্কিন্ধায় আসিয়া বালীর সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার মনে কেমন এক প্রকার বিস্ময় ও আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কিন্তু একটি কথা তাঁহার স্মৃতিপথে সহসা সমুদিত হইয়া গেল। যুবরাজ অঙ্গদ চরমুখে দশরথতনয় রামলক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতার কথা শ্রবণ করিয়া জননীকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রামলক্ষ্মণ উভয়েই বীর পুরুষ; হয়ত তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সুগ্রীব বালীর সহিত পুন-র্ব্বার যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছেন। রাম সুগ্রীবের সহায় থাকিলে বালীর অমঙ্গল ঘটিতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমতী তারা গমনোদ্যত স্বামীর পথরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে সেই দিন যুদ্ধ না করিয়া গৃহেই অবস্থান করিতে অনেক

অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, তারা আপনার সমস্ত আশঙ্কাই বালীর নিকট নিবেদন করিলেন। বালী তেজস্বী পুরুষ, ভয় কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, সুতরাং তিনি তারার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রামভীতি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "রাম ধর্ম্মজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, পাপকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন?" তারাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া বালী ক্রোধাবিষ্টমনে পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং সুগ্রীবকে দেখিয়াই তাঁহার সহিত ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বালীর প্রাণান্তকর প্রহারে সুগ্রীব অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। রাম ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বন্ধুকে অবসন্ন দেখিয়া বালীর প্রতি এক ভুজঙ্গভীষণ শর মোচন করিলেন। শর গর্জ্জন করিতে করিতে বিদ্যুদ্বেগে বালীর দেহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি দেহ প্রসারণপূর্ব্বক ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। মর্ম্মঘাতী শরে আহত হইয়া বালী দারুণ যন্ত্রণা ভোগ এবং অতিশয় কষ্টসহকারে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণের সহিত বহুমানপূর্ব্বক মৃদুপদসঞ্চারে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। বালী রামকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি কঠোর বাক্যসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বালী রামকে ধর্ম্মপরায়ণ ও বীর বলিয়াই জানিতেন; কিন্তু তিনি যে এতাদৃশ অধার্ম্মিক ও কাপুরুষ, তাহা বালীর স্বপ্নেরও অগোচর। রাম সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া নীচ-প্রবৃত্তি ক্ষত্রিয়াধমের ন্যায় বালীকে অসাবধান অবস্থায় সংহার করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাঁহার অপযশ জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। বালী রামের

কোনই অনিষ্টসাধন করেন নাই; তবে অকারণবৈরিতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন কেন? রাম নিশ্চয়ই ধর্ম্মধ্বজী, দুরাচার ও পাপনিরত। তিনি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিতচিত্ত ও রাজকার্য্যের নিতান্তই অনুপযুক্ত। সীতাকে উদ্ধার করাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলে বালীকে বলিলেই তিনি দুর্ব্বৃত্ত রাবণের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া রামের হস্তে জানকীকে অনায়াসেই সমর্পণ করিতে পারিতেন। এইরূপে অনেকক্ষণ রামের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া বালী অবশেষে নিরস্ত হইলেন। তখন রামচন্দ্র বালীকে ধীরে ধীরে অনেক হিতবাক্য কহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, বালী সমুচিত বিবেচনা না করিয়াই রামের নিন্দা করিতেছেন। প্রথমতঃ তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সুগ্রীব রামের মিত্র; রাম সুগ্রীবের নিকট বালীবধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা রামের একান্তই কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, বালী সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন; তাঁহার পত্নী শাস্ত্রানুসারে বালীর পুত্রবধূ ও কন্যাস্থানীয়া; তাঁহাকে অধিকার করিয়া বালী মহাপাতকগ্রস্ত হইয়াছেন। অধার্ম্মিক রাজার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই রামচন্দ্র বালীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিলেন। কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের অধিকৃত। এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যের দণ্ডপুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। সত্য বটে, ধর্ম্মবৎসল ভরত এক্ষণে সমস্ত ভূবিভাগের অধীশ্বর; কিন্তু তাহা হইলেও, রামচন্দ্রেরও ধর্ম্ম-ভ্রষ্টকে নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে।

মনু কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণপূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় ও পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে কিন্তু যে রাজা পাপীকে দণ্ড না দিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন, তিনি দারুণ পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারেই বালীর বধসাধন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্ম্মভ্রষ্ট বালীকে বধ করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়াছেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত হইলেও কাপুরুষের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে কোন ব্যক্তির প্রতি শরনিক্ষেপ করা যে কোন মতেই পৌরুষের কার্য্য নহে, তাহা তিনি অবশ্যই মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সরলভাবে আপনার দোষ স্বীকার না করিয়া কূট যুক্তিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার দোষক্ষালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বালীকে বলিলেন, "বীর, আমি তোমার প্রচ্ছন্ন বধসাধন করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি, এবং তজ্জন্য শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে থাকিয়া বাগুরাপাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতিরাও অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকেন; তুমি শাখামৃগ, বানর; যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর, রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং উঁহাদের জীবনও তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার হিংসা, নিন্দা ও

অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে।" (৪।১৮)

এই যুক্তি পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকাগণ রামচন্দ্রের বালীবধ-রূপ কার্য্যটির ঔচিত্যানৌচিত্য আপনারাই বিচার করিতে সমর্থ হইবেন। এস্থলে তৎসম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রামচন্দ্র ঈদৃশ ঘৃণিত যুক্তিপথ অবলম্বন না করিলেই ভাল করিতেন। অন্যায় কার্য্য করিয়া তাহা স্বীকার করাই তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

মুহূর্ত্তমধ্যে বালীবধসংবাদ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মহিষী তারা এই নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আলুলায়িতকেশে উন্মাদিনীর ন্যায় রণস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সহচরীগণে পরিবৃত ও বালীর পার্শ্বে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই বিলাপশ্রবণে ভ্রাতৃহন্তা সুগ্রীবেরও নির্ম্মম হৃদয় বিচলিত হইল। যুবরাজ অঙ্গদ অনাথের ন্যায় রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিলেন। রামলক্ষ্মণও সেই স্থলে নির্ব্বিকারচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে কণ্ঠাগতপ্রাণ বালী সুগ্রীবকে নিকটে আহ্বান করিয়া সস্নেহে কহিতে লাগিলেন, "সুগ্রীব, আমি পাপবশাৎ অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিমোহে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইতেছিলাম, সুতরাং তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য ও রাজ্যসুখ ভাগ্যে বুঝি যুগপৎ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, নচেৎ ইহার কেন এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিবে? যাহা হউক, তুমি আজ এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই

প্রাণত্যাগ করিব।" (৪।২২) এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে প্রাণাধিক অঙ্গদ ও মন্দভাগিনী তারাকে সুগ্রীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং অঙ্গদকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদানানন্তর রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অনন্তনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন।

বালীর মৃত্যুতে কিষ্কিন্ধানগরী শোকাচ্ছন্ন হইল। বালীর দেহ শিবিকা দ্বারা বাহিত হইয়া চন্দনকাষ্ঠরচিত চিতামধ্যে সংস্থাপিত হইল; এইরূপে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাম পিত্রাজ্ঞাপালনানুরোধে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। কুমার অঙ্গদ রামের আদেশে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তখন বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ; এই নিমিত্ত রামচন্দ্র সুগ্রীবকে নিজ রাজপ্রাসাদেই বর্ষাযাপন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, আর স্বয়ং সেই সুদীর্ঘ প্রাবৃট্-কাল গুহাকন্দরশোভী মনোহর পর্ব্বতপৃষ্ঠেই অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি কপিরাজকে কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভেই রাবণবধের সমুচিত উদ্যোগ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রাবণের অবিরল আসারপাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা এক সুপ্রশস্ত সুদৃশ্য গুহা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বর্ষাকালে ধরণীর এক অপূর্ব্ব শোভা হইল। নদী-সকল কর্দ্দমময় জলে পরিপূর্ণ ও উচ্ছলিত; তাহাতে হংসচক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মহানন্দে অনবরত ক্রীড়া করিতেছে।

আকাশ পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘে নিরন্তর আচ্ছন্ন; তাহা হইতে অবিরলধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছে। কখনও ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনে গুহাসকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রজনী অন্ধকারময়ী; দামিনী মুহুর্মুহু উদ্ভাসিত হইতেছে। ক্ষণপ্রভার চঞ্চল আলোকে সশৈল-কাননা ধরিত্রী প্রতিমুহূর্ত্তে ভীষণ হইতে ভীষণতর রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ভেকসকল গম্ভীর রবে রজনীর ভীষণতা বিঘোষিত করিতেছে। ময়ূরসকল কেকারবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেছে। কদম্ব ও কেতকী পুষ্পসকল বিকশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মনোহর গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে; জম্বুবৃক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ রসাল ফলসকল লম্বমান রহিয়াছে। কোথাও সুপক্ক আম্রফলসকল বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কোথাও মাতঙ্গগণ নির্ঝরশব্দে আকুল হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে; আর কোথাও বা বানরেরা যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিতেছে। অবিরল বৃষ্টিপাতে নদী, হ্রদ, তড়াগ, সরোবর ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয় সকল জলময় হইল; তৎকালে লোকে গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরগমনের অভিলাষ করিল না। রাজগণ যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। হরিণহরিণীদল প্রশস্ত শ্যামল ক্ষেত্রে আর পরিদৃষ্ট হইল না। রামলক্ষ্মণ গুহা-মধ্যেই সতত আবদ্ধ রহিলেন। রাম অতিশয় কষ্টেই সেই দারুণ বর্ষাকাল যাপন করিলেন। সীতার বিরহে তিনি অনবরত অশ্রু-ধারা মোচন করিতে লাগিলেন। মেঘগর্জ্জনশ্রবণে তিনি ম্রিয়-মাণ হইতেন; বৃষ্টির ঝর্ঝরশব্দে তাঁহার মনে সীতাসংক্রান্ত কত পুরাতন স্মৃতিই জাগরিত হইত! ময়ূরের কেকারবে তিনি বিমনায়

মান হইতেন; নীরব নিশীথে ভেকের গম্ভীর কোলাহলে তাঁহার মন উদাস হইয়া পড়িত। কখন কখন সীতার দুরবস্থা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত; কখন তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতেন; কখন কখন অনন্যমনে সীতাকেই ধ্যান করিতেন, এবং কখন বা সীতা-লাভবাসনায় অধীর হইয়া সমুৎসুকচিত্তে বর্ষাশেষ প্রতীক্ষা করিতেন। সুধীর লক্ষ্মণ এই দুঃসময়ে নানাবিধ উপায়ে অগ্রজকে সুস্থিরচিত্ত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ক্রমে বর্ষা তিরোহিত এবং শরৎ সমাগত হইল। ধরিত্রী শস্যময়ী, আকাশ সুপ্রসন্ন ও বৃক্ষলতা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল। সর্ব্বস্থল পরিস্কৃত, পথ কর্দ্দমশূন্য, জল সুনির্ম্মল এবং জলাশয়সকল কুমুদকহ্লারে প্রফুল্ল হইল। বৃক্ষলতা, পুষ্পফল, বন-উপবন, গিরি-নদী, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ এবং নরনারী সকলেরই মধ্য হইতে যেন এক দিব্য আনন্দ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। রাম এই আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিলেন, কিন্তু সীতার বিরহে তাহা এক ঘোর বিষাদে পরিণত হইয়া গেল। সৈন্য-সংগ্রহের সময় অতীতপ্রায় হইল; সুগ্রীব কিষ্কিন্ধানগরীতে রুমা তারা প্রভৃতি রমণীগণে পরিবৃত হইয়া আমোদপ্রমোদে নিমগ্ন আছেন; যাহার কৃপায় রাজ্যশ্রী লাভ করিলেন, সেই দুঃস্থ বন্ধুর দশা একটিবারও চিন্তা করিলেন না। সুতরাং রাম তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও শোকসন্তপ্ত হইয়া লক্ষ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া

সকলের মনে সন্ত্রাস সমুৎপাদন পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ-হস্তে কিষ্কিন্ধার পুরদ্বারে উপনীত হইলেন। বানরেরা তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। যুবরাজ অঙ্গদ লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভীতমনে তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিতে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মণের আদেশে যুবরাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুগ্রীবকে তাঁহার আগমনসংবাদ জানাইলেন। সুগ্রীব মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ান ছিলেন; লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধমনে পুরদ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সহসা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন এবং তাঁহাকে অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে আনয়ন করিতে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিমতী তারাকে প্রেরণ করিলেন। প্রিয়দর্শনা তারা মদবিহ্বললোচনে স্খলিতগমনে লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ দূর হইতেই কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া তটস্থ হইলেন এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যবশতঃ ক্রোধপরিহার পূর্ব্বক অবনত মুখে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। তারা সুমধুর প্রিয়বাক্যে লক্ষ্মণের ক্রোধ অপনয়ন করিয়া বলিলেন,—সুগ্রীব তাঁহাদের মিত্র; সুতরাং ভ্রাতার ন্যায় সম্মানের যোগ্য। ভ্রাতা অপরাধী হইলেও তৎপ্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। সত্য বটে, সুগ্রীব মোহবশতঃ বিষয়সুখে নিমগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি রামের উপকার ক্ষণকালের নিমিত্তও বিস্মৃত হন নাই। সীতাসমুদ্ধার ও রাবণবধে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে তিনি সর্ব্বদাই সমুৎসুক। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি সৈন্যসংগ্রহের আদেশ প্রচার করিয়াছেন; আর কিয়দ্দিবস

মধ্যেই সৈন্যসকল সমবেত হইবে। লক্ষ্মণ ক্রোধপরিহার পূর্ব্বক তারার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার মনোগতভাব ব্যক্ত করিলেন।

লক্ষ্মণ তারার সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে বিলাসমগ্ন দেখিয়া যার পর নাই তিরস্কার করিলেন। রাম বালীর বধসাধন করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সুগ্রীব অকৃতজ্ঞের ন্যায় উপকার বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে অবস্থান করিতেছেন। বর্ষা-শেষ হইয়া শরৎ সমাগত হইয়াছে। যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত; রাম সীতাশোকে অবসন্ন হইতেছেন; এক্ষণে সুগ্রীবের প্রত্যুপকারের সময় আসিয়াছে। সুগ্রীব যদি আপন প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর না হন, তাহা হইলে বালী যে পথে গিয়াছেন, তাঁহাকেও সেই পথে গমন করিতে হইবে। লক্ষ্মণের ঈদৃশ কঠোর বাক্যে সুগ্রীব অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং বিনীতবচনে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। লক্ষ্মণও রোষবশতঃ মিত্রের প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বীত-ক্রোধ হইয়া সমুচিত সম্মানপ্রদর্শন দ্বারা সুগ্রীবের গৌরববৃদ্ধি করিলেন। অনন্তর কপিরাজ, হনুমৎপ্রমুখ মন্ত্রিগণের পরামর্শে, চতুর্দ্দিক্ হইতে বানরসৈন্যসংগ্রহের আদেশ প্রচার করিলেন। দূতেরা তদুদ্দেশে তৎক্ষণাৎ নানাদিকে প্রস্থান করিল।

সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকারোহণে প্রস্রবণ পর্ব্বতে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম বন্ধুর যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কিয়দ্দিবস মধ্যে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া বানর

সকল কিষ্কিন্ধায় সমবেত হইল। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে নানাদিকে প্রেরণ করিলেন। কোন দল পূর্ব্বদিকে, কোন দল পশ্চিম দিকে, কোন দল উত্তর দিকে এবং কোন দল বা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে বীরবর হনূমান্, যুবরাজ অঙ্গদ, মন্ত্রী জাম্বুবান প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণ বিদ্যমান ছিলেন। সীতাসংবাদ আনিবার জন্য সুগ্রীব বানরগণকে একমাস মাত্র সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সকলে প্রত্যাগত না হইলে, তাহাদের যে গুরুতর দণ্ডবিধান হইবে, তাহাও তিনি প্রচারিত করিয়া দিলেন।

বানরগণের প্রস্থানদিবস হইতে গণনায় ক্রমশঃ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল। তখন বানরেরা সীতার কোথাও উদ্দেশ না পাইয়া হতাশহৃদয়ে কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত পূর্ব্বদিক হইতে, শতবলী উত্তর দিক হইতে এবং সুষেন সসৈন্যে ভীত মনে পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্রবণ শৈলে রাম ও সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদের ব্যর্থ অনুসন্ধান ফল জ্ঞাপন করিলেন। হনূমান্ ও অঙ্গদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ তখনও প্রত্যাগত হইলেন না· দেখিয়া রাম সীতার উদ্দেশ সম্বন্ধে একবারে নিরাশ হইলেন না।

অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ দক্ষিণদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সীতার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তাঁহারা নানাস্থলে নানাপ্রকার বিপজ্জালে জড়িত হইলেন, অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিলেন কিন্তু কিছুতেই সফল-কাম হইলেন না। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা

নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে সীতার সন্ধান প্রাপ্তি সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া তাঁহারা রাম ও সুগ্রীবের ভয়ে সমুদ্রতটে প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং তদনুসারে সকলে একস্থানে সমবেত হইলেন। সমুদ্রতটস্থ এক পর্ব্বতোপরি সম্পাতি নামে এক বিহঙ্গরাজ বাস করিতেন। তিনি জটায়ুর ভ্রাতা। সম্পাতি বানরগণকে আপনার ভক্ষ্য মনে করিয়া মহোল্লাসে তাঁহাদের সমীপস্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট রাবণহস্তে ভ্রাতা জটায়ুর মৃত্যু ও সেই রাক্ষস কর্ত্তৃক সীতার অপহরণ, এই দুই অপ্রিয় সমাচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। সম্পাতির নিকট বানরগণ সীতা ও রাবণের সংবাদ পাইলেন। রাবণ সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপে অবস্থান করিতেছে। সেই পামর সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া লঙ্কাতেই রাখিয়াছে। বানরগণ সাগর লঙ্ঘন করিলেই সীতার দর্শন পাইবেন। এই শুভ ও প্রিয় সংবাদ শ্রবণে বানরগণ হর্ষে আপ্লুত হইলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে এক তুমুল কিলকিলাধ্বনি সমুত্থিত হইল। প্রধান প্রধান বানরগণ সাগরলঙ্ঘনের সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তৎসাধনে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। অবশেষে মহাবীর হনূমান্ আপনার অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সাগরলঙ্ঘনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সকলেই তাঁহার সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিল। অনন্তর মহাবল পবনকুমার সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া এক উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং ভীমরূপ ধারণ করিয়া বীরদর্পে মহাতেজে আকাশমার্গে লম্ফপ্রদান করিলেন।

জলচর, স্থলচর ও শূন্যচরেরা তাঁহার হুঙ্কারে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। তাঁহার গমনবেগবশাৎ এক প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইল এবং সমুদ্রের জলরাশিও সংক্ষুভিত হইতে লাগিল। বানরগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই মহাবীর পবনকুমার কুজ্ঝটি-সমাচ্ছন্ন অনন্ত সাগরের অস্পষ্ট সীমান্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন!

দশম অধ্যায়।

সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কাদ্বীপ। লঙ্কা দেখিতে পরম রমণীয়, যেন প্রকৃতিদেবীর একমাত্র লীলাভূমি। লঙ্কা মনোহর বন, উপবন, শৈল, কানন, গিরিগুহা, নদনদী, প্রান্তরক্ষেত্র ও উদ্যান সরোবরে সমলঙ্কৃত। ত্রিকূটনামা এক পর্ব্বতোপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত, তাহার চতুর্দ্দিকে গভীর দুর্লঙ্ঘ্য রাক্ষসরক্ষিত পরিখা। নগরী কনকময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ ও পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিশোভিত। সর্ব্বত্রই প্রাসাদ; স্থানে স্থানে স্বর্ণস্তম্ভ ও স্বর্ণজাল; কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও অষ্টতল গৃহ এবং ইতস্ততঃ পতাকা ও লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। নগরী পর্ব্বতোপরি অবস্থিত ছিল, সুতরাং দূর হইতে বোধ হইত যেন উহা গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র, এবং চতুর্দ্দিকে ভীমদর্শন রাক্ষসসৈন্য। এই নগরীর মধ্যে নানাস্থলে উদ্যান, কৃত্রিম কানন, ও কমলশোভিত স্বচ্ছ সরোবর। কোথাও পান-গৃহ, কোথাও পুষ্পাগার, কোথাও চিত্রশালা, কোথাও ক্রীড়াভূমি, কোথাও বিস্ময়জনক ভূমধ্যস্থ গৃহ এবং কোথাও বা চৈত্যভূমি। দুর্দ্দান্ত রাবণ এই মনোহর লঙ্কার অধীশ্বর। রাবণ বিশ্বশ্রবানামা এক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং নিকষানাম্নী এক রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার অপর দুই ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ; কুম্ভকর্ণ ভীমকায়, বিকটদর্শন ও রাবণের তুল্যই পামর ছিল; কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ বিভীষণ জিতেন্দ্রিয়, সদাচারসম্পন্ন ও

ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাবণের পাপানুষ্ঠানদর্শনে মনে মনে অতিশয় সন্তপ্ত হইতেন এবং সর্ব্বদাই সাহসপূর্ব্বক তৎকৃত অন্যায় কার্য্যমাত্রেরই ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। রাবণের ইন্দ্রজিৎনামা এক দুর্দ্ধর্ষ পুত্র ছিল; কিন্তু সে দুরাত্মাও পিতার তুল্যই পামর ছিল।

রাবণ যথেচ্ছাচারী, ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগলালসায় পরিপূর্ণ ছিল। সে কেবল পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্যই বহুকাল তপস্যা করিয়াছিল। এই দুর্ব্বৃত্ত সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কত শত অবলা নারীকে যে হরণ করিয়া আপনার অন্তঃপুরবাসিনী করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। মন্দোদরী ইহার প্রধানা মহিষী; মন্দোদরী বুদ্ধিমতী হইয়াও পাপাসক্ত স্বামীকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। শূর্পণখা রাবণের ভগিনী, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ভগিনীও ভ্রাতার অনুরূপিণী ছিলেন। এই পাপীয়সী কামপরবশ হইয়া বনবাসী রামলক্ষ্মণকে পঞ্চবটীতে প্রার্থনা করিলে, মহামতি লক্ষ্মণ ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। লঙ্কাতে আসিয়া শূর্পণখাই রাবণকে সীতাহরণে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। পাঠকপাঠিকাগণ এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে ইতঃপূর্ব্বেই অবগত আছেন। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কাতে আনয়ন করিল; এবং জ্যোতির্লুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, তাঁহার অলৌকিক রূপে একান্ত বিমোহিত হইল। বাস্তবিকই সীতাদেবী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী জগতে দুর্লভ না হইতে পারে, কিন্তু সীতার তুলনা সহজে কোথাও পাওয়া যায় না। সীতা স্বভাবতঃই দেবতার ন্যায়

সৌন্দর্য্যশালিনী, তাহাতে আবার যৌবনসীমার অন্তর্বর্ত্তিনী। কেবল এই দুইটী গুণের একত্র সমাবেশ হইলেই, যে কেহ সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, কিন্তু সীতার সৌন্দর্য্যে ইহা ব্যতীত আরও কিছু বিদ্যমান ছিল, যদ্দ্বারা তিনি জগতে অতুলনীয়া বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সীতার সৌন্দর্য্যে চাঞ্চল্যের লেশমাত্র ছিল না; দৃষ্টি সরল, স্থির ও প্রশান্ত; মুখমণ্ডল অলৌকিক প্রতিভাদীপ্ত এবং নয়নযুগল হইতে পবিত্রতা যেন দীপ্তিরূপেই নিয়ত ক্ষরিত হইতেছে। সহসা তাঁহাকে দেখিলে মনোমধ্যে বিস্ময়সম্বলিত ভীতির সঞ্চার হইত, বোধ হইত যেন তিনি স্বাভাবিক তেজে বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছেন। সীতার সন্নিকটে থাকিলে মানবের অসাধু ভাব-সকল লজ্জিত হইত, মন পৃথিবীর ন্যক্কারজনক কর্দ্দমপুরীষপরি-পূর্ণ জঘন্য ভূমি পরিত্যাগ করিয়া কোন্ এক দেবরাজ্যে বিচরণ করিত এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহকারে কেবল অর্চ্চনা করিতেই ইচ্ছা হইত। সীতাদেবী অলৌকিক সরলতা ও পবিত্রতাগুণে সাক্ষাৎ জগন্মাতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন, এবং অতিশয় পাপাত্মারাও তাঁহার সন্নিধানে হৃৎকম্প অনুভব করিত। ইহাই সীতাদেবীর সৌন্দর্য্যের প্রধান বিশেষত্ব, এবং এই বিশেষত্বই তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। রাবণ ভগিনীর মুখে সীতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিবার মানস করিল; কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে বৈরনির্য্যাতনই এই অপহরণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাবণ ব্রাহ্মণবেশে পঞ্চবটীর নির্জ্জন কুটীরে সীতাকে দর্শন করিবামাত্র

তাঁহাকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া বুঝিতে পারিল। রাবণের অন্তঃপুরে কতশত সুরূপা রমণী বিদ্যমান আছে, কিন্তু অলৌকিক সৌন্দর্য্য-প্রভায় কেহই সীতার সমতুল্যা নহে। নীচাশয় রাবণ সীতা দেবীকে দেখিয়াই তদাসক্তচিত্ত হইল বটে, কিন্তু সে প্রবল ও দুর্ব্বৃত্ত হইলেও তাঁহার সম্মুখে হৃদয়মধ্যে কেমন একপ্রকার ভীতি অনুভব করিল।

সীতা অবলা নারী; তাঁহাকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী রাবণের সাহসিক হৃদয় সন্ত্রস্ত হইল কেন?

রাবণ অবলা সীতাদেবীকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হয় নাই; ভীত হইলে সে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে সমর্থ হইবে কেন? কিন্তু সেই পাপমতি রাক্ষস সীতার অন্তর্নিহিত অলৌকিক পবিত্রতা ও পুণ্যতেজ মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত দেখিয়া সহসা হৃৎকম্প অনুভব করিয়াছিল। পাপ পুণ্যের নিকট সঙ্কুচিত হইয়াছিল, অসাধুতা সাধুতার নিকট পরাজয় মানিয়াছিল এবং পাশববল নৈতিক বলের নিকট নির্বীর্য্য হইয়াছিল! কিন্তু এই জড়জগতের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে প্রবল পাশবশক্তি দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল, সবল অবলাকে আক্রমণ করিল, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিল! সীতা অপহৃত হইলেন বটে, কিন্তু পাপ কি পুণ্যের উপর জয়লাভ করিতে কমর্থ হইল? ধর্ম্ম কি অধর্ম্মের নিকট পরাভব মানিল? কদাচই নহে। রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে আনয়ন করিয়া কত প্রলোভন দেখাইল, কত ভয়প্রদর্শন করিল; কিন্তু অবলা অসহায়া সীতা শত্রুপুরেই প্রবল রাবণকে তুচ্ছ করিয়া অশ্রুপূর্ণ আরক্তলোচনে দৃপ্তা সিংহীর

ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ্, এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে; তুই বধ বা বন্ধন কর্, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না এবং জগতে অসতীরূপ অপবাদও রাখিতে পারিব না; আমি ধর্ম্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবি না।" (৩।৫৬)

পাপ পুণ্যতেজের সম্মুখে একটী পদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না!

বাস্তবিক, রাবণ অবলা সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লঙ্কাতে আনয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহার পাপবাসনা সীতার ধর্ম্মবলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা অর্থাৎ যাহা কিছুতে সামান্যা নারীর হৃদয় সহসা বিচলিত হইয়া উঠে, রাবণ তৎসমুদয়ই সীতাকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিল, কিন্তু তাহাতে সীতার মন প্রলোভিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর ভীষণ ভাব ধারণ করিতে লাগিল। রাবণ সীতার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় অতিশয় ক্ষুভিত হইল। সে সীতাকে দেখিয়া অতিশয় বিমুগ্ধ হইয়াছিল; সীতার সহিত অনন্তকাল যাপন করিলেও তাহার বাসনা যেন অতৃপ্ত থাকিবে। রাবণ কত শত রমণীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু কেহই সীতার ন্যায় প্রতিকূল ছিল না। সীতার অনন্য-সাধারণ ঈদৃশ মনোভাব দেখিয়া দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষস বুঝিতে পারিল যে, রাঘববনিতা সামান্যা নারী নহেন, পরন্তু তিনি সিংহীর ন্যায় তেজোগর্ব্বিতা ও একান্ত পতিপরায়ণা; সুতরাং তাঁহাকে অনায়াসে বশতাপন্ন করা কাহারই সাধ্য নহে। তবে

রাবণের আশা এই যে, ছলে কৌশলে কালক্রমে তাঁহাকে বন্য করিণীর ন্যায় বশবর্ত্তিনী করিলেও করা যাইতে পারে।

রাবণ কামমুগ্ধ হইয়াছিল; ইচ্ছা করিলে কি দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস অবলা সীতার উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারিত না?

প্রবল দুর্ব্বলকে নিপীড়িত করিতে পারে সত্য বটে, কিন্তু পাশববল যে ধর্ম্মবলের নিকট একেবারে সামর্থশূন্য হইয়া যায়, ইহার উদাহরণ জগতে বিরল নহে। প্রবলপরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নরপতি অসহায় ধর্ম্মবীরের একটী কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; ঘাতকের শাণিত কৃপাণ তাহার কম্পমান ক্ষীণমুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যায়, এবং কৃতান্তসদৃশ প্রবল উৎপীড়কেরা একটী ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল মনুষ্যের চতুর্দ্দিকে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থাকে! জগতে এদৃশ্য অতি বিচিত্র! সত্য বটে, দুর্ব্বল মনুষ্য কখন কখন প্রবলের অত্যাচারে অভিভূত হয়, রক্তমাংসময় ক্ষণভঙ্গুর দেহ শত্রুর উৎপীড়নে কখন কখন কাতর হইয়া পড়ে, কিন্তু পুণ্যতেজকে সহসা পরাভূত করিতে পারে, জগতে ঈদৃশী কোন শক্তিই বিদ্যমান নাই। তেজস্বী পুরুষ আপনার বিশ্বাস ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত এই অনিত্য অসার জীবনকেও তুচ্ছ করেন, উৎপীড়নের অসারতা প্রদর্শনার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক সহাস্যবদনে প্রজ্বলিত হুতাশনকেও আলিঙ্গন করেন, এবং ঘাতকের নিষ্কাসিত খড়্গতলে আপনার মস্তক পাতিয়া দিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না! ধন, মান, ঐশ্বর্য্য এবং জীবনও যদি বিনষ্ট হয় হউক, কিন্তু ধর্ম্ম যাহাতে জয়যুক্ত হন, ধর্ম্মবীর প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করেন। ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ও

অপ্রতিহত রাখিতে অসমর্থ হইলে, তিনি অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন; যেহেতু ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন এবং সেই অবলম্বন একবার বিনষ্ট হইলে, আর এই ঘৃণিত জীবন-ধারণের প্রয়োজন কি? রাবণের পাশবিক শক্তি ধর্ম্মপ্রাণা জানকীর আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট সঙ্কুচিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত দুর্ব্বৃত্ত ইচ্ছা করিলেও ভীতিপ্রযুক্ত তাঁহার উপর বল-প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাবণ যখনই সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া ধনরত্নাদির প্রলোভন এবং কখন কখন ভয়-প্রদর্শন দ্বারাও তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পাইত, তখনই সীতাদেবী দম্ভসহকারে তাহার ও আপনার মধ্যে একটী তৃণ ব্যবধান রাখিয়া দিতেন। দুরাত্মা রাবণের এরূপ সাহস ছিল না যে, সে সেই তৃণখণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া সীতার একটী কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্মই সীতাকে রক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং অধর্ম্মের সাধ্য কি যে সে ধর্ম্মরক্ষিতা সীতার অভিমুখে একটী পদও অগ্রসর করিতে সমর্থ হয়? ইহা ব্যতীত, রাবণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সীতা বড়ই তেজস্বিনী; তাঁহার প্রকৃতি সামান্যা নারীর ন্যায় নহে। ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে সীতা নিশ্চয়ই প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন। সীতা মৃত্যুভয়ে ভীতা নহেন, বরং ঈদৃশী দুরবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেই সর্ব্বদা প্রস্তুত। সীতার এইরূপ মনোভাব বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যদি রাবণ তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবেন, ইহা সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। সীতাকেই রাজমহিষী করিয়া তৎসহবাসে

অনন্তকাল যাপন করা রাবণের দুর্দ্দমনীয় অভিলাষ। সীতা মরিলে সে অভিলাষ চরিতার্থ হয় না; তাই বুদ্ধিমান্ রাবণ কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া সীতাকে একবৎসর সময় প্রদান করিল। সম্বৎসরের মধ্যে সীতা যদি রাবণের প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে রাক্ষসীরা তাঁহাকে রাবণের প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।

সীতাকে একবৎসর সময় প্রদান করিবার নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি? রাবণ মনে করিয়াছিল যে পতিপ্রাণা সীতা সদ্য সদ্য স্বামি-বিরহিত হইয়া তৎশোকে অতিশয় অভিভূত হইয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই তাঁহাকে এখন প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্তু এই শোকোচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, তিনি রামকে ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিবেন। সীতা স্বীয় উদ্ধারের আর কোনও আশা না দেখিয়া এবং ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক নিয়ত উৎপীড়িত হইয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া, অব-শেষে রাবণের বশ্যতা স্বীকার করিবেন; তাহা হইলেই রাবণের হৃদ্গত বাসনাও পরিতৃপ্ত হইবে। রাবণ কতশত অপহৃতা নারীর সহিত ঈদৃশ সময়পাশে বদ্ধ হইয়া সফলকাম হইয়াছে; সুতরাং সীতারও সহিত একবৎসর সময় করিয়া সে যে লব্ধমনোরথ হইবে না, তাহা কে বলিল? রাবণ পূর্ব্বসংস্কার ও অভিজ্ঞতাবলেই সীতাকে একবৎসর সময় প্রদান করিল। রাবণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে সীতাদেবীর অধিক বিলম্ব হইল না; কিন্তু সেই দুরাকাঙ্ক্ষ রাক্ষস রাঘববনিতাকে চিনিতে পারিল না। সীতা অশোককাননে প্রেরিত হইলেন, এবং কুক্করীপরিবৃতা হরিণীর

ন্যায়, রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিকটাকার নিষ্ঠুর রাক্ষসীরা রাবণের উপদেশানুসারে তাঁহাকে কখনও বুঝাইয়া, কখনও প্রলোভন দেখাইয়া, এবং কখনও বা ভয় প্রদর্শন করিয়া, লঙ্কেশ্বরের অসাধু প্রস্তাবে সম্মত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না।

রাবণ সীতার সহিত সময়পাশে বদ্ধ হইয়াছিল; যাঁহার সহিত সময় করা যায়, সময় অতিক্রান্ত না হইলে তাঁহার সহিত সময়নিবদ্ধ বিষয়ের কোনও উল্লেখ বা অবতারণা করা একান্তই নিষিদ্ধ ও নীতিবিগর্হিত। কিন্তু রাবণ দুর্নীতিপরায়ণ; সে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই সীতার সহিত সময় করিয়াছিল; পতঙ্গ যেমন বহ্নিশিখায়, সেইরূপ সে সীতার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল; সীতালাভচিন্তায় সে নিতান্ত আকুল। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই রাবণ যদি সীতাকে আপনার ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সুদীর্ঘ সম্বৎসরকাল অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ দূষিত নীতির অনুবর্ত্তী হইয়াই রাবণ অশোককাননেও মন্দভাগিনী জানকীর নিকট মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দারুণ ক্লেশের কারণ হইত। রাবণকে আসিতে দেখিলেই সীতাদেবী আপনার কাষায়বসনদ্বারা কথঞ্চিৎ লজ্জাবরণ পূর্ব্বক সজলনয়নে মৃত্তিকোপরি অবস্থান করিয়া থাকিতেন; রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন; রাবণের কোন কথারই উত্তর প্রদান করিতেন না; এবং যখন দুর্ব্বৃত্তের বাক্যে অতিশয় মর্ম্মাহত

হইতেন, তখন রোষারুণনেত্রে সেই রাক্ষসাধমকে অতিশয় তিরস্কার করিতেন। রাবণ সীতার বাক্যে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত; কিন্তু সে সীতার প্রতি অতিশয় আসক্তচিত্ত ছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া লইত।

এইরূপে সীতা রক্ষোগৃহে প্রায় দশমাস কাল অতিবাহিত করিলেন। আর দুইমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। সীতা পতি-বিরহে দিন দিন কৃশ ও অস্থিচর্ম্মসার হইতেছেন। তাঁহার মুখশ্রী বিলুপ্ত ও অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইয়াছে; তিনি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং দিবারাত্র রামেরই অনুধ্যান করিতে-ছেন। সীতা কি আর ইহজীবনে রামের দর্শন পাইবেন? রাম কি জীবিত আছেন? হয়ত তিনি সীতাশোকে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও হয়ত জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন! তবে সীতার আর বাঁচিয়া ফল কি? যাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিলে সীতা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেন, সেই প্রাণনাথ আর্য্যপুত্রের বিরহে মন্দভাগিনী কিরূপে এতদিন জীবিত আছে? সীতার হৃদয় পাষাণময়; সীতা পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই অনেক পাপানুষ্ঠান করিয়াছিল; সীতা পাপীয়সী, তাই তাহার মৃত্যু হয় না, তাই তাহার যন্ত্রণারও শেষ নাই! রামচন্দ্র কি সীতার উদ্দেশ পাইয়াছেন? তিনি কি সীতার দুরবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন? রামচন্দ্র মহাবীর; রাম শত্রুকে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সবংশে বিনষ্ট করিতেন। সীতা রাজর্ষি জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, এবং মহাবীর রামচন্দ্রের বনিতা। সীতার ভাগ্যে কি

শেষে ইহাই নির্দ্দিষ্ট ছিল? সীতা জাগরিত আছেন, না স্বপ্ন দেখিতেছেন? সীতার জীবন কি স্বপ্নময়? সীতার কি বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে? সীতা কি উন্মাদিনী? সীতা জীবিত আছেন, না মরিয়াছেন? সীতা এখন কোথায়? লঙ্কাপুরীতে তাঁহাকে কে আনিল? দুর্ব্বৃত্ত রাবণ স্বামীর ক্রোড় হইতে সীতাকে আচ্ছিন্ন করিল কেন? সীতা রাবণের কি অপরাধ করিয়াছেন? সীতার জীবনে আর কোন সুখ নাই; সীতার পক্ষে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু মৃত্যু হয় কই? সীতা তবে আত্মহত্যা করিবেন। আত্মহত্যা না মহাপাপ? মহাপাপ হউক, অমূল্য সতীত্বরত্ন বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা সীতার আত্মহত্যা করাই ভাল। কিন্তু উপায় কই? দুরন্ত চেড়ীগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে; সীতার মরিবার অবকাশ কই? হায়, সীতার মরিবারও অবসর নাই। সীতা এসংসারে বড়ই মন্দভাগিনী। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সীতা রাবণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় না দেখিয়া কখন কখন কাতরভাবে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেন, কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় লক্ষিতা হইতেন, এবং কখনও বা বিষাদে নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। ইহার উপর চেড়ীগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিত এবং পামর রাবণও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার সুকোমল মনকে সন্তপ্ত করিত। সীতার প্রাণ বড়ই কঠিন, তাই এত যন্ত্রণাতেও তাহা বিনষ্ট হইল না।

* * * *

একদিন নিশাবসানকালে সীতাদেবী ধূলিধূসরিতদেহে

দুশ্চিন্তায় নিদ্রাশূন্য হইয়া ভূমিতলে উপবিষ্ট আছেন, এবং চেড়ীগণ সাবধানে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে পক্ষিগণের আকস্মিক কলরবে সেই অশোককানন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রজনী প্রভাত হইলে, পক্ষিগণ প্রতিদিন যেরূপ মঙ্গলময় আনন্দকোলাহল করিয়া থাকে, ইহা তাদৃশ কোলাহল বলিয়া বোধ হইল না। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে, যে কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিত যে, বিহঙ্গমকুল কোনও কারণে সন্ত্রাসিত হইয়া অসময়ে জাগরিত হইয়াছে। যাহাহউক, সীতাদেবী অথবা চেড়ীগণের মধ্যে কেহই এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনাটী লক্ষ্য করিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন পত্রাকীর্ণ পরস্পরসংশ্লিষ্ট বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া একটী অদ্ভুত জীব নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে যেদিকে সীতা অবস্থান করিতেছিলেন সেই দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। পক্ষিসমূহ সেই অদ্ভুতজীব-দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া কুলায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীতস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ উড্ডীন হইতেছিল। যাহা হউক, সেই অদ্ভুত জীব ক্রমে ক্রমে একটী শাখাপল্লবময় উন্নত শিংশপাবৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইয়া তদুপরি আরোহণ করিল, এবং সেই বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা সীতাদেবীর প্রতি অনিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল!

এই অদ্ভুত জীব কে, তাহা প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই পাঠক-পাঠিকাগণ নিঃসন্দেহই তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইনি সেই প্রভুভক্ত মহাবীর পবনকুমার। এই মহাবীর স্বতেজে সাগরলঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কাতে উপস্থিত হইয়া নিশাযোগে পুরীমধ্যে

সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ছদ্মবেশে রাবণের প্রাসাদের সর্ব্বস্থলই অনুসন্ধান করিলেন; লঙ্কেশ্বরের অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্না সুবেশা সুরূপা কতশত রমণী দেখিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সীতা বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইলেন না। রাঘবপত্নী বিলাসিনীর ন্যায় নিশ্চিন্তমনে রাবণগৃহে নিদ্রা যাইবেন কেন? রামময়প্রাণা জানকী পতিশোকে নিশ্চয়ই কৃশা হইয়া দীনার ন্যায় কোথাও অবস্থান করিতেছেন। হনূমান্ মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া বিরহবিধুরা শোকমলিনা সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাদৃশলক্ষণাক্রান্তা একটীও রমণীর দর্শন না পাইয়া অতিশয় হতাশ হইতে লাগিলেন। তবে কি হনূমানের সাগরলঙ্ঘনশ্রম ব্যর্থ হইল? সীতা কি এতদিন রামের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? হনূমান্ সীতার অনুসন্ধান না করিয়া কোন্ মুখে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিবেন? রাম সীতা ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই অধিকদিন জীবিত থাকিবেন না। রাম মরিলে, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবও তাঁহার পথানুসরণ করিবেন। হনূমানের তবে আর বাঁচিয়া ফল কি? হনূমান্ স্বদেশে আর প্রত্যাগমন করিবেন না; তিনি লঙ্কার মধ্যেই কোনও নির্জ্জন স্থানে তপস্যা করিয়া দেহবিসর্জ্জন করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মহাবীর হনূমান্ দুঃখিতচিত্তে এক প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হইলেন। সেখান হইতে অনতিদূরে এক নিবিড় কানন অবলোকন করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বিহঙ্গম সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতে করিতে এক শিংশপাবৃক্ষমূলে একটী রমণীকে উপবিষ্ট দেখিলেন।

তখন হনূমান্ সোৎসুকচিত্তে সকলের অজ্ঞাতসারে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেই নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

হনূমান্ দেখিলেন "ঐ নারী রাক্ষসীগণে পরিবৃতা; উপবাসে যার পর নাই কৃশা ও দীনা। তিনি পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্ম্মল; তাঁহার কান্তি ধূমজালজড়িত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত; পরিধানে একমাত্র পীতবর্ণ মলিনবস্ত্র। তাঁহার দুঃখসন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে; শোকভরে যেন কাহাকে নিরন্তর হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহই নাই, কেবলই রাক্ষসী। তিনি যূথভ্রষ্টা কুক্কুরীপরিবৃতা কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত! * * * তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিষ্কাম আশার ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায় ও অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্ত্তির ন্যায় যার পর নাই শোচনীয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" (৫।১৫)

হনূমান্ এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ইহাঁকেই রাঘববনিতা সীতাদেবী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। রামচন্দ্র সীতার যে যে লক্ষণ ও বসনভূষণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, হনূমান্ তৎসমুদয়ই মিলাইয়া দেখিলেন। জানকী সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন

সন্দেহই রহিল না। সীতার অলৌকিক পতিপ্রেম ও ভর্তৃ-বাৎসল্যের কথা স্মরণ করিয়া হনূমানের নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি আরও চিন্তা করিলেন "জানকী রামলক্ষ্মণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহ্নবীর ন্যায়, স্থির ও গম্ভীর ভাবে কালযাপন করিতেছেন। ইহাঁর আভিজাত্য কুলশীল ও বয়স রামেরই অনুরূপ; সুতরাং ইহাঁরা যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, ইহা উচিতই হইতেছে।" (৫।১৬) হনূমান্ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ভীমদর্শন রাক্ষসীগণকে দেখিতে লাগিলেন এবং সীতার বিষণ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।

মহাবীর হনূমান্ সকলের অলক্ষিত হইয়া সেই দিবস সেই অশোককাননেই যাপন করিলেন, এবং সীতার সহিত কিরূপে কথোপকথন করিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। আবার রজনী সমাগত হইল। ধবলজ্যোতিঃ কুমুদবান্ধব নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, সুধাধবলিত প্রাসাদ ও যাবতীয় পদার্থোপরি শুভ্র জ্যোৎস্নাজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পদার্থনিচয় জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অদূরে পৌরবর্গের আনন্দকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আর সীতাদেবী রাক্ষসীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিত মনে সেই অশোক কাননেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনূমান্ সেই শিংশপা বৃক্ষের নিবিড় শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া সেই নিশাও অতিবাহিত করিলেন।

শর্ব্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে মঙ্গলবাদ্য ও সুললিত গীতধ্বনি উত্থিত হইল, বোধ হইল যেন ধরণীর মৃতদেহে ধীরে ধীরে জীবনসঞ্চার হইতেছে। হনূমান্ চিন্তাকুলমনে সেই শিংশপা বৃক্ষের চূড়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তুমুল ভূষণরব সহসা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি বিস্মিতমনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাশেষে সীতার দর্শনাভিলাষে বহুসংখ্যক রূপবতী রমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশোককাননে সমুপস্থিত! জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং উরুযুগলে উদর ও করদ্বয়ে স্তনযুগল আচ্ছাদন পূর্ব্বক জলধারাকুললোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি একান্ত দীনা ও শোকে যার পর নাই কাতর; রাবণের মৃত্যু-কামনাই তাঁহার একমাত্র ব্রত। শোকতাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ; তিনি নিয়তই ধ্যানে নিমগ্ন এবং একাকিনী অনবরত রোদন করিতেছেন। রাবণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার নেত্র-যুগল ক্রোধে আরক্ত হইল। তিনি সজলনয়নে অসহায়ার ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

রাবণ জানকীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মধুরবচনে নানারূপ প্রলোভনপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল "জানকি, তুমি আমাকে দেখিবামাত্র সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর। তুমি অনিচ্ছুক, এই জন্য আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। দেবি,

আমা হইতে কদাচ তোমার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিবে না, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছু মাত্র ভীত হইও না। একবেণীধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিনবস্ত্রপরিধান ও ধ্যান তোমার সঙ্গত হইতেছে না। তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ভোগ-সুখে আসক্ত হও। তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর। আমার অন্তঃপুরে অনেকানেক স্বরূপা রমণী আছে, তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইয়া থাক। আমি স্ববিক্রমে যে সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদয় এবং সমগ্র রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তোমার প্রীতির জন্য এই গ্রামনগরপরিপূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়া তোমার পিতাকে রাজা করিতেছি; তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া থাক। আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠে, ত্রিভুবনে এমন আর কেহই নাই। দেখি, রাম তপস্যা, বল, বিক্রম ও ধনে আমার তুল্য নয় এবং তাহার যশও আমার সদৃশ হইবে না। অতএব তুমি সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুরম্য কাননে আমার সহিত বাস করিতে সম্মত হও।" (৫।২০)

উগ্রস্বভাব রাবণের ঈদৃশ অপমানসূচক ঘৃণিত বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রামচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে; তিনি একটী তৃণ ব্যবধান রাখিয়া রাবণকে কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন "রাক্ষসাধিনাথ, তুমি আমায় অভিলাষ করিও না, স্বভার্য্যায় অনুরক্ত হও; পাপাত্মার পক্ষে মুক্তিপদার্থের ন্যায়, তুমি আমাকে সুলভ বোধ করিও না।" বলিতে বলিতে জানকীর মনে দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হইল; তিনি সহসা ক্রোধানলে প্রজ্ব-

লিত হইয়া উঠিলেন। তিনি রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন এবং পরুষবাক্যে কহিতে লাগিলেন "দেখ্, আমি অন্যের সহ-ধর্ম্মিণী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্যা ভোগ্যা স্ত্রী বোধ করিস্ না। ধর্ম্মকে শ্রেয়ঃজ্ঞান কর্ এবং সৎব্রতচারী হ। রাক্ষস, নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত। যখন তোর বুদ্ধি এই-রূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, তখন বোধ হয় এই মহানগরীতে কোন সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাহাদের কোনরূপ সংস্রব রাখিস্ না। রাবণ, প্রভা যেমন সূর্য্যের, আমিও সেইরূপ রামের; সুতরাং তুই আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না। তুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে। যদি লঙ্কার শ্রীরক্ষার ইচ্ছা থাকে, যদি সবংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। দেখ্, তুই যদি আমাকে লইয়া তাঁহার হস্তে দিস্, তবেই তোর মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ্। সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। তুই অচিরাৎ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় রামের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার শুনিতে পাইবি; অচি-রাৎ তাঁহার নামাঙ্কিত শরজাল, জ্বলন্ত উরগের ন্যায়, মহাবেগে এই লঙ্কায় আসিয়া পড়িবে, এবং অচিরাৎ তুই সবান্ধবে বিনষ্ট হইবি। সেই নরবীর ভ্রাতার সহিত মৃগগ্রহণার্থ অরণ্যে গিয়া-ছিলেন, তুই কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপহরণ করিয়াছিস্; এই কার্য্য অত্যন্ত ঘৃণিত। যখন রামের সহিত তোর বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায়সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তুই কৈলাসেই যা, আর

পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।" (৫।২১)

জানকীর এই বাক্যে রাবণ অতিশয় কুপিত হইল; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত কামমোহে অভিভূত হইয়া সীতার প্রতি রোষ প্রদর্শন করিতে পারিল না। রাবণ বলিল "জানকি, পুরুষ স্ত্রীলোককে যেরূপ সমাদর করে, সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পাত্র হয়; কিন্তু আমি তোমাকে যতটুকু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। যেমন সুনিপুণ সারথি বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করিয়া রাখে, সেইরূপ এক আসক্তিই তোমার প্রতি সমস্ত ক্রোধ একেবারে বিনষ্ট করিতেছে। সুন্দরি, তুমি আমার উপর অকারণে বীতরাগ হইয়াছ। তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট আসক্তিই আমাকে এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে। তুমি যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য।" (৫।২২)

এই কথা বলিতে বলিতে রাবণ রোষাবিষ্ট হইল। সীতা রাবণকে তাহার পত্নীগণসমক্ষেই যথেষ্ট অবমানিত করিয়াছেন; তাই দুর্ব্বৃত্ত রোষারুণনেত্রে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল "দেখ, আমি আমার কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব; কিন্তু ইহার পরেই তোমাকে আমার পর্য্যঙ্কোপরি আরোহণ করিতে হইবে। যদি এই নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।" (৫।২২)

জানকী ভীত হইলেন না। তিনি পাতিব্রত্যতেজে ও পতির

বীর্য্যগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন "নীচ, এই নগরীর মধ্যে তোর শুভাকাঙ্ক্ষী কেহই বিদ্যমান নাই। আমি ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে না। পামর, তুই এক্ষণে আমায় যে সকল পাপকথা কহিলি, বল্‌, কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি? * * * তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস্‌, তোর ঐ বিকৃত ক্রূর চক্ষু ভূতলে কেন স্খলিত হইল না? আমি রামের ধর্ম্মপত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইল না? দেখ্‌, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না; যতদূর করিয়াছিস্‌, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে।" (৫।২২)

রাবণ আর সহ্য করিতে পারিল না। দুরাত্মা ক্রোধে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সকলে সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত হইল। রাবণকে সীতার বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া ধান্যমালিনী নাম্নী তাহার এক পত্নী মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তাহাকে স্ত্রীবধরূপ ঘৃণিত কার্য্য হইতে বিরত করিল এবং বচনচাতুর্য্যে স্বামীর মন প্রীত করিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়া গেল। রাবণ পত্নীগণের সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, সীতার বশীকরণ সম্বন্ধে চেড়ীগণকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিল। রাবণ প্রস্থান করিলে, দুরন্ত রাক্ষসীরা জানকীকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিল; কেহ সান্ত্বনাবাক্যে, কেহ প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা, কেহ রাবণের গুণকীর্ত্তন করিয়া, এবং কেহ কেহ বা ভয়প্রদর্শন ও কটুবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক সীতাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু সীতাদেবী তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, এবং তাহাদের ভয়প্রদর্শনেও কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। জানকী তাঁহার জীবনরক্ষার নিমিত্ত আর যত্নবতী নহেন; রাক্ষসীরা তাঁহাকে বধ বা ভক্ষণ করুক, সীতা কিছুতেই তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না।

সীতা আর কাহারও ভয়ে ভীত নহেন। তিনি রাক্ষসীগণের সম্মুখেই লঙ্কার প্রতি অভিশাপ প্রদান ও রাবণের প্রতি যথেষ্ট তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কেহ কেহ রাবণের নিকট গমন করিল, কেহ কেহ বা সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিল। সীতা শোকে বিহ্বল হইয়া শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে আপনার শোচনীয় দশা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর দুই মাস কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে; রাবণ দুই মাস পরেই সীতার বিনাশ সাধন করিবে। দুরাত্মা সীতাকে নানা প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। সীতার জীবন বড় দুঃখময় হইয়াছে। রাম নিশ্চয়ই সীতার অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন, অথবা তিনি সীতাকে চিরকালের জন্য মনোরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন; সুতরাং সীতার উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। সীতা রামের বনিতা; সীতা রাক্ষসহস্তে অবমানিত ও উৎপীড়িত হইতেছেন। রামের দর্শনলাভের আশাতেই সীতা এতাবৎকাল জীবন ধারণ করিতেছেন; কিন্তু সে আশা এখন সুদূরপরাহত। সীতার মৃত্যু বুঝি সন্নিকট হইয়াছে; তবে মৃত্যুই হউক। অমূল্য সতীত্বরত্ন বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে বাঞ্ছনীয়। রাক্ষসহস্তে

প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা আত্মহত্যাই সীতার পক্ষে মঙ্গলজনক। আত্মহত্যা মহাপাপ বটে; কিন্তু যেখানে সতীত্বরত্ন হারাইবার আশঙ্কা, সেখানে আত্মহত্যাই মুক্তির একমাত্র উপায়। সীতা তবে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। সীতা জীবনে যে এত কষ্ট-ভোগ করিলেন, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত নহেন; তাঁহার দুঃখ এই যে, মৃত্যুকালে তিনি একবার স্বামীর চরণযুগল দর্শন করিতে পাইলেন না। যাঁহার জন্য তিনি এত অপমান ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া রহিলেন, হায়, মৃত্যুকালে তাঁহাকে একবার দর্শন করা সীতার ভাগ্যে ঘটিল না! সীতার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ! সহসা সীতার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল; তাঁহার শুভ্র গণ্ডস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। স্বামী, জনক, জননী, শ্বশ্রূ ও অন্যান্য গুরুজনকে তিনি উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, এবং সুস্থিরচিত্ত হইয়া আত্মহত্যাসাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সীতা অনেক চিন্তা করিয়াও কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না। সীতার নিমিত্ত জগতে একখণ্ড রজ্জুও বিদ্যমান নাই। সীতার ন্যায় মন্দভাগিনী আর কে আছে? সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল; সীতার নিমিত্ত একখণ্ড রজ্জু নাই বটে, কিন্তু তাহার পৃষ্ঠলম্বিত সুদীর্ঘ বেণী আছে। পাতিব্রত্যই একবেণীধারণের উদ্দেশ্য; সেই বেণীই আজ সীতার পাতিব্রত্য রক্ষা করিবে; সীতাদেবী আপনার বেণীর সাহায্যেই আজ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন! এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং শোকাকুলমনে রাম লক্ষ্মণ ও আত্মকুল স্মরণ

করিতে করিতে আত্মহত্যাসাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাবীর হনুমান্ অশোককাননে রাবণের আগমন অবধি সীতার আত্মহত্যার নিমিত্ত এই ভীষণ সঙ্কল্প পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই প্রচ্ছন্নভাবে অবলোকন করিতেছিলেন। সীতার পাতিব্রত্য-তেজদর্শনে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল এবং সীতার দুঃখে তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। জানকীকে আত্ম-হত্যা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। সীতা প্রাণত্যাগ করিলে, হনুমানের সাগরলঙ্ঘন প্রভৃতি কষ্টসাধ্য কর্ম্মসকল একেবারে বিফল হইবে, এবং রামলক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরকুল দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেন। সীতার সহিত অনতিবিলম্বে কোন প্রকারে একবার সাক্ষাৎ করা নিতান্তই আবশ্যক হইতেছে, তাহা না করিলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু হনুমান্ যে রামের চর, সে বিষয়ে তিনি জানকীর প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন কিরূপে? সীতা হনুমানকে কোন মায়াবী রাক্ষস মনে করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলে হনুমানের কার্য্যসিদ্ধিপথে বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া হনুমান্ সীতার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কৃত কথা কহিলে পাছে সীতা তাঁহাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া ভীত হন, এই আশঙ্কায় তিনি সীতার সহিত অর্থসঙ্গত মানুষী ভাষাতেই আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক হনুমান্ সীতার নিকটবর্ত্তী

হইয়া মৃদুমধুরবাক্যে তাঁহার ও রামের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্তই রামচন্দ্রের নিয়োগে দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিলেন।

মর্ত্ত্যকামা দেবী জানকী সহসা এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অলকসঙ্কুল মুখকমল উত্তোলন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে সভয়ে দেখিলেন যে, ভীমকায় বিকটাকার এক বানর শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় আরূঢ় রহিয়াছে! সীতাদেবী হনুমানকে কোন মায়াবী রাক্ষস মনে করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং ভয়সূচকস্বরে অস্ফুট চীৎকার করিয়া চমকিত হইলেন। তদ্দর্শনে হনুমান্ সীতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু সীতাদেবী তাঁহার কথায় সহজে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন মহাবীর পবনকুমার সীতার মনে বিশ্বাসসমুৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহার হরণ অবধি নিজের সাগরলঙ্ঘন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিলেন এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের আকার প্রকারও বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী হনুমানের বাক্যে আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তিনি তাঁহার নিকট রামলক্ষ্মণের কুশল সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর জানকী আত্মসংযম করিয়া হনুমানের নিকট রামলক্ষ্মণ সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজ দুরবস্থাব

সমগ্র দুঃখময় ইতিহাস কীর্ত্তন করিলেন এবং রামলক্ষ্মণ যে অনাথিনীকে ভুলিয়া আছেন ও তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত এত কালবিলম্ব করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়া অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন করিলেন। আর দুইমাস কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে; যদি ইহারই মধ্যে সীতার উদ্ধার না হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। সীতার বিলাপ-শ্রবণে হনূমান্ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার সমুদ্ধারার্থ ও পাপাত্মা রাবণের দণ্ডবিধানার্থ যে যুদ্ধোদ্যম হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং তৎবিরহে রামও যে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলেন। সীতাদেবী প্রিয়তমের কষ্টের কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হনূমান্ সীতার হস্তে রামপ্রদত্ত একটী স্বর্ণাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন; ঐ অঙ্গুরীয়কে রামনাম অঙ্কিত ছিল; সীতা তাহা দেখিবামাত্র রামের বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সাদরে তাহা গ্রহণপূর্ব্বক অবিতৃপ্তলোচনে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন। সীতাকে যারপরনাই কাতর দেখিয়া মহাবল হনূমান্ তাঁহাকে স্বপৃষ্ঠে আরোপণ পূর্ব্বক রামসন্নিধানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সীতাদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন না। সীতা ভীরুস্বভাবা নারী; হনূমানের সাগরলঙ্ঘনের সময় হয়ত তিনি তাঁহার পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া সাগরগর্ভে নিপতিত হইতে পারেন; অথবা রাক্ষসগণ হনূমানকে সীতাসহ পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। রাক্ষসগণের সহিত হনূমানের যুদ্ধারম্ভ হইলে, সীতার রক্ষণার্থ হনূমান্‌কে অতিশয় ব্যস্ত হইতে

হইবে, এবং তদবস্থায় যুদ্ধে জয়লাভ করাও তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর কার্য্য হইয়া উঠিবে; অথবা সীতাদেবীই পুনর্ব্বার রাক্ষস-কবলে পতিত হইতে পারেন; তাহা হইলে বিষম অনর্থও ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহা ব্যতীত হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করা সম্বন্ধে সীতার প্রধান আপত্তি এই যে, তিনি কদাচ পরপুরুষ স্পর্শ করেন না। এই নিমিত্ত তিনি বলিলেন "বীর, আমি পতি-ভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। দুরাত্মা রাবণ বলপূর্ব্বক আমাকে তাহার অঙ্গ-স্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্তু আমি কি করিব? তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যান, তবেই তাঁহার উচিত কার্য্য করা হইবে।" (৫।৩৭) হনূমান্ সীতার ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং এই বাক্য যে মহাত্মা রামের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সীতার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ কথোপকথনের পর হনূমান্ সীতাদেবীকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন, এবং রামের প্রত্যয়সমুৎপাদনার্থ তাঁহার নিকট কোন অভিজ্ঞান যাচ্ঞা করিলেন। সীতাদেবী তাঁহাদের বনবাস সময়ে সংঘটিত কোন বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতৃগৃহে বিবাহকালে জনকপ্রদত্ত এক উৎকৃষ্ট চূড়ামণি আপনার মস্তক হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক তাহা হনূমানের হস্তে প্রদান করিলেন এবং তৎকালে ইহাও বলিলেন, "দূত, এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে,

তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা দশরথকে স্মরণ করিবেন।" হনূমান্ সেই অভিজ্ঞানচূড়ামণি গ্রহণ পূর্ব্বক সযত্নে তাহা রক্ষা করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনা সীতাদেবীকে সান্ত্বনা ও ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

হনূমান্ অশোককাননে বিচরণ করিতে করিতে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। লঙ্কা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার রাবণের বলাবল পরীক্ষা করিয়া যাইতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল। তদুদ্দেশ্যে তিনি সেই মনোহর অশোককাননকে ভগ্ন ও হতশ্রী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার ভীম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে এই ভয়ঙ্কর উৎপাতসংবাদ রাবণের কর্ণগোচর হইল। রাবণ বানরকে ধৃত বা নিহত করিতে অনুচরগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। তৎক্ষণাৎ তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হনূমানের সহিত অশোককাননে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হনূমান্ তাহাদের শরজাল নিবারণ করিয়া অক্লেশেই তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। রাবণ বানরের দুঃসাহসদর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎবিরুদ্ধে প্রধান প্রধান সেনাপতি-গণকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহারাও তৎকর্ত্তৃক যমসদনে প্রেরিত হইল। অনন্তর যুদ্ধবিশারদ রাবণকুমার অক্ষ রোষভরে হনূমানের বিরুদ্ধে ধাবমান হইল; হনূমান্ তাহার শরে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া অতিশয় ক্লিষ্ট হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিয়ৎক্ষণ জয়পরাজয় কিছুই স্থিরীকৃত হইল না; পরিশেষে মহা-বীর পবনকুমার তাহাকেও অনুচরবর্গের সহিত সংহার করিলেন

এবং এক প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কুমার অক্ষের বধসংবাদশ্রবণে রাবণ রোষে চিতাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে তৎক্ষণাৎ বানরবধে প্রেরণ করিল। হনূমান্ ইন্দ্রজিৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পাশবদ্ধ হইলেন এবং দুরন্ত রাক্ষসগণকর্তৃক নানাপ্রকারে তাড়িত হইয়া আপনাকে রাবণ সমীপে সমানীত হইতে দিলেন। রাবণের সহিত একবার সাক্ষাৎকার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাবণ হনূমান্‌কে দেখিবামাত্র তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। হনূমান্ নির্ভীকচিত্তে রাবণকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া লঙ্কায় তাঁহার আগমনকারণ যথাযথ বর্ণনা করিলেন, এবং রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া সীতাদেবীকে অনতিবিলম্বে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। রাবণ হনূমানের বাক্যে অতিশয় কুপিত হইল। হনূমান্ কিছুতেই ভীত হইবার পাত্র নহেন; তিনিও রাবণের পাপাচারের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে সভামধ্যেই তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া হনূমানের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিল; কিন্তু মহামতি বিভীষণ রাক্ষসরাজের ক্রোধ প্রশমিত করিয়া দূতের অবধ্যতা প্রতিপাদন করিলেন, এবং হনূমান্‌কে কোনওরূপে বিকৃতাঙ্গ করিয়া লঙ্কা হইতে দূরীভূত করিতে পরামর্শ দিলেন। রাবণ তদনুসারে হনূমানের পুচ্ছ দগ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিল। মহাবীর হনূমানের সুদীর্ঘ পুচ্ছটি তৈলসিক্ত ছিন্নবস্ত্রে সংবৃত হইলে, রাক্ষসেরা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। অগ্নি প্রজ্বলিত হইবামাত্র

হনূমান্ একলম্ফে গৃহচূড়ে আরোহণ করিয়া তাহাতে সেই অগ্নি প্রদান করিলেন এবং ক্ষিপ্রতাসহকারে গৃহ হইতে গৃহান্তরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সুশোভনা লঙ্কাপুরীকে অগ্নিমালায় সুসজ্জিত করিলেন। আনন্দনিমগ্না সেই মহানগরী অবিলম্বে হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং ক্ষণকালমধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া শ্মশানতুল্য ভীষণ আকার ধারণ করিল।

মহাবীর হনূমান্ এইরূপ মহোৎসাহে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া সীতার নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে অশোক-কাননে নিরাপদ দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে পুনর্ব্বার সাগর লঙ্ঘন করিলেন। অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ দূর হইতে মহাবীর পবনকুমারের হুঙ্কারশব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিলেন না। হনূমান্ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবামাত্র প্রধান প্রধান বানরগণ তাঁহার মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া উল্লাসে নিমগ্ন হইলেন, এবং হর্ষব্যঞ্জক সিংহনাদ ও কিলকিলাশব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। বানরগণ আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকে নিমগ্ন হইল এবং মহারাজ সুগ্রীবের সুরক্ষিত এক মধুবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় যথেচ্ছ মধু-পান করিতে লাগিল।

এদিকে হনূমান্ ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের প্রত্যাগমনবার্ত্তা-শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হই-লেন না। যথাসময়ে তাঁহারা কাননশোভিত প্রস্রবণশৈলে উপ-নীত হইলে, মহাবীর পবনকুমার সোৎকণ্ঠ রামলক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের

সমক্ষে সীতাসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সাগরলঙ্ঘন অবধি সীতা দর্শন ও লঙ্কাদাহন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। সীতার দীনদশা, সীতার একান্ত পতিপরায়ণতা, রাবণের সহিত সীতার ব্যবহার, রাবণের উৎপীড়ন, সীতার যন্ত্রণা, সীতার সহিত রাবণের সময়, রামলক্ষ্মণের ঔদাসীন্যে সীতার বিলাপ, প্রাণ-বিসর্জ্জনে সীতার সঙ্কল্প ইত্যাদি সমস্ত কথাই তিনি রামের নিকট বিবৃত করিলেন। রাম তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন। অনন্তর হনূমান্ সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞানচূড়ামণি রামহস্তে অর্পণ করিবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা চিনিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আবেগপূর্ণহৃদয়ে বক্ষঃস্থলে বারম্বার স্থাপন করিতে লাগিলেন, এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

অত্যল্পকালমধ্যে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল। অগণিত বানর-সৈন্য নভোমণ্ডলে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দিনমধ্যে রামচন্দ্র সসৈন্যে সাগরোপকূলে উপস্থিত হইলেন এবং সাগর সমুত্তীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বানরগণের মধ্যে কেবল মহাবীর হনূমানই সাগর লঙ্ঘনে সমর্থ; কিন্তু এই অসংখ্য বানর লইয়া রামচন্দ্র কিরূপে লঙ্কায় উপনীত হইবেন, সেই চিন্তায় আকুল হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া বিষণ্নমনে সেই সমুদ্রতটেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে লঙ্কাভিমুখে রামের সসৈন্যে আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দুর্ব্বৃত্ত রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইল। সে অনতিবিলম্বে সমস্ত জ্ঞাতি

বন্ধু ও পারিষদকে সভামণ্ডপে একত্র করিয়া তাহাদের সহিত উপস্থিত বিপদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত করিতে লাগিল। অনেকেই রাবণের ন্যায় পাপাত্মা ও বীর্য্যমদে গর্ব্বিত ছিল, সুতরাং তাহারা লঙ্কেশ্বরকে সুপরামর্শ দিতে অক্ষম হইল। কেবলমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণই অগ্রজ রাবণের হিতকামনায় কতকগুলি সদুপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু দুরাত্মা তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথেষ্ট অবমানিত করিল। বিভীষণের অপরাধ এই যে, তিনি রাবণকে রামহস্তে সীতাসমর্পণ করিয়া স্বরাজ্য রক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সীতা হইতে যে রাবণের সর্ব্বনাশসাধন হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া মহামতি বিভীষণ দুঃশীল ভ্রাতার সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া রামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাম বিভীষণ সমন্ধে সকল কথাই অবগত হইয়া তাঁহার সহিত পবিত্র মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। বিভীষণও রামের সম্যক্ সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তদনন্তর সাগরসমুত্তরণের চেষ্টা হইতে লাগিল। সেনাপতি নল বানরগণের সাহায্যে বৃক্ষপ্রস্তর দ্বারা সাগর বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যল্পদিবসের মধ্যেই তাহা সুসম্পন্ন করিলেন। সেই সুরচিত বিস্তৃত সেতু অনন্ত নীলাম্বুরাশি মধ্যে লম্বমান হইয়া, গগনতলে ছায়াপথের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। রামচন্দ্র বানরসৈন্যসমভিব্যাহারে সেই সেতুসংযোগে সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাভূমিতে পদার্পণ করিলেন এবং নানাস্থলে স্কন্ধাবার স্থাপন ও অপূর্ব্ব ব্যূহরচনা করিয়া লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ করিলেন; বানরগণ মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের জয়োল্লাসধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়।

সীতাদেবী রক্ষোগৃহে অবরুদ্ধ ও দুরন্ত চেড়ীগণে নিরত পরি-বেষ্টিত থাকিয়াও সেখানে নিতান্ত সহায়শূন্যা ছিলেন না। সীতার অলৌকিক চরিত্রগুণে অনেকেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। ত্রিজটানাম্নী রাবণের এক বিশ্বস্তা পরিচারিকা প্রকাশ্যে সীতাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিলেও অন্তরে তাঁহার অতিশয় হিতা-কাঙ্ক্ষিণী ছিল। ত্রিজটা গোপনে সীতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিত, এবং সেই পতিবিয়োগবিধুরাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিত। একদিন সে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া সীতার সমক্ষেই চেড়ীগণকে বলিয়াছিল যে সীতাহরণপাপেই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা অবিলম্বে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এবং সীতাকে তাঁহার বিজয়ী স্বামী উদ্ধার করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইবেন; অতএব যাহারা নিজ নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের এখন হইতেই সীতার অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য। বিষাদময়ী জানকী ত্রিজটার এই স্বপ্নসংবাদে হৃষ্ট হইয়া ব্রীড়াবনতবদনে বলিয়াছিলেন "ত্রিজটে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি তোমাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিব।" (৫।২৭) আর একদিন ত্রিজটা সীতাকে বলিয়াছিল "দেবি, তুমি চরিত্রগুণে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ।" (৬।৪৮) সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই নির্ব্বান্ধবপুরী লঙ্কাতেও সীতাদেবী ত্রিজটার ন্যায় রাক্ষসীসহবাসে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন।

সরমা সীতার অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষিণী সখী ছিলেন। রাবণ

সরমাকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিল। সরমা এই নিমিত্ত নিয়তই সীতাসন্নিধানে অবস্থান করিতেন। রাঘববনিতা তাঁহাকেই বিশ্বাস করিয়া আপনার দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতেন। সরমার হৃদয় স্ত্রীজনোচিত কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল; সীতার দুঃখে সরমা অশ্রুমোচন করিতেন। রামচন্দ্রের সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন অবধি রাবণ কিরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, সরমা তাহা অবগত হইয়া সীতাকে জ্ঞাপন করিতেন, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন। দেবী সরমা মন্দভাগিনী সীতার অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র আলোকস্বরূপ ছিলেন। সীতা এই প্রিয়সখীর সহবাসে ক্ষণকালের নিমিত্তও আপনার দুঃখজ্বালা বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইতেন।

ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ সীতাদেবীর কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষ ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রামহস্তে সীতাপ্রত্যর্পণরূপ হিত বাক্য বলিয়াই তিনি রাবণকর্তৃক যৎপরোনাস্তি অবমানিত হইয়াছিলেন; সেই কারণে তিনি রাবণের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিভীষণের কলানাম্নী এক কন্যাও সীতার অতিশয় হিতৈষিণী ছিলেন।

রাবণের পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ সীতার পক্ষ হইয়া রাবণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেন। রাবণের মাতামহ বৃদ্ধ মাল্যবান্ ও অবিন্ধ্য প্রভৃতি রাক্ষসগণ দুঃখিনী সীতাকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করিতে অনেক অনুরোধ করিতেন; কিন্তু দুরাত্মা রাবণ তাঁহাদের হিতকর বাক্যে কিছুতেই কর্ণপাত করিত না। মৃত্যু যেন কেশাকর্ষণ করিয়াই তাহাকে রামের সহিত যুদ্ধে প্রব-

র্ত্তিত করিতে লাগিল। রাবণ রামের সৈন্যবল ও বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল, কিন্তু সেই পাপাত্মা দর্পিত সেনাপতি ও মন্দবুদ্ধি মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সমুৎসাহিত হইয়া রামের সহিত সন্ধি-স্থাপনের কোনই চেষ্টা করিল না। রামচন্দ্র যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রাবণের নিকট যুবরাজ অঙ্গদকে একবার প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ রাবণকে রামহস্তে সীতাসমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহার হিতবাক্যে অতিশয় রুষ্ট হইল। যুদ্ধ অনিবার্য্য দেখিয়া রামচন্দ্র সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিলেন।

রাবণ অতিশয় বীর ও যুদ্ধনীতিবিশারদ। বিনা যুদ্ধে যাহাতে সীতাকে বশবর্ত্তিনী অথবা রামকে পরাজিত করিতে পারা যায়, রাবণ তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সীতা একবার রাবণের অনুগতা হইলে, রাম রোষে ও ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিবে। কিন্তু সীতা স্বামীর তেজোগর্ব্বে সর্ব্বদাই দৃপ্তা; রাবণ মনে করিল, রাম বিনষ্ট না হইলে, অথবা রাম বিনষ্ট হইয়াছেন এরূপ বিশ্বাস না হইলে, সীতা কখনই রাবণকে আত্মসমর্পণ করিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া দুষ্ট রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বনামা এক অনুচরকে আহ্বান করাইয়া তাহাকে মায়াবলে রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল। মুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত হইলে, রাবণ তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে করিতে অশোককাননে উপস্থিত হইয়া সীতার নিকট সৌপ্তিকযুদ্ধে রামের বিনাশসংবাদ জ্ঞাপন

করিল, এবং সীতার বিশ্বাসসমুৎপাদনের নিমিত্ত সেই মায়ামুণ্ড ও শরাসন আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিল। সীতা বুদ্ধিমোহে সেই ছিন্নমুণ্ডকে রামেরই মুণ্ড মনে করিয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং বহুপ্রকারে নিজ অদৃষ্টের নিন্দা ও রামের জন্য বিলাপ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় রাবণকে বলিতে লাগিলেন "রাবণ, তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্ত্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দাও, এবং কল্যাণের কার্য্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।" (৬।৩২)

সীতা এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দ্বার-রক্ষক আসিয়া রাবণকে বলিল যে, সেনাপতি ও অমাত্যগণ রাজদর্শনাভিলাষে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাবণ তৎক্ষণাৎ অশোক-কানন পরিত্যাগ করিল। সে চলিয়া গেলে, সরমাদেবী সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া মায়ামুণ্ডরহস্য বিবৃত করিলেন এবং সীতাকে মধুরবচনে সান্ত্বনা করিলেন। সেই সময়ে জলদগম্ভীর ভেরীরবের সহিত বানর ও রাক্ষস সৈন্যের ভীষণ সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন সীতাদেবী বুঝিতে পারিলেন যে, উভয় সৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামের অয়োজন হইতেছে। জানকী মধুরভাষিণী সরমা কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বানর ও রাক্ষসগণের ভীষণ সংগ্রাম আরব্ধ হইল জয়পরাজয় উভয় দলকেই আশ্রয় করিতে লাগিল। একদিন

কুমার ইন্দ্রজিৎ রামের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। সহস্র সহস্র বানর ও রাক্ষসের শোণিতে রণস্থল কর্দ্দমময় হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ মহানন্দে পুত্রকে আলিঙ্গন করিল এবং তৎক্ষণাৎ সীতাকে রথে আরোপণ করিয়া একবার রণস্থলী দর্শন করাইতে ত্রিজটার প্রতি আদেশ করিল। ত্রিজটা সীতাকে লইয়া শূন্য হইতে নাগপাশ-বদ্ধ রামলক্ষ্মণকে দেখাইতে লাগিল। সীতাদেবী তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিয়া বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন; কিন্তু সহৃদয়া ত্রিজটা তাঁহাকে শোকাপনোদন করিতে উপদেশ দিলেন। রামলক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া সীতা আশ্বস্ত হইলেন এবং অশোককাননে পুনর্ব্বার আনীত হইলেন। মায়ামুণ্ডপ্রদর্শনের ন্যায় এইবারও রাবণের যত্ন বিফল হইল।

বানরসৈন্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ, ত্রিশিরা, মহোদর, অতিকায়, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ প্রভৃতি রাবণের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ একে একে বিনষ্ট হইল; লঙ্কা বীরশূন্যা হইল। কেবলমাত্র রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করিয়া কখন জয়লাভ এবং কখনও বা পরাজয় স্বীকার করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিত। বানরগণ একবার জয়শ্রীলাভ করিয়া মহোৎসাহে লঙ্কায় অগ্নি প্রদান করিল; লঙ্কা আবার দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল। রাবণ সহায়শূন্য হইয়া লঙ্কার অবশ্যম্ভাবী পতনের আশঙ্কা করিল; কিন্তু সে তথাপি নিরাশ হইল না। রাবণ যেরূপ মায়ামুণ্ড প্রদর্শন করিয়া সীতাকে বশবর্ত্তিনী করিতে প্রয়াস

পাইয়াছিল, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎও রামলক্ষ্মণকে ভগ্নোৎসাহ করিবার নিমিত্ত একদিন যুদ্ধস্থলে রথোপরি এক রোরুদ্যমানা মায়াসীতা প্রদর্শন পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিল। হনুমান্ স্বচক্ষে এই হৃদয়বিদারী দৃশ্য অবলোকন করিয়া সজলনয়নে সীতা-বধরূপ দুঃসংবাদ রামকে জ্ঞাপন করিলেন। রামলক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদি বানরগণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহামতি বিভীষণ এই আকস্মিক শোকোচ্ছ্বাস দর্শনে তাহার কারণ অবগত হইলেন এবং প্রকৃত রহস্য বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন।

ইন্দ্রজিৎকে দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্জ্জয় দেখিয়া একদিন বিভীষণ, মহাবীর লক্ষ্মণ হনুমান্ ও অগণ্য বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে, তাহার নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে গোপনে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার সমস্ত যজ্ঞদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ করিতেছিল, এমন সময়ে লক্ষ্মণ তাহার উপর প্রখর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যজ্ঞস্থলে নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা-লাভ করিয়া শোকে উন্মত্তবৎ ভীষণ রূপ ধারণ করিল। তাহার গর্ব্বিত হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়িল, ও হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল। রাবণ সমস্ত জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, এবং কালরূপিণী সীতাই যে সমস্ত অনর্থপাতের মূল, তাহা এত-দিনে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। রাবণ তৎক্ষণাৎ খড়্গো-

ত্তোলন করিয়া সীতার বিনাশার্থ ধাবমান হইল; তাহার সংহার-মূর্ত্তি দর্শনে সকলে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। সীতা দূর হইতেই রাবণকে ভীমবেশে আসিতে দেখিয়া নিজ মৃত্যু অবধারণ করিলেন, এবং হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা প্রেমময় জীবিতনাথের পদারবিন্দ স্মরণ করিয়া রাবণের খড়্গাঘাত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা রাবণের পত্নীগণ শোকাকুলমনে ও আলুলায়িতকেশে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্ত্রীবধরূপ পাপময় ঘৃণিত কার্য্যানুষ্ঠান হইতে বিরত করিল। রাবণ শোকে বিহ্বল হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল এবং তদ্দণ্ডেই যুদ্ধযাত্রা করিয়া রামের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন। রামচন্দ্র প্রাণপ্রতিম ভ্রাতাকে গতাসু মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; বানরসকল শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল; মুহূর্ত্তমধ্যে সেই রণস্থল হাহাকার ও বিলাপধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া লুপ্তসংজ্ঞ হইলে, হনুমান্ সুচিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ সেই ঔষধের গুণে অচিরে সুস্থ হইলেন। বানরগণের জয়োল্লাসে পুনর্ব্বার সেই লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতে লাগিল। রামের বিজয়িনী শক্তি কিছুতেই বিধ্বস্ত হইল না দেখিয়া রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইল। রাবণ

পুনর্ব্বার অমিততেজে যুদ্ধস্থলে উপনীত হইল এবং সেই দিনই পৃথিবীকে অরাম বা অরাবণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। রামরাবণের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ও বিচিত্র রণ-নৈপুণ্য দর্শনকরিতে দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরোগণ আগমন করিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ত্রিলোকপূজ্য রামচন্দ্রকে ভূমিতলে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অনুকম্পা-পরবশ হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই রামের নিকট স্বীয় অপূর্ব্ব রথ প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র দেবরাজের প্রসন্নতায় হৃষ্ট হইয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথিকে রাবণাভিমুখে রথ-চালনা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই বীরযুগলের অপূর্ব্ব রণবেশ, ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার, ও কৃতান্তসদৃশ সংহারমূর্ত্তিদর্শনে জীবজন্তুসকল ভয়ে নিস্পন্দ হইল। অনন্তর উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বৈরথ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। বিজয়লক্ষ্মী কাহার পক্ষ আশ্রয় করিবেন, ইহা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন একবার রামের এবং একবার রাবণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই মহর্ষি অগস্ত্য যুদ্ধদর্শনার্থ লঙ্কাতে আগমন করিয়া রাবণবধের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে আদিত্য-হৃদয় নামক সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সুতরাং রাঘব রাবণবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলেও, জয়পরাজয় কিছুই স্থিরীকৃত হইল না। অবশেষে রামচন্দ্র ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া রাবণের প্রতি এক ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতেই রাবণ গতাসু হইয়া রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল।

রাবণ নিহত হইবামাত্র এক মহান্ আনন্দকোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অমরবৃন্দ রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরোগণ বিজয়ী রাঘবের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণের মধ্য হইতে এক তুমুল কিলকিলাধ্বনি সমুত্থিত হইল। অধর্ম্মাচারী রাবণের নিধনমাত্রে দিক্‌সকল যেন প্রসন্ন হইয়া গেল; গন্ধবহ মধুগন্ধে সর্ব্বস্থল পরিপূরিত করিল; সূর্য্যমণ্ডল যেন প্রভাসম্পন্ন হইল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন রামের বিজয়িনী শক্তির সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। বিভীষণ পাপাচারী রাবণকে ধরাশায়ী দেখিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন; রাবণের পত্নীগণ ভর্ত্তৃশোকে কাতর হইয়া উন্মাদিনীবেশে রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে রণস্থলে আগমন করিল। করুণহৃদয় রামচন্দ্র বিভীষণকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে রাবণের প্রেতকৃত্য সমাপন ও নারীগণকে সান্ত্বনা করিতে উপদেশ দিলেন। রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে মহাবীর রাবণের শৌর্য্যবীর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, লক্ষ্মণ রামের আদেশে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এতদিনে দুরন্ত শত্রুর সমুচ্ছেদ হইল। এতদিনে রামচন্দ্র সফলকাম হইলেন। সীতাসমুদ্ধারার্থ সুগ্রীব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহাও পূর্ণ হইল। রাবণবধে সকলেই হর্ষ ও আনন্দে নিমগ্ন হইল। রামচন্দ্র, সুগ্রীব বিভীষণ ও প্রধান প্রধান বানরগণকে আলিঙ্গন করিয়া, হৃদ্গত আনন্দ প্রকটিত করিলেন

অতঃপর তিনি মহাবীর হনূমান্‌কে অশোককাননে সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে ও তাঁহাকে রাবণবধসংবাদ জ্ঞাপন করিতে লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রেরণ করিলেন। হনূমান্‌কে গমনোদ্যত দেখিয়া তিনি বলিলেন "বীর, তুমি জানকীকে এই প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া আইস।" সীতাদেবী মলিনবেশে দীনচিত্তে অশোক-কাননে রাক্ষসী-পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে হনূমান্ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া রাম-লক্ষ্মণের কুশলবার্ত্তা ও দুরাত্মা রাবণের বধ-সংবাদ নিবেদন করিলেন। দেবী জানকী হনূমানের মুখে এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে কিয়ৎক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণকাল পরে, তিনি বলিলেন "বৎস, তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে, ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী হইতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্যরাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না। (৬।১০৪)

হনূমান্ সীতার বাক্যে আনন্দিত হইয়া তৎপ্রীতিকামনায় সীতার ক্লেশদাত্রী দুরন্ত রাক্ষসীগণকে বধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দীনা, দীনবৎসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া তাঁহাকে সেই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। সীতা বলিলেন "বীর, যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্ব্ব দুষ্কৃতিনিবন্ধন

এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি, আমি স্বকার্য্যেরই ফল-ভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এইটি দৈবী গতি। এক্ষণে আমি ইহাদিগকে, নিতান্ত অক্ষম ও দুর্ব্বলের ন্যায়, ক্ষমা করিতেছি। ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারাও আর আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে না। যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যপকার করেন না ; ফলতঃ এইরূপ আচার রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ; চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। আর্য্যব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন। ধরিতে গেলে, সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে ; সুতরাং সর্ব্বত্র ক্ষমা করা উচিত। পরহিংসাতে যাহাদের সুখ, যাহারা ক্রূর-প্রকৃতি ও দুরাত্মা, পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবে না।" (৬।১১৪)।

হনূমান্ সীতার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতমনে কহিলেন "দেবি, বুঝিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্ম্মপত্নী এবং সর্ব্বাংশেই তাঁহার অনুরূপা ; এখন আমায় অনুমতি কর, আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি।' তখন জানকী বলিলেন "সৌম্য, আমি ভক্তবৎসল ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি।" মহামতি হনূমান্ তাঁহার মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন "দেবি, আজই তুমি রামলক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে। তিনি এখন নিঃশত্রু ও স্থিরমিত্র ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন, তুমিও আজ সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।" এই বলিয়া হনূমান্

জানকীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রামসন্নিধানে উপনীত হইলেন।

রাম হনুমানের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সহসা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল বাষ্পপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিভীষণকে কহিলেন "রাক্ষসরাজ, জানকীকে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া এই স্থানে শীঘ্র আনয়ন কর।" বিভীষণ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় পুরস্ত্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন, পরে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন "দেবি, তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ কর; তোমার মঙ্গল হউক, রাম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।"

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। বহুদিনের পর আজ সীতাদেবী ভর্তৃসন্দর্শনে গমন করিতেছেন, তাঁহার আর বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন কি? কিন্তু বিভীষণ তাঁহাকে ভর্তৃনিদেশ পালন করিতেই অনুরোধ করিলেন; পতিব্রতা রাঘবপত্নীও পতিভক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি অবিলম্বে শুদ্ধস্নাতা হইয়া মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করিলেন। সীতাদেবীর হৃদয়ক্ষেত্র আজ নানাভাবের লীলাভূমি। পামর রাবণের হস্ত হইতে তিনি যে কখনও মুক্তিলাভ করিবেন এবং আর কখনও যে তিনি স্বামিমুখ দর্শন করিতে পাইবেন, তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু সীতাদেবী আজ সত্য সত্যই সেই প্রেমময় জীবিতনাথের

সন্দর্শনেই গমন করিতেছেন। ইহা ত অভাগিনী সীতার দুঃখময় জীবনে সুখস্বপ্নমাত্র নহে? সীতা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবতাগণকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। সীতা এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্না, ইত্যবসরে শিবিকা রামসন্নিধানে উপনীত হইল। বিভীষণ অগ্রসর হইয়া রামকে সীতার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাম জানিয়াও যেন কিছুই জানেন না, তিনি সীতার শিবিকাটি সন্নিহিত হইতে দেখিয়াই ধ্যানমগ্ন হইলেন। আজ তাঁহার হৃদয় ঘোর অশান্তিপূর্ণ। একদিকে ক্ষত্রিয়তেজ ও ক্ষত্রিয় অভিমান, অপরদিকে দাম্পত্যপ্রেম ও প্রিয়জনসমাগম; একদিকে সীতার রাক্ষসগৃহবাস, অপরদিকে সীতার নির্দ্দোষিতা; একদিকে লোকাপবাদ, অপরদিকে হৃদ্গত অভ্রান্ত বিশ্বাস; একদিকে মাধুর্য্য, অপরদিকে ভীষণতা; এবম্বিধ নানা ভাবের তুমুল আন্দোলনে তাঁহার হৃদয় অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িল। রামচন্দ্র নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া বিভীষণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন "বীর, দেবী জানকী উপস্থিত।" ঐ রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আগমনবার্ত্তা অবগত হইবামাত্র রামচন্দ্র আবার হৃদয়মধ্যে যুগপৎ হর্ষ, রোষ ও দুঃখ অনুভব করিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "রাক্ষসরাজ, জানকী শীঘ্রই আমার নিকট আগমন করুন।" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ রামের আদেশশ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসন্নিহিত সমস্ত লোককে সেইস্থান হইতে অপসারিত করিতে ভৃত্যগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন। বানর

ভল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উত্থিত হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বায়ুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় একটী তুমুল কলরব সমুত্থিত হইল। সহসা রামের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সৈন্যগণের অপসারণ ও তন্নিবন্ধন সকলকে ভটস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে বিভীষণকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দিতেছ? ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজাড়ম্বর মাত্র; চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। অধিকন্তু বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রী-লোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপন্না; ইনি অতিশয় কষ্টে পড়িয়াছেন। এসময়ে, বিশেষতঃ আমার নিকটে, ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব, তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দর্শন করুক।" (৬।১১৫)

বিভীষণের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ এবং হনুমান্ও রামের এই আদেশশ্রবণে অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। বানর ও রাক্ষসসমাজ নীরব ও নিস্পন্দ; মহামতি বিভীষণ সীতাসমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন; কৌশেয়বসনা সীতাদেবী লজ্জায় যেন স্বদেহে মিশাইয়া যাইতে-ছেন; বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ; লোকে অনিমিষলোচনে সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; রামচন্দ্র সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। সীতাদেবী ধীরে ধীরে স্বামীর সম্মুখে

উপস্থিত হইয়া মুখাবরণ উত্তোলন করিলেন এবং বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্ত্তার পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ প্রশান্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করিলেন। সীতার দৃষ্টি স্থির ও সরল ; ক্রমে ক্রমে চক্ষুদুটি বিস্ফারিত হইল ; সহসা তাহা হইতে এক দিব্য আলোক নিঃসৃত হইয়া তাঁহার নির্ম্মল মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। সীতা স্বামিসন্নিধানে মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া গেলেন ; সীতা যেন আর এই শোকতাপময় বিচ্ছেদবিরহপরিপূর্ণ সংসারে বিদ্যমান নাই ; সীতা যেন স্বামী সহ বিচরণ করিতে করিতে কোন্ এক দেবরাজ্যে আসিয়াছেন, সেখানে পাপ নাই, অশান্তি নাই ; সেখানে মন্দার-কুসুম নিয়ত প্রস্ফুটিত, পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ; সেখানে রাম অথবা সীতা কেহই যেন রক্তমাংসময় শরীর ধারণ করিয়া নাই ; সেখানে যেন অপ্সরঃকণ্ঠে তাঁহাদেরই জয়গীতি উচ্চারিত হইতেছে! সীতা যাঁহাকে শয়নে জাগরণে চিন্তা করিতেন, যাঁহার নামামৃত পান করিয়াই তিনি এতাবৎ কাল জীবিত আছেন, দেহে দেহে অন্তরিত হইলেও যাঁহা হইতে তিনি মুহূর্ত্তেকের জন্যও কদাপি বিচ্ছিন্ন হন নাই এবং যাঁহাকে তিনি তাঁহার একমাত্র দেবতা জ্ঞান করেন, সেই ইহকালের গতি, পরকালের মুক্তি, প্রাণবল্লভ হৃদয়স্বামীকে সীতাদেবী বহুকালের পর কেবলমাত্র একটীবার নয়নগোচর করিয়া ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল হইয়া পড়িলেন! তিনি স্বামীর দিকে অনিমিষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎকাল চিত্রার্পিতার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার চেতনাসঞ্চার হইল। সীতা দেখিলেন যে তিনি বাস্তবিক কোন দিব্যধামে বিদ্যমান নাই,

পরন্তু রাক্ষসগৃহ হইতে সমানীত হইয়া রণস্থলে রাক্ষস ও বানর সৈন্যগণের মধ্যে স্বামীর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! সীতা সহসা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন "ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয়, আমি তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল এবং আমি অপমানেরও প্রতিশোধ লইলাম। আজ সকলে আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা সমুত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল, ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহার ক্ষালন করিলাম। আজ মহাবীর হনূমানের সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি গৌরবের কার্য্য, সুগ্রীবের যত্ন চেষ্টা বিক্রমপ্রদর্শন ও সৎপরামর্শদান, এবং মহামতি বিভীষণেরও সমস্ত পরিশ্রমই সফল হইয়াছে।" রামের বাক্য শুনিতে শুনিতে সীতাদেবীর নয়নযুগল আবার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং শিশিরসিক্ত কমলদলের ন্যায় বাষ্পজলে পরিব্যাপ্ত হইল। রাম ঐ নীলকুঞ্চিতকেশা কমললোচনার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সহসা আত্মসংযম করিয়া আবার সর্ব্বসমক্ষেই নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিতে লাগিলেনঃ—

"অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, আমি রাবণের বধসাধনপূর্ব্বক তাহা করিয়াছি। * * *

তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যে সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্ররক্ষা, সর্ব্বব্যাপী নিন্দাপরিহার এবং আপনার প্রখ্যাতবংশের নীচত্ব-অপবাদ-ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল, সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আজ তোমায় কহিতেছি, তুমি যেদিকে ইচ্ছা গমন কর, আমি আর তোমায় চাই না। যে স্ত্রী পরগৃহবাসিনী, কোন্ সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে? তুমি রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলে, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনর্গ্রহণ করিব? যে কারণে তোমায় উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও" * * * (৬।১১৬)

যদি সেই সময়ে সহসা সীতার মস্তকে অশনিপাত হইত, সীতা কিছুতেই বিস্মিত হইতেন না। সীতা প্রিয়তম জীবিতনাথের এই রোমহর্ষণ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সীতার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সময়ে পৃথিবী যদি দ্বিধা হইত, তাহা হইলে অভাগিনী তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া এই দারুণ অপমান ও লজ্জা হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেন। লজ্জায় তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন।

তিনি বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বস্ত্রাঞ্চলে মুখচক্ষু মুছিয়া মৃদু ও গদ্গদবাক্যে রামকে বলিলেন "যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ়কথা বলে, সেইরূপ তুমিও আমাকে শ্রুতিকটু অবাচ্য রুক্ষ কথা কহিতেছ! তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ, আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচ-প্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ, ইহা একান্ত অনুচিত; যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অসাবধান অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমি কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন, সেই হৃদয় তোমাতে ছিল; আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে, সেই দেহ সম্বন্ধে আমি কি করিব? আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক, তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি! তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন হনূমানকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শ্রবণ করাও নাই? আমি এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না, এবং তোমার সুহৃদ্গণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্, তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচলোকের ন্যায় আমাকে অপরসাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত অভিন্ন ভাবিতেছ, কিন্তু আমার

জানকী নাম কেবল জনকের যজ্ঞসম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে। পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিতে পারিলে না; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ, তাহাও মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে!" (৬।১১৭)

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদস্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন "লক্ষ্মণ, তুমি আমার চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও; এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ। আমি মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিয়া আর বাঁচিতে চাই না। ভর্ত্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক দেহপাত করিব।" (৬।১১৭) লক্ষ্মণ বাষ্পাকুললোচনে রোষভরে রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকারপ্রকারে তাঁহার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে তৎক্ষণাৎ এক চিতা প্রস্তুত করিলেন। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সাহস পূর্ব্বক কালান্তকযমতুল্য রামকে কোন কথাই বলিতে সমর্থ হইলেন না। সীতাদেবী স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন "যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সীতাকে অসতী জানিতেছেন, যদি আমি সতী হই, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।" এই বলিয়া জানকী

চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে অকাতরে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন! আবালবৃদ্ধ সকলে আকুল হইয়া দেখিল, সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সর্ব্বসমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেন! মহর্ষি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঐ বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইলেন! সমবেত স্ত্রীলোকেরা আকুলহৃদয়ে রোমাঞ্চদেহে দেখিলেন, তেজোগর্ব্বিতা জানকী মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেন! চারিদিকে হাহাকারধ্বনি উঠিল; জীবজন্তুসকল তুমুল রবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সকলে বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল!

রাম জানকীর এই অলৌকিক কার্য্যদর্শন ও তৎকালে সকলের মুখে নানাকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা দৈববাণী হইল "রাম, তুমি সকলের কর্ত্তা, ও জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য; এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায়, জানকীর অগ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা করিতেছ কেন? এই সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও নিষ্পাপা, তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর। তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, রাবণবধের নিমিত্ত মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ, এক্ষণে সেই কার্য্য সাধিত হইয়াছে।" বাক্যাবসান হইতে না হইতেই, মূর্ত্তিমান্ অগ্নি সমবেত সর্ব্বজনের মনে বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়া জানকীকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক চিতা হইতে সমুদ্ভূত হইলেন! জানকী তরুণসূর্য্যপ্রভা ও স্বর্ণালঙ্কার-শোভিতা; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত। দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও

অলঙ্কার ম্লান হয় নাই! সর্ব্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন "রাম, এই তোমার জানকী; ইনি নিষ্পাপা। এই সচ্চরিত্রা বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইহাঁকে আনিয়াছে, তদবধি আজ পর্য্যন্ত ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নির্জ্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধা ও রক্ষিতা। ইনি এতদিন পরাধীন ছিলেন, কিন্তু তোমাতেই ইহাঁর চিত্ত, তুমিই ইহাঁর একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোরবুদ্ধি রাক্ষসীরা ইহাঁকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইত এবং ইহাঁর প্রতি সর্ব্বদা তর্জ্জন গর্জ্জন করিত; কিন্তু ইহাঁর মন তোমাতেই অটল ছিল, এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইহাঁর আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপা। এক্ষণে তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর; আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।" (৬।১১৯)

রামচন্দ্র নিজ অন্তরে সীতার বিশুদ্ধতা জানিতেন; কিন্তু সীতা বহুকাল রাবণগৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার শুদ্ধির আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলেন। রাম যদি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে বিশুদ্ধ না করিয়া লইতেন, তবে লোকে রামকে কামুক ও মূর্খ বলিত। এক্ষণে সকলের সহিত রাম জানিলেন যে, সীতার হৃদয় অনন্যপরায়ণ, চরিত্রদোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি স্বীয় পাতিব্রত্যতেজে রক্ষিত ছিলেন। তিনি প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রাবণের অস্পৃশ্যা ছিলেন। প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে অবিচ্ছিন্ন, সেইরূপ সীতাও রাম হইতে

ভিন্ন নহেন। পরগৃহবাস নিবন্ধন রাম তাঁহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মহাবল বিজয়ী রামচন্দ্র সীতাদেবীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; অমনই আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন শচী যেরূপ ইন্দ্রের নিকট সুশোভিত হন, সেইরূপ তেজঃপ্রদীপ্তা জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবীও রামের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিষ্পাপা ও শুদ্ধচারিণী জানিয়া গ্রহণ করিলে, সকলে এক মহান্ আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। জানকী বহুপ্রকার বিঘ্নবিপত্তির পর দেবকল্প স্বামীর পবিত্র চরণ-তলে স্থান পাইয়া হর্ষভরে কিয়ংক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইলেন এবং নিজের প্রতি প্রিয়তমের অপ্রত্যাশিত কঠোর ব্যবহারসকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সুদীর্ঘকালব্যাপী কষ্টময় অসহ্য বিচ্ছেদের অবসানে দম্পতিযুগল পরস্পরে মিলিত হইয়া নয়নজলে সমস্ত দুঃখজ্বালা নির্ব্বাপিত করিলেন এবং বিমল শান্তিসুখের অধিকারী হইয়া জীবন যেন সার্থক করিলেন। শোককৃশা, চিন্তামলিনা, তাপসব্রতধারিণী জানকীর স্নেহময় পবিত্র চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া রামের প্রেমপূর্ণ হৃদয় উচ্ছ্বাসময় সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। কিয়দ্দিনের জন্য উভয়ের জীবনাকাশে যে বিষাদমেঘ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সহসা তাহা অন্তর্হিত হইলে আবার এক অভিনব পুণ্যজ্যোতিঃ তাঁহাদের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রামচন্দ্র আবার সেই বনচারী, ধনুর্ব্বাণধারী, আনন্দময় জানকীবল্লভের ন্যায় এবং সীতাদেবীও সেই প্রফুল্লতাময়ী, অরণ্যচারিণী বনদেবী রাঘবপত্নীর ন্যায় পরি-লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহারা জীবনে কখন ক্ষণকালের জন্যও বিচ্ছেদযন্ত্রণা অনুভব করেন নাই, যেন সীতাহরণ রাবণবধ প্রভৃতি কার্য্যসকল তাঁহাদের নিকট অবাস্তব ঘটনা এবং স্বপ্নবৎ অস্পষ্ট ও অলীক।

ফলতঃ তৎকালে উভয়েই হর্ষোল্লাসে নির্ম্মল গগনবিহারী পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সুতরাং তিনি, অনুজ লক্ষ্মণ দেবী জানকী ও মিত্রগণের সহিত, অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইতে সমুৎসুক হইলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ অনতিবিলম্বে দেবদুর্লভ পুষ্পকরথ সুসজ্জিত করাইয়া তৎসমীপে তাহা আনয়ন করিলেন। রামচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে বহুসম্মানযোগ্যা সীতাদেবী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলে, সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণাদি রাক্ষসগণও তন্মধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিলেন। সকলে আরূঢ় হইলে, রামের আজ্ঞামাত্র সেই সুবৃহৎ পুষ্পকরথ কিঙ্কিনীজাল আলোড়ন পূর্ব্বক মহানাদে গগনমার্গে উত্থিত হইল। রামচন্দ্র প্রিয়তমা জানকীর সহিত এক নিভৃত কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রণয়িনীকে ধরণীর বিচিত্র দৃশ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নিম্নে যুদ্ধস্থল; সেই যুদ্ধস্থলের যে যে অংশে প্রধান প্রধান ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছিল, রাম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিমান সমুদ্রের উপরিভাগে উপস্থিত হইল। দিগন্তপ্রসারী মহাসমুদ্র বায়ুবেগে সংক্ষুভিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রকাণ্ড সেতু লম্বমান থাকিয়া, গগনমণ্ডলে ছায়াপথের ন্যায়, পরিশোভিত হইতেছিল। সীতাদেবী বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে মহাসাগরের ভীষণ ভাব ও সেই বিচিত্র সেতু দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সাগর অতিক্রান্ত হইলে, অস্পষ্টনীলিমাযুক্ত পূগমালাশোভিত

সুদৃশ্য বেলাভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। সীতাদেবী সমুদ্রবক্ষ হইতে তীরভূমির অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। বিমান বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া কিষ্কিন্ধাভিমুখে প্রধাবিত হইল। রামচন্দ্র প্রিয়তমা জানকীকে কত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতেছেন, ইত্যবসরে পুষ্পক কিষ্কিন্ধা রাজ্যে উপস্থিত হইল। তারা ও রুমা প্রভৃতি বানর রমণী-গণের সহিত সীতার পরিচয় হইল; সীতাদেবী তাঁহাদিগকে সেই পুষ্পকরথেই অযোধ্যায় লইয়া যাইতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাঁহারাও তৎসমভিব্যাহারে গমন করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর বিমান কিষ্কিন্ধা পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র প্রিয়তমাকে ঋষ্যমূখ পর্ব্বত, মনোহর পম্পাসরোবর প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশ সকল দেখাইয়া সেই সেই স্থলে তৎবিরহে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পূজ্যস্বভাবা শবরীর আশ্রম, কবন্ধের বধস্থল, স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী, পঞ্চবটীবনে তাঁহাদের পূর্ব্ব আশ্রমপদ, রমণীয় পর্ণশালা, কিঙ্কিনীশব্দে চকিত মৃগদল, অগস্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গাশ্রম, সুতীক্ষ্ণাশ্রম, মহর্ষি অত্রির আশ্রম ও চিত্রকূট পর্ব্বত প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে সীতাদেবী মনোমধ্যে অপূর্ব্ব ভাবসকল অনুভব করিতে লাগিলেন। দূর হইতে অক্ষয় বট, চিত্রকাননা যমুনা ও পুণ্যসলিলা জাহ্নবী দর্শন পূর্ব্বক সীতা-দেবী তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। বিমান অনতি-বিলম্বে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইল। রামলক্ষ্মণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার

নিকট অযোধ্যার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন। হনূমান্ রামের আদেশে অগ্রসর হইয়া নন্দিগ্রামে ভরতকে সকলের আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। তাপসবেশধারী ভ্রাতৃবৎসল মহাবীর ভরত অগ্রজের আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ অমাত্যবর্গ ও পুরবাসিগণের সহিত মহোল্লাসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রামসন্দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া কেহ যানে, কেহ বাহনে এবং কেহ বা পদব্রজেই ধাববান হইল। তাহাদের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। রাম প্রীতমনে প্রজাপুঞ্জকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ভরতকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র পুষ্পকরথকে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিলেন। ভরত স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দ্বারা অগ্রজের পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর তিনি সীতাদেবীকে অভিবাদন করিয়া সুগ্রীব হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণকে ও রাক্ষসরাজ বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। রামচন্দ্র বহুকালের পর কুমার ভরতকে অবলোকন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর শত্রুঘ্ন রামলক্ষ্মণকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া সীতাদেবীর পাদবন্দন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শোককৃশা বিবর্ণা জননী কৌশল্যাদেবীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষ বর্দ্ধন ও চরণ বন্দন করিলেন, পরে সুমিত্রা কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে

অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগতপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন "আর্য্য, আপনি যে রাজ্য আমার হস্তে ন্যাসস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় পুনরাগত দেখিতেছি, তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষাকার, গৃহ, সৈন্য, সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি।" (৬৷১২৮)

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সুগ্রীব, হনূমান্, বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। রাম প্রিয়তমা জানকীকে এক মণিমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার উপহার দিলেন; দেবী জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার উন্মোচন করিয়া পূর্ব্বোপকার স্মরণপূর্ব্বক স্বামীর সম্মতিক্রমে হনূমানকেই তাহা প্রদান করিলেন। মহাবীর হনূমান্ সীতাদেবীর এই প্রীতিদানে সম্মানিত হইয়া হর্ষে আপ্লুত হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব ইহাঁরা রামচন্দ্রের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অযোধ্যানগরী অভিষেকোৎসবে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাম রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, সকলে আপনাদিগকে সনাথ মনে করিল। কিয়দ্দিন পরে সুগ্রীবাদি বানরগণ ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ অমাত্য-

গণের সহিত রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র হৃষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মহামতি লক্ষ্মণ অগ্রজের নিয়োগে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন সুশীল ভরতই উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ধর্ম্মবৎসল রাম্ অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্য সুশৃঙ্খলে শাসিত হইতে লাগিল এবং প্রজাবর্গ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তিনি অনেক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং লোকসাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রাণপণে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, অনেকানেক ঋষি তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত নানাদিগ্দেশ হইতে তদীয় রাজসভায় সমাগত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদের যথাবিধি পূজার্চ্চনা করিয়া বিমল প্রীতিলাভ করিলেন। মহর্ষিগণ রাবণ-কুম্ভকর্ণাদি দুরন্ত রাক্ষসগণের, বিশেষতঃ ইন্দ্রজিতের বধের নিমিত্ত তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রাজসভা মধ্যে সমাসীন ঋষিগণের মুখে রাবণাদি রাক্ষসগণের অপূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত ও পৌরুষপরাক্রমের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। রাবণ প্রভৃতির জন্ম, তপস্যা ও দিগ্বিজয় সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্যই শেষ হইলে, মহর্ষিগণ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর মহারাজ রামচন্দ্র, রাজর্ষি জনক, বয়স্য কাশীরাজ, মাতুল যুধাজিৎ প্রভৃতি রাজগণকে যথোচিত সম্মানিত করিয়া

বিদায় দিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং প্রজাগণের সর্ব্ববিধ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া প্রফুল্লমনে অশোক কাননে প্রবেশ করিলেন। অশোক বন মনোহর রাজোদ্যান ; উহা নানাবিধ সুন্দর বৃক্ষ ও পুষ্পিত লতায় সমাকীর্ণ। নানাস্থানে সুগন্ধি পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত ও বৃক্ষসকল রসালফলভরে অবনত। কোথাও অপূর্ব্ব লতাগৃহ, কোথাও তৃণাচ্ছাদিত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, কোথাও বা হংসসারসনিনাদিত কমলশোভিত স্বচ্ছ সরোবর এবং কোথাও বা সুন্দর পুষ্পবাটিকা। রামচন্দ্র রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া সীতাদেবীর সহিত এই মনোরম অশোক-কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সীতাদেবী এখন রাজমহিষী। সীতা ইতঃপূর্ব্বে রত্নৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত অরণ্যে গমন করিতে অণুমাত্রও অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন নাই। আমরা দেখিয়াছি তিনি স্বামি-সহবাসে গভীর অরণ্যকেও কেমন মনোহর রাজোদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন। সীতাদেবী রাজকন্যা, রাজবধূ ও অতিশয় সুকুমারী হইয়াও অরণ্যের কষ্টে একটী দিনও সামান্য কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। স্বামিসহবাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অলৌকিক অনুরাগ, এই দুইটি কারণেই তিনি দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা জানিতে সমর্থ হয় নাই। সীতা যেরূপ সুখে রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন, অরণ্যেও সেইরূপ সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন। কেবল রাক্ষসগৃহেই তাঁহাকে যাহা কিছু নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল মাত্র। যাহা হউক, সীতাদেবী এতদিনে রাজ-

মহিষী হইলেন। সীতার কেহ সপত্নী নাই; রামচন্দ্র কখন কোনও নারীর প্রতি ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না; তিনি যেরূপ জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ, সেইরূপ পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরাগবান্। তিনি সীতাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসেন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অবলোকন করেন। রাজমহিষী সীতাদেবী আজ যথার্থই সৌভাগ্যশালিনী। আজ স্বামীর সহিত তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী; ভ্রাতৃগণ, অমাত্যগণ, ও কত শত রাজা রামের অনুগত; রাম নিজ প্রতাপে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন; তাঁহার গৌরবের সীমা নাই; সীতাদেবীও আজ সেই গৌরবে গৌরবান্বিতা; কিন্তু তিনি রাজমহিষীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কি কিছুমাত্রও অহঙ্কৃত হইয়াছেন? সীতার জীবনে কি কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে? সীতার বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনেতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সমর্থ। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সীতার জীবনে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাজপুত্রবধূ জানকী যেরূপ বিনীত ও শ্বশ্রূগণের সেবাপরায়ণ ছিলেন, রাজমহিষী সীতাদেবীও আজ তদ্রূপই বিনম্র, নিরহঙ্কার ও গুরুজনের শুশ্রূষণে নিরত। সীতাদেবী পূর্ব্বাহ্নে দেবপূজা সমাপন করিয়া নির্ব্বিশেষে শ্বশ্রূগণের সেবা করিতেন। তিনি রাজমহিষী, সুতরাং এক্ষণে রাজসংসারের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী। একটী সুবৃহৎ রাজসংসারকে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করিতে হইলে, যে যে গুণের প্রয়োজন হয়, সীতাদেবীতে তৎসমুদয়ই বিদ্যমান ছিল। তিনি সকলেরই সুখ ও মঙ্গলচিন্তা

করিতেন; সামান্যা পরিচারিকাও তৎকর্তৃক উপেক্ষিত হইত না। সীতা রাজমহিষী বলিয়া কখনও অহঙ্কৃত হন নাই; তবে ইহা সত্য বটে যে, তিনি স্বামীর সৌভাগ্যে আপনাকে সৌভাগ্যবতী, তাঁহার যশে আপনাকে যশস্বিনী, এবং তাঁহার গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। ভর্ত্তা গুরু রাজ্যভার বহন করিতেছেন, যাহাতে তিনি আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মসকল সুচারুরূপে পালন করিতে সমর্থ হন, সীতা তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই যত্নবতী ছিলেন। রামচন্দ্র পূর্ব্বাহ্নে সমস্ত রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া দিবসের শেষার্দ্ধ অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন। সীতাদেবী বহুমূল্য বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া প্রীতমনে স্বামীর সহিত মিলিত হইতেন এবং নানাবিধ আনন্দপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। এক দিন রামচন্দ্র আনন্দিত মনে সীতার পাণ্ডুরবর্ণ সুশ্রী মুখমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে সহসা তাঁহাকে প্রজাবতী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন রামের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি লজ্জাবনতমুখী প্রিয়তমা দয়িতাকে একান্ত অনুরাগভরে অঙ্কে আরোপণ করিয়া দোহদপ্রশ্ন করিলেন "প্রিয়ে, দেখিতেছি তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত; এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি, বল। আমি তোমার কি প্রিয়সাধন করিব?" দেবী জানকী ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "নাথ, এক্ষণে পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। যে সকল ফলমূলাশী তেজস্বী ঋষি জাহ্নবীতটে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিকট একবার গমন করিব। আমি

অন্ততঃ এক রাত্রি তাঁহাদের তপোবনে গিয়া বাস করিব, এই আমার মনোগত ইচ্ছা।" (৭।৪২)

পাঠকপাঠিকাবর্গ একবার সীতাদেবীর আশ্রমদর্শনলালসার প্রতি মনোনিবেশ করুন। স্বামীর সহিত প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনবাস, অসংখ্য আশ্রমপর্য্যটন এবং ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নীগণের সহিত বাস ও বিচরণ করিয়াও যেন জানকীদেবী হৃদয়মধ্যে কিছু-মাত্র পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই! তিনি রাজসংসারের সুখভোগের মধ্যেও আশ্রমশোভার স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং উপাদেয় রাজভোগ্য খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অনিচ্ছা প্রদর্শন পূর্ব্বক ঋষিজনপ্রিয় সেই ফল মূল ও নীবারতণ্ডুলের দিকেই সমাকৃষ্ট হইতেছেন! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা সীতাচরিত্রের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব; কিন্তু, হায়, এতদ্দ্বারাই মন্দভাগিনীর সর্ব্বনাশসাধনের উপক্রম হইল।

মহারাজ রামচন্দ্র প্রিয়তমার এই সরল আগ্রহময় প্রার্থনা শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং পরদিনই সীতা তপোবন যাত্রা করিবেন, এই কথা বলিয়া হৃষ্টমনে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মহারাজ রামচন্দ্র অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে লোকে পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিল। তিনি সত্যপ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহার চরিত্র জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র অকলঙ্ক পুষ্পের ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল। যে সব গুণ থাকিলে লোকের অতিশয় প্রিয়ভাজন হওয়া যায়, সেই সমস্ত গুণই রামের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান ও দেবতার ন্যায় পূজা করিত। রামচন্দ্র সর্ব্বদা তাহাদের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্ম ও যশ উপার্জ্জন করিতেন। রাম শুদ্ধস্বভাব ও ন্যায়বান্ হইলেও, একটী বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ দৌর্ব্বল্য ছিল। লোকরঞ্জনপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রবলা ছিল। রামচন্দ্র তেজস্বী পুরুষ, তাঁহার বাহুবল অপরিমেয়; তিনি ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না এবং নিজ রাজত্বকালে অনেক দেশও জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন; সুতরাং প্রজাসাধারণ হইতে তাঁহার কোন ভয়সম্ভাবনা ছিল না। যেখানে কোন ভয়সম্ভাবনা নাই, সেখানে প্রজাপীড়ক রাজগণ ইচ্ছা করিলে যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন এবং নানাপ্রকার অত্যাচারেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু রামচন্দ্র সেরূপ প্রকৃতির রাজা ছিলেন না; তিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের ধর্ম্মার্থকামসঞ্চয়ে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন। রাম আপনাকে কেবল রাজ্যেরই অধীশ্বর মনে করিতেন না; তিনি

ধর্ম্মেরও রক্ষক ছিলেন। রাজার দৃষ্টান্তই সাধারণে অনুসরণ করিয়া থাকে, এই জন্য রাম স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন এবং রাজপরিবারবর্গেরও শুদ্ধাচারিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিতেন। রাজচরিত্রে কোন অপবাদের আশঙ্কা দেখিলে তিনি অতিশয় শঙ্কিত হইতেন, যেহেতু তদ্দ্বারা সংসারে ধর্ম্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইলেও হইতে পারে। রামচন্দ্রের ঈদৃশী ধর্ম্মভীরুতা কখনই দূষণীয় নহে, বরং অতিশয় প্রশংসার্হই বটে। কিন্তু ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিতে হইলে, সত্যকেও জয়যুক্ত করিতে হয়। মিথ্যা অপবাদের ভয়ে সত্য ও অভ্রান্ত বিশ্বাসের মস্তকে পদার্পণ করা কত দূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা সকলের বিচার্য্য বিষয়। লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তির অনুরোধে রামচন্দ্রের ন্যায় সত্যব্রত রাজা যদি নিজ হৃদ্গত সত্য বিশ্বাসকে পরিহার করিয়া কোন গুরুতর অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে তাহা যে তাঁহার প্রকৃতিগত বিশেষ দৌর্ব্বল্যপ্রসূত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সত্য বটে, কোন মহদুদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্তই তিনি সেই দৌর্ব্বল্যকে প্রশ্রয় দিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহা যে দৌর্ব্বল্য, তদ্বিষয়ে কাহারও অন্য মত না থাকাই উচিত। মহারাজ রামচন্দ্র সেই দৌর্ব্বল্যের বশবর্ত্তী হইয়াই একটি গুরুতর অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিলেন!

অন্তর্ব্বত্নী সীতাদেবী ভর্ত্তার নিকট আশ্রমবাসরূপ অভিলষিত প্রার্থনা করিলে, রামচন্দ্র আহ্লাদসহকারে তাহা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর ভদ্রনামা একব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি

অবগত হইলেন যে, প্রজাগণ রামচন্দ্রের বাহুবল, রাবণ-বধরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য, স্ববীর্য্যে সীতাসমুদ্ধার, অলৌকিক ধর্ম্মপরায়ণতা এবং অত্যুৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালীসম্বন্ধে অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকে; কিন্তু তিনি যে রাবণাপহৃতা পরগৃহবাসিনী সীতাকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন, এই কারণে নানাপ্রকার জল্পনা করে। তাহারা রামকর্ত্তৃক সীতার পুনর্গ্রহণসম্বন্ধে পরস্পরে এই রূপ কথোপকথন করিয়া থাকে "জানি না, রামের হৃদয়ে সীতাসহবাসেচ্ছা কিরূপ প্রবল। রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোককাননে রক্ষা করে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূত ছিলেন; জানি না, রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখি-লেন না! রাজার যেরূপ আচরণ, প্রজারাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে; অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে, আমরাও সহিয়া থাকিব।" (৭।৪৩)

রামের মস্তকে সহসা অশনিপাত হইল। সীতাসম্বন্ধে লোকের এইরূপ বিশ্বাস দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তিনি সুহৃদ্গণকে বিসর্জ্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ ভরত ও লক্ষ্মণকে সমীপে আনয়ন করিতে ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন। রাম আপনাকে অতিশয় মন্দভাগ্য মনে করিয়া অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধস্বভাবা জানকীর পবিত্র চরিত্র তিনি অবগত আছেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধি প্রজাগণ তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপণ করিতেছে। হায়, এ কলঙ্ক ক্ষালিত হইবে কিরূপে? রামের চক্ষে সমগ্র সংসার অন্ধকারময় বোধ হইল। ইহজীবনে রামের আর সুখ

নাই। রামচন্দ্র কুক্ষণেই প্রজাপালনরূপ কঠোর ব্রত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যথাযোগ্যরূপে প্রজা-পালন করিতে হইলে, পতিপ্রাণা নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন আর কি উপায় বিদ্যমান আছে? কিন্তু রাম কোন্ প্রাণেই বা শুদ্ধচারিণী পত্যনুরাগিণী সাধ্বী সীতাকে বিসর্জ্জন করিবেন? রাম যে সেই স্নেহের প্রতিমা প্রিয়তমা জানকীকে নির্ব্বাসিত করিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিবেন না! হায়, রামের মৃত্যু হইল না কেন? জানকীরে বিসর্জ্জন করিয়া রাম কোন্ মুখে রাজর্ষি জনকের সহিত বাক্যালাপ করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাম সীতাশোকে বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভরত ও লক্ষ্মণ দূর হইতে মহারাজের এই আকস্মিক মনোভাব অবলোকন করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং একান্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে দেখি-য়াই অধিকতর প্রবলবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে, তিনি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া লাতৃদ্বয়ের নিকট সীতার অপবাদসংক্রান্ত সমস্ত কথাই বিবৃত করিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ, তুমি ত জানই, রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। তখন আমার মনে হইয়াছিল, সীতা বহুদিন লঙ্কায় ছিলেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করি? পরে সীতা আমার প্রত্যয়ের জন্য তোমার ও দেবগণের সমক্ষে অগ্নি-

প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই অবসরে, দেবতাগণ ঋষিগণের সমক্ষে বলিলেন, সীতা নিষ্পাপা। আমার অন্তরাত্মাও জানিত, সীতা সচ্চরিত্রা। তৎপরে আমি তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই অপবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" (৭।৪৫) রামের নয়নযুগল বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই অকীর্ত্তির জন্য তাঁহার মনে যে দারুণ সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন "সীতার কথা কি, আমি অপবাদের ভয়ে নিজের প্রাণ এবং তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীর্ত্তি-জনিত শোকসাগরে নিপতিত হইয়াছি; আমি জীবনে ইহা অপেক্ষা তীব্রতর যন্ত্রণা আর কখনও ভোগ করি নাই। অতএব, ভাই, তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া অন্যদেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পর-পারে তমসাতীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে; তথায় কোনও নির্জ্জন স্থানে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার আদেশ পালন কর; তুমি জানকীর জন্য আমায় কোনও অনুরোধ করিও না, তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অতিশয় বিরক্ত হইব। এক্ষণে যাও, ভালমন্দ বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি তোমরা আমার মতস্থ হও, তবে আমার সম্মান রক্ষা কর এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। পূর্ব্বে সীতা গঙ্গাতীরে আশ্রমসকল দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ কর।" (৭।৪৫)

এই বলিয়া রাম অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে স্বগৃহে

প্রবেশ করিলেন, ভ্রাতৃগণও শোকাকুলচিত্তে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দুঃখিত লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রথে সীতার বহনোপযোগী অশ্ব-সকল যোজিত এবং উপবেশনার্থ তদুপরি এক সুকোমল আসন প্রস্তুত হইল। সীতাদেবী নিশ্চিন্তমনে গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিনীত-বচনে কহিলেন "দেবি, মহারাজ তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে, তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আদেশ করিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে শীঘ্রই ঋষিসেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব।" সীতা-দেবী ভর্ত্তার ঈদৃশ অনুগ্রহদর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রফুল্লহৃদয়ে মহামূল্য বস্ত্র ও নানারূপ রত্ন লইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "বৎস, এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব।" লক্ষ্মণ প্রকাশ্যে তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন বটে, কিন্তু সেই সরলহৃদয়ার অবশ্যম্ভাবিনী দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। যাহা হউক, তিনি সংযতচিত্ত হইয়া পূজ্যস্বভাবা জানকীর সহিত রথে আরোহণ করিলেন। সীতাদেবী নগরীর বহির্ভাগে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, কুসুমিত বৃক্ষলতা, বন উপবন, উদ্যান সরোবর প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া পুলকিত, এবং প্রিয়তম প্রাণ-নাথের অপার স্নেহ ও করুণার কথা চিন্তা করিয়া হৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সহসা সীতার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত এবং সর্ব্বাঙ্গ

কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষে জগৎসংসার যেন অন্ধকারময় বোধ হইল। তাঁহার মন কি কারণে যে এত উদ্বিগ্ন হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ্মণের মুখপানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা জানকী আর্য্য-পুত্রের কোনরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কহিলেন "বৎস, আমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতেছে; আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি; তোমার ভ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন? শ্বশ্রূগণের ত মঙ্গল? গ্রাম ও নগরবাসিগণের ত কোন বিপদ ঘটে নাই?" লক্ষ্মণ জানকীর উৎকণ্ঠাদর্শনে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু জানকী উদ্বিগ্নমনে কৃতাঞ্জলিপুটে উদ্দেশে দেবতাগণের নিকট সকলের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক পর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে জাহ্নবীতটে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে জাহ্নবীকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন; লক্ষ্মণের সংযত শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; তিনি আর কোন ক্রমেই নিজ মনোভাব গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। সরলস্বভাবা সীতা দেবরকে রোদন করিতে দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং কোনও গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। সীতা নির্ব্বান্ধাতিশয় সহকারে লক্ষ্মণকে বারম্বার রোদনকারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর পাইলেন না। তখন তিনি বলিলেন "বৎস, এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গাপার কর এবং তাপস-

গণকে দেখাইয়া দাও; আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রলঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব। দেখ, আমারও সেই পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে।" (৭।৪৬)

লক্ষ্মণ অশ্রুপূর্ণলোচনে নাবিকসহিত এক নৌকা আনয়ন করিয়া দেবী জানকীর সহিত তৎসাহায্যে গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইলেন। সীতাদেবী নৌকা হইতে অবতরণ করিবামাত্র লক্ষ্মণ আর কোনমতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে জানকীর পাদমূলে নিপতিত হইলেন এবং "দেবি, ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন? তুমি আমাকে ক্ষমা কর; এই লোকবিগর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আমার উচিত নহে; তুমি আমার অপরাধ লইও না" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া সীতা অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তিনি বলিলেন "বৎস, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সমস্তই প্রকাশ করিয়া বল। মহারাজ ত কুশলে আছেন? তিনি কি আমাকে কোন অপ্রিয় কথা শুনাইতে তোমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন? তুমি আর বিলম্ব করিও না; সমস্তই বল। নানারূপ উৎকণ্ঠায় আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে।"

তখন লক্ষ্মণ বহুচেষ্টার পর বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কহিলেন "দেবি, মহারাজ লোকমুখে তোমার রাক্ষসগৃহবাসনিবন্ধন দারুণ অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছেন, এবং তোমাকে গঙ্গাতীরস্থ

এই আশ্রমসন্নিধানে পরিত্যাগ করিতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। তুমি আমার সমক্ষে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে; তথাপি মহারাজ কলঙ্কভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে কোনও দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা মনে করিও না। দেবি, অদূরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম; মহর্ষি আমার পিতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু; তুমি তাঁহারই চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া বাস কর। মহারাজ আমাকেই এই নিষ্ঠুর আদেশপালনে নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে আমাকে আজ আর এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইত না। আর্য্যে, আমি অগ্রজের বশবর্ত্তী, আমার অপরাধ লইও না।" লক্ষ্মণ এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ়ার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া জলভারাকুললোচনে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন "লক্ষ্মণ, বিধাতা আমাকে দুঃখভোগের নিমিত্তই সৃষ্ট করিয়াছেন। আমি কেবল দুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। অথবা বিধাতারই বা দোষ কি? আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম, অনেক পতিব্রতা কামিনীকে পতিবিয়োগ-দুঃখ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আজ শুদ্ধচারিণী ও পতিব্রতা হইয়াও স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম। হায়, পূর্ব্বে আমি রামের পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে বাস করিব? দুঃখ উপস্থিত হইলে, আর

কাহার নিকটেই বা দুঃখের কথা কহিব? মুনিগণ আমাকে পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহাদিগকে কিই বা উত্তর প্রদান করিব? তাঁহারা আমাকে কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী মনে করিবেন, সন্দেহ নাই! হায়, আমার গর্ভে রামের বংশধর সন্তান রহিয়াছে; আজ তাহার বিনষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা না থাকিলে, আমি তোমারই সমক্ষে এই ঘৃণিত পাপজীবন বিসর্জ্জন করিতাম। লক্ষ্মণ, তোমার আর অপরাধ কি? তুমি অগ্রজের আদেশ পালন করিয়াছ; তুমি এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর। তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবে; পরে, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিবে 'আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী, তাহা তুমি অবশ্যই জান। আর তুমি যে কেবল লোকনিন্দাভয়ে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাও আমি জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' লক্ষ্মণ, তুমি সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে আরও বলিবে 'তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তিলাভ হইবে। মহারাজ, আমার প্রাণ যদি যায়, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ রটিয়াছে, যাহাতে তাহার ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই করিবে। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা,

পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য।' লক্ষ্মণ, আমি এজন্মে স্বামীর সহবাসসুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না বটে, কিন্তু পরজন্মে যাহাতে রামই আমার স্বামী হন এবং তাঁহার সহিত আর কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে, আমি তজ্জন্য অতঃপর কঠোর তপস্যা করিব। বৎস, রামের নিকট আমার ইহাই বক্তব্য। তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এই সমস্ত কথা বলিও।" (৭।৪৮) সীতা এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন "বৎস, আমি গর্ভিনী হইয়াছি; আজ তুমি আমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ দেখিয়া যাও।"

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। শোকে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন "দেবি, তুমি আমায় কি বলিলে! আমি যে ইহজন্মে কখনও তোমার রূপ দেখি নাই! প্রণামপ্রসঙ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রামবিরহিত, সুতরাং এই বনে আমি তোমায় কিরূপে দর্শন করিব!" (৭।৪৮)

এই বলিয়া লক্ষ্মণ জানকীকে প্রণাম করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকা গঙ্গার অপর তটে সংলগ্ন হইল। যতক্ষণ সীতাদেবী দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ তাঁহার দিকে সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইবামাত্র জানকী

হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদন-ধ্বনিতে বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইল; মৃগসকল দর্ভাঙ্কুরভক্ষণে বিরত হইয়া তাঁহার দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া রহিল। ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিল এবং বনস্থলী এক ভীষণ আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

কতিপয় ঋষিকুমার বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সীতার রোদনশব্দের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল এবং রোরুদ্যমানা জানকীকে কোন দেবকন্যা মনে করিয়া বাল্মীকির নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত গোচর করিল। মহর্ষি ধ্যানস্থ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং ত্বরিতপদে অনাথিনী সীতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বাল্মীকি সীতাদেবীকে দেখিয়াই সুমধুর বাক্যে কহিলেন "বৎসে, তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা; তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? তুমি যে আসিতেছ, আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসিবার কারণও আমি জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা, তাহাও আমি জানি। তুমি যে নিষ্পাপা, আমি তপোবললব্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোনুষ্ঠান করিতেছেন; তাঁহারা কন্যাস্নেহে নিয়ত তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না।" (৭।৪৯)

জানকী মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তিভরে

প্রণাম করিয়া কহিলেন "তপোধন, আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।" এই বলিয়া সীতাদেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি তাপসীগণের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জানকীরে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পূজ্যস্বভাবা তাপসী-গণ রাঘবপত্নীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতীব পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। দেবী জানকী তাঁহাদের সৎকারে প্রীত হইয়া তাপসীবেশে সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশূন্যা হইয়া পৃথিবী যেমন অমানিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, পতি-বিরহে সীতাদেবীও সেইরূপ শোকাচ্ছন্ন হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রামচন্দ্র কেবল লোকাপবাদভয়েই সীতাদেবীকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করেন নাই। রাম প্রিয়তমা জানকীর অলৌকিক গুণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি যে শুদ্ধচারিণী ও পবিত্রস্বভাবা, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। পরস্পরের সম্বর্দ্ধিত অনুরাগে তাঁহারা দুশ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; রাম সীতার পতিপরায়ণতা, সুশীলতা ও সরলতাতে যেরূপ একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সীতাদেবীও স্বামীকে সেইরূপ আপনার একমাত্র দেবতা মনে করিয়া পূজা করিতেন। রাম প্রজারঞ্জনানুরোধে সেই করুণাপাত্রী পতিব্রতা জনকতনয়াকে বিসর্জ্জন করিয়া শোকে বিমূঢ় হইলেন এবং নিজ অদৃষ্টলিপির বহুতর নিন্দা করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্তর্ব্বত্নী, সুকুমারী, পতিপ্রাণা রমণীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়া রাম হৃদয়ে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু শত শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই লোকবিগর্হিত নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য তাঁহার মনে দারুণ সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে কেবল অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত একবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন না। এইরূপে তিন দিন

অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থদিনে লক্ষ্মণ শূন্য রথ লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাম লক্ষ্মণের মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; তৎকালে কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্রজকে এইরূপ কাতর দেখিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন "প্রভো যে প্রজাপালনানুরোধে আপনি এই অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, এক্ষণে সেই রাজধর্ম্মে মনোনিবেশ করুন। স্ত্রীপুত্রপরিবার সমস্তই অনিত্য; ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং আপনি শোক পরিহার করুন। আপনার ন্যায় সৎপুরুষেরা এইরূপ বিষয়ে কদাচ বিমোহিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আর্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তজ্জন্য শোকাকুল হইলে সেই অপবাদই আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে; সুতরাং আপনি ধৈর্য্যবলে এই দুর্ব্বল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন; আর সন্তপ্ত হইবেন না।"

মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রাজকার্য্যে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিলেন। তিনি নানা প্রকার হিতকর কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু জানকীর সরল পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার অন্তর হইতে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অন্তর্হিত হইল না! তিনি সীতাবিরহে প্রভাতকালীন শশাঙ্কের ন্যায় অতিশয় নিষ্প্রভ হইলেন, এবং আর কোন প্রকারেই হৃদয়ে প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। রামের জীবন যেন অতিশয় দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল। রাম জনকতনয়ার অলৌকিক গুণাবলি যতই স্মরণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল।

যাহাহউক, এক প্রজাপালন ব্যতীত রামচন্দ্রের ইহসংসারে স্থিতি করিবার আর কোনই বন্ধন রহিল না। তিনি আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া এখন কেবল রাজ্যশাসনেই চিত্তনিয়োগ করিলেন। রামচন্দ্রের সুশাসনগুণে রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। লোকে সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইল; কেহই উচ্ছৃ-ঙ্খল হইল না। তাঁহার প্রতাপে শত্রুবর্গ উচ্ছিন্ন এবং মিত্রদল পরিপুষ্ট হইল। কেহই অকালমৃত্যুমুখে পতিত হইল না, এবং সর্ব্বত্রই সুখ ও শান্তি বিরাজিত হইল। রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া আর ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিবার কোন চিন্তাও করি-লেন না। তিনি জনকতনয়ার অসামান্য পাতিব্রত্যগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার কনকময়ী প্রতিমূর্ত্তির সহিত যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেন। অভাগিনী জানকী তাঁহার প্রতি প্রিয়তমের ঈদৃশ অনুরাগের কথা শ্রবণ করিয়া সেই তাপসীগণের আশ্রমে বিরলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

এইরূপে জানকী নীহারক্লিষ্ট কমলের ন্যায়, অস্ফুট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধূলিধূসরিত কনকরেখার ন্যায়, কুজ্ঝটিসমাচ্ছন্ন প্রভাতের ন্যায়, এবং মেঘজালজড়িত শ্যামায়মান জ্যোৎস্নার ন্যায় যারপরনাই শোচনীয় হইয়া সেই আশ্রমেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি মনোমধ্যে নিয়তই রামের অনুধ্যান করিতেন; রামই তাঁহার ধ্যান, রামই তাঁহার জ্ঞান, রামই তাঁহার চিন্তা; রামচিন্তা ব্যতীত তিনি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে সমর্থ নহেন। পতি তাঁহাকে লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তজ্জন্য সীতা কিছুমাত্রও দুঃখিত নহেন; সীতা যে জীবনে এতকষ্ট পাইতেছেন, তাহা তিনি

তাঁহার জন্মান্তরপাতকের ফলভোগ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। পতিই তাঁহার দেবতা; সীতা হৃদয়ের সেই আরাধ্য দেবতাকে আপনার মুক্তির একমাত্র কারণ মনে করিতেন, এবং হৃদয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন।

সীতাদেবী রামকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইবার সময় অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রমে দশমাস পরিপূর্ণ হইল। যথাসময়ে তিনি দেবকুমারকল্প যমলপুত্র প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই আনন্দসমাচার অবগত হইয়া যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন। সেই দিন কুমার শত্রুঘ্ন লবণনামা এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের বধোদ্দেশে সসৈন্যে গমন করিতে করিতে বাল্মীকির আশ্রমে নিশা-যাপন করিতেছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের কুমারদ্বয়ের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হর্ষোল্লাসে নিমগ্ন হইলেন। যে বালক অগ্রে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, বাল্মীকির আদেশে বৃদ্ধারা তাহার দেহ কুশের অগ্রভাগদ্বারা মার্জ্জিত করিলেন; এই নিমিত্ত তাহার নাম কুশ হইল। কনিষ্ঠের দেহ কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগদ্বারা মার্জ্জিত হইল, এই নিমিত্ত বাল্মীকি তাহার নাম লব রাখিলেন। সীতাদেবী পরম সুন্দর পুত্রদ্বয় লাভ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লবকুশ ঋষিপত্নীগণের যত্নে দিন দিন পরি-বর্দ্ধিত হইয়া সীতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সংস্কার সুসম্পন্ন করিলেন। কুমারেরা বয়োবৃদ্ধিসহকারে বালক-রামের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা আকার প্রকার ও অঙ্গসৌষ্ঠবে সর্ব্বাংশে রামেরই অনুরূপ হইলেন। তাঁহারা তাপসকুমারের ন্যায় বেশভূষা করিতেন

বটে, কিন্তু বাল্মীকি তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র সীতাসমুদ্ধার করিয়া অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, একদা মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অবগত হইয়াছিলেন যে, মহাত্মা রামই জগতে প্রধান পুরুষ ও সর্ব্বগুণোপেত রাজা। দেবর্ষির উপদেশানুসারে বাল্মীকি পবিত্র রামচরিত ছন্দোবদ্ধ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন ; এক্ষণে সেই মহাকাব্য সম্পূর্ণ হওয়াতে, তিনি নিজ প্রিয়শিষ্য কুমার লবকুশকে তাহা অভ্যস্ত করাইলেন। একদিন লবকুশ বাল্মীকির আশ্রমে সমবেত ঋষিগণের সমক্ষে রাগ-রাগিণীসহকারে বীণার ন্যায় মধুর রবে রামায়ণ গান করিলেন। ঋষিগণ সেই গান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমোহিত হইলেন। গান শ্রবণ করিতে করিতে কেহ কেহ সহসা উত্থিত হইয়া লবকুশকে এক কলশ প্রদান করিলেন ; কেহ এক বল্কল দিলেন ; কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ কমণ্ডলু, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ আসন, কেহ কৌপীন, কেহ কুঠার এবং কেহ বা কাষ্ঠবন্ধনরজ্জু প্রদান করিলেন। কোন ঋষি কেবলমাত্র "স্বস্তি" ও "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন! সমবেত ঋষিমণ্ডলী মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত সমগ্র রামায়ণ খানি সেই বালকদ্বয়ের অমৃতকণ্ঠে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া এইরূপে আপনাপন হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকটিত করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণের প্রকৃত মূল্য জগতে পাওয়া যায় না। সসাগরা রত্নগর্ভা ধরিত্রীও এই মহাকাব্যের

বিনিময়যোগ্য মূল্য নহে; কেবলমাত্র এই সরল-হৃদয় ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিবর্গের উল্লিখিত আনন্দোচ্ছ্বাসই তাহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া বোধ হয়!

এইরূপে মহর্ষি বাল্মীকির যত্নে লবকুশ পল্লবিত তরুণ বৃক্ষের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলেন। একদিন মহর্ষি বাল্মীকি গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে মহারাজ রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত সুবৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনার্থ সশিষ্যে উপনীত হইতে নিমন্ত্রিত হইলেন। মহর্ষি শিষ্যবর্গের সহিত যথাসময়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাপসবেশধারী কুমার কুশীলবও তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। বাল্মীকি কুমারদ্বয়কে সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন "বৎস, তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্রে, বিপ্রালয়ে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজগণের গৃহে, রাজদ্বারে, যজ্ঞস্থানে এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের সন্নিকটে পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর। যদি মহারাজ রামচন্দ্র গীতশ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া গান করিও। আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি, তদনুসারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোকবহুল বিংশতি সর্গমাত্র গান করিও। ধনতৃষ্ণায় অল্পমাত্রও লুব্ধ হইও না; যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার, ধনে তাহাদের কি হইবে? যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও, আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই তোমাদের সুমধুর বীণা: তোমরা বীণাযোগে তানলয়সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ, রাজা ধর্ম্মানুসারে

সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিবে।"

বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া কুশীলব মুনিবালকের ন্যায় বেশভূষা করিয়া সুমধুর কণ্ঠে বীণাসহযোগে গান আরম্ভ করিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা পবিত্র রামকথা শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইল। তাহারা সেই বালকদ্বয়ের অপূর্ব্ব বেশ ও রামের ন্যায় অলৌকিক রূপ দেখিয়া এবং তাঁহাদের মধুময় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। যেখানে তাঁহারা গান আরম্ভ করিতে লাগিলেন, সেইখানেই সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইল। ঋষি-বর্গ ও অভ্যাগত রাজগণ তাঁহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে এই অপূর্ব্ব মুনি-বালকদ্বয়ের কথা মহারাজ রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আহ্বান করাইয়া তাঁহাদের ও কাব্যপ্রণেতা মহর্ষির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশীলব বাল্মী-কির উপদেশবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করি-লেন। অনন্তর মহারাজের আদেশানুসারে তাঁহারা রামায়ণের আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিলেন। সভাস্থ সকলে নীরব ও উৎকর্ণ হইয়া অমৃতময়ী রামকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সেই বালকদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয় মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সুকুমার দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল দর্শন করিয়া রাম অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পূজ্যস্বভাবা প্রিয়তমা জনকতনয়া সহসা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলেন! তিনি এই বালকদ্বয়কে জান-

কীরই গর্ভজাত পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং সেই অনাথার দুঃখপূর্ণ জীবনের ইতিহাস স্মরণ পূর্ব্বক অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র হৃদয়ের আবেগ নিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই দিন সভাভঙ্গ করিলেন। সভাস্থ সকলেই বালকদ্বয়কে রূপ, আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় রামেরই তুল্য অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

এইরূপে কুশীলব প্রতিদিন রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। মহারাজ রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে অষ্টাদশ সহস্র নিষ্ক প্রদান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু বালকদ্বয় তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন "মহারাজ, আমরা বনবাসী, বন্য ফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকি ; অর্থে আমাদের প্রয়োজন কি?" রাম ইহাতে আরও বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বাল্মীকির শিষ্য বলিয়াই আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু রাম গীতপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে সীতারই গর্ভজাত বলিয়া জানিতে পারিলেন। কৌশল্যা প্রভৃতি বৃদ্ধা মহিষাগণের এবং লক্ষ্মণেরও সেইরূপ অনুমান হইল। তখন রামচন্দ্র কতিপয় দূতকে সভামধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকট গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি মহর্ষির আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। আমার যে কলঙ্ক সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে, জানকী তাহার ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভামধ্যে শপথ করুন। তোমরা এই বিষয়ে মহর্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মশুদ্ধিকল্পে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্ বুঝিয়া শীঘ্র সংবাদ দাও।"

দূতেরা বাল্মীকির নিকট রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, মহর্ষি বলিলেন "দূতগণ, রামের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা করিয়াছেন, জানকী তাহাই করুন।" দূতগণের মুখে মহর্ষি বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম হৃষ্টমনে ঋষিবর্গ ও রাজগণকে পরদিন সভায় সমাগত হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অভ্যাগত রাজগণ নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। সুগ্রীবাদি বানরগণ, বিভীষণাদি রাক্ষসগণ ও জনসাধারণ সকলেই সোৎসুকচিত্তে আগ্রহপূর্ণহৃদয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আজ নির্ব্বাসিতা রাজমহিষী সীতা-দেবী সর্ব্বজনসমক্ষে শপথ করিয়া আত্মশুদ্ধিসম্পাদন করিবেন। মহারাজ রামচন্দ্র লোকাপবাদভয়ে যে রমণীশিরোমণি পতিব্রতা জনকনন্দিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ সকলের সম্মুখে তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়া তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবেন। কেহ সীতাদেবীর অলৌকিক পত্যনুরাগের প্রশংসা করিতেছে, কেহ রামচন্দ্রের প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয়-স্বরূপিনী জান-কীর কনকময়ী প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ করিতেছে, কেহবা মহারাজ রামচন্দ্রের অলোকসাধারণ প্রজারঞ্জনবৃত্তির গৌরবকীর্ত্তন করি-তেছে, এমন সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি তেজঃপ্রদীপ্ত মহর্ষি বাল্মীকি দেবী জানকীর সহিত ধীরে ধীরে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সভা

নীরব ও নিস্তব্ধ; কোথাও শব্দমাত্র শ্রুতিগোচর হইতেছে না! বাল্মীকি অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন; জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে অবনতমুখে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন; তাঁহার পরিধান কাষায় বসন, বেশ তাপসীর ন্যায়। বদনমণ্ডল অলৌকিক পবিত্রতাব্যঞ্জক, যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইতেছে! এই কাষায়বসনা ধ্যানপরায়ণা, আশ্রমবাসিনী, কঠোরব্রতধারিণী স্বপদনিহিতলোচনা জ্যোতির্ম্ময়ী জানকীদেবীকে দেখিবামাত্র সভাস্থ সকলে শোকে দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল। তৎকালে কেহ রামকে, কেহ সীতাকে এবং কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি জানকীকে লইয়া জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন "রাজন্ এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে ইহাঁকে অনুমতি কর, ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত; আমি সত্য কহিতেছি, ইহারা তোমার ঔরস পুত্র। আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, ইহারা তোমারই ঔরসপুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অণুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে আমায় যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি জানকীকে শ্রোত্রাদিপঞ্চেন্দ্রিয় ও মনে শুদ্ধচারিণী বুঝিয়া বন হইতে লইয়া আসি। এক্ষণে এই

পতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। আমি দিব্য জ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধস্বভাবা; তুমি ইহাঁকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছ। "(৭।৯৬)

রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "ভগবন্, আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন, তাহাই হউক। পূর্ব্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। ইনি তথায় শপথ করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি ইহাঁকে গৃহে লইয়াছিলাম; কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহাকে নিষ্পাপা জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র, ইহা আমি জানি। এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।" (৭।৯৭)

এই সময়ে সহসা দিব্যগন্ধ মনোহর বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলেই পুলকিত হইয়া উঠিল। সকলে নীরব ও নিস্পন্দ; এই অবসরে কাষায়বসনা সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন "আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনোমধ্যে স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেই জানি না, যদি এই কথা সত্য

হয়, তবে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।" (৭।৯৭)

সীতার বাক্য অবসান হইতে না হইতেই সহসা পৃথিবী বিদীর্ণ হইল! অকস্মাৎ তন্মধ্য হইতে অলৌকিক জ্যোতিঃরাশি সমুদ্ভূত হইল! নাগসকল এক দিব্য সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়া আছে, তদুপরি জ্যোতির্ম্ময়ী ভগবতী বসুন্ধরাদেবী সমারূঢ়া! দেবী বসুন্ধরা বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়া সেই দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করাইবামাত্র, অমনি তাহা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল! অকস্মাৎ স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইল; দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সমাগত ঋষিবর্গ ও রাজগণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলেন; স্বর্গ মর্ত্ত্য এক তুমুল বিস্ময়কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল! রাম পতিপ্রাণা জানকীর এই বিস্ময়-জনক-অন্তর্দ্ধান দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তিনি শোকে ও অনুতাপে অতিশয় জর্জ্জরিত হইলেন। কুশীলব রোদনশব্দে সেই সভাস্থল পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহাদের কাতরকণ্ঠে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে আমাদের জগৎপূজ্যা সীতাদেবী সুখদুঃখময় বিচিত্র ঘটনাবলির মধ্যে জীবন যাপন ও ইহসংসারে অলৌকিক পাতি-ব্রত্যরূপ অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিলেন। তাঁহার জীবননাটকের শেষাঙ্কের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পবিত্র ইতিহাসও সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। সীতার স্বর্গা-

রোহণের পর রাম, ভ্রাতৃগণের সহিত, সংসারে আর অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই ; রামায়ণ সম্বন্ধে এই অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়টী পাঠকপাঠিকাবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়া আমরা তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে এই স্থানেই পটক্ষেপণ করিতেছি।

উপসংহার

সীতার দুঃখময় জীবনের শেষ হইল ; অতঃপর তাঁহার অলৌকিক চরিত্র ও গুণাবলির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

সীতা জগতে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি! ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, নিস্তব্ধ উষাকালে, অলৌকিকরাগরঞ্জিত গগনপটে, শুভ্রজ্যোতিঃ প্রভাত-তারকা যেরূপ সুন্দর, পবিত্র ও প্রীতিপ্রদ, বাল্মীকির মহীয়সী প্রতিভাপ্রদীপ্ত সীতাচরিত্র তদপেক্ষাও সুন্দর, পবিত্র ও প্রীতিপ্রদ! এ চরিত্রের তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না ; সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধতায়, মাধুর্য্য ও পবিত্রতায়, গৌরব ও মহিমায় ইহা বুঝি জগতে এক ও অদ্বিতীয়! সীতাচরিত্রের গভীরতামধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আমরা দিশাহারা ও আত্মহারা হইয়া যাই, এবং তাহার অপরিমেয়তা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকি! বালিকার সরলতা ও পবিত্রতা, যুবতীর প্রেম ও কর্ত্তব্যজ্ঞান, প্রৌঢ়ার স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, গৃহলক্ষ্মীর ধর্ম্মপ্রাণতা ও সৌকুমার্য্য, তাপসীর সংযম ও কঠোরতা, ঋষিকন্যার মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধতা এবং বীরাঙ্গনার তেজ ও নির্ভীকতা সীতাচরিত্রে একাধারে সমভাবে দেদীপ্যমান। এরূপ বিভিন্ন গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ আর কোনও নারীচরিত্রে কখন কোথাও হইয়াছে কি না, জানি না; কিন্তু এদেশে সীতার পূর্ব্বে ও পরে যে যে অসামান্য নারী প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বুঝি চরিত্রগাম্ভীর্য্যে ও গুণ-বৈচিত্র্যে সীতার সমকক্ষ হইতে সমর্থ হন নাই। সীতা নিজ

অলৌকিক চরিত্রগৌরবে গৌরবান্বিত এবং বিমল পুণ্যতেজে প্রদীপ্ত। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই রমণীকুলশিরোমণি; তাই তাঁহার তুলনা নাই, অথবা তিনিই কেবল তাঁহার একমাত্র তুলনা!

সীতার অন্তর্নিহিত স্বভাব-সিদ্ধ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতাই তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্যের একমাত্র মূল কারণ। সীতার মন ও বুদ্ধি জন্মাবধিই নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ও সরল। জ্যোৎস্নাস্নাত স্ফুটনোন্মুখ শুভ্র পুষ্প যেরূপ পবিত্র ও মনোহর, সীতার সুকোমল মন স্বভাবতঃই তদপেক্ষাও পবিত্র ও মনোহর। সীতার মন পবিত্র, তাই সীতার বুদ্ধিও সরল; তাই সীতার নয়নযুগল হইতে স্নিগ্ধ দীপ্তি ক্ষরিত হয়, তাই তাঁহার মুখমণ্ডলে দিব্যজ্যোতিঃ ক্রীড়া করে; তাই তাঁহার আত্মপর, উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, এবং জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও পবিত্র, তাহারই প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ। এই নিমিত্তই বালিকা সীতা পিতৃগৃহে অভ্যাগত ঋষিগণের মুখে পবিত্র আশ্রমের বিবরণ শুনিয়া বিমুগ্ধ হন, তাপসকন্যাগণের সহিত বাস ও বনে বনে বিচরণ করিয়া পুষ্পচয়ন করিতে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শান্তস্বভাব হরিণশিশুদের সহিত ক্রীড়া করিতে অতিশয় সমুৎসুক হন। এই নিমিত্তই, সীতা বৃক্ষলতা ভালবাসেন, পুষ্পদর্শনে প্রীত হন, পশুপক্ষিগণকে দয়া করেন, সখীগণকে প্রীতি করেন ও দাসদাসীগণকে স্নেহ করেন। এইজন্যই সীতা মধুরভাষিণী, আনন্দদায়িনী ও চমৎকারিণী। এই কারণেই তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, এবং তাহাতে দেবরাজ্যের অস্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল বলিয়াই তাহাতে কখনও অপবিত্রতার

ছায়াপাত হয় না, এবং পুণ্যালোক সহজেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই সীতা সংকথা ও সংপ্রসঙ্গ ভালবাসেন এবং শুভ্রকেশ ঋষিবর্গ ও পূজ্যপাদ জনকের নিকট নানাবিধ হিতোপদেশ শ্রবণ করিতে একান্ত অনুরাগিণী প্রদর্শন করেন। এই জন্যই সীতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অতিশয় অনুরাগিণী, এবং পিতৃগৃহেও অরণ্যচারিণী বনদেবীর ন্যায় শোভাময়ী। বালিকাসীতার এই অনন্যসাধারণ গুণাবলি সন্দর্শন করিয়াই দূরদর্শী মহর্ষিগণ সীতা সম্বন্ধে কত অভিমত প্রকাশ করিতেন, এবং রাজর্ষি জনক কোথাও তাঁহার উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া হরের ধনুর্ভঙ্গরূপ কঠোর পণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সীতা মহদ্‌গুণাবলি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তিনি রাজর্ষি জনকের রাজোদ্যানে লালিত পলিত হইয়াছিলেন। সীতা ধর্ম্মের বাতাসে ও সুনীতির শিশিরসিঞ্চনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্নিগ্ধদর্শিনী লতিকার ন্যায় পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইয়াছিলেন। রাজর্ষির উচ্চচরিত্র, ধর্ম্মানুরাগ, নিস্পৃহতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বালিকা-সীতার নির্ম্মল হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া বদ্ধমূল হইয়াছিল। সীতা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাবা হইলেও জনকের অলৌকিক ধর্ম্মজীবন তাঁহার চরিত্রসংগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। চন্দ্রকিরণে শত শত পুষ্পমুকুল যেরূপ বিকশিত হইয়া উঠে, ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে সীতার নির্ম্মল মনোবৃত্তিনিচয়ও বয়োবৃদ্ধিসহকারে সেইরূপ পরিস্ফুট হইয়া স্বর্গের শোভায় পরিণত হইয়াছিল।

লাবণ্যময়ী জানকী এখন উদ্ভিন্নযৌবনা। বালিকাসুলভ সরলতা

ও যৌবনসুলভ গাম্ভীর্য্য একত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে সুরবালার ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী করিল। সীতা যেন আলোকময়ী; সীতা যেন এক অলৌকিক জ্যোতিঃ! উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত না হইলে এ আলোক মলিন হইবে, এই জ্যোতিঃ বিলীন হইয়া যাইবে, তাই জনকের চিন্তার পরিসীমা নাই! সৌভাগ্যক্রমে সীতার অনুরূপ পাত্র মিলিল। পবিত্রস্বভাব রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল। রাম সত্যপরায়ণ, শান্তপ্রকৃতি ও তেজস্বী। ষোড়শবর্ষীয় বালক হইলেও, সিংহের ন্যায় তাঁহার পরাক্রম, অচলের ন্যায় তাঁহার গাম্ভীর্য্য, দাবানলশিখার ন্যায় তাঁহার উৎসাহ, পৃথিবীর ন্যায় তাঁহার ক্ষমা এবং মহর্ষির ন্যায় তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ। চরিত্রের তেজ ও দৃঢ়তা যেন মুখমণ্ডলে অঙ্কিত রহিয়াছে। রাজকুমার রামচন্দ্র এই অল্প বয়সেই সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছেন। ঋষিবর্গ তাঁহার পবিত্রচরিত্রগুণে একান্ত বিমুগ্ধ। তিনি স্বভাবসিদ্ধ পুণ্যতেজে প্রদীপ্ত। এই জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষের সহিত জ্যোতির্ম্ময়ী সীতাদেবীর বিবাহ হইল। জ্যোতিঃ জ্যোতিঃকে আলিঙ্গন করিল; আলোক আলোকের সহিত মিলিত হইল। আলোকে আলোকে সম্মিলন! কি সুন্দর, কি পবিত্র! এরূপ বুঝি আর কখনও হয় না! এই দিব্য সম্মিলন সহজেই সুসম্পন্ন হইল, কোন পক্ষ হইতেই অল্পমাত্রও চেষ্টার প্রয়োজন হইল না! উভয়েই ধর্ম্মানুরাগী, উভয়েই বিশুদ্ধস্বভাব; উভয়েরই হৃদয় কোটিচন্দ্রসমুদ্ভাসিত; উভয়েরই সত্যে প্রীতি ও সাধুতায় বিশ্বাস। উভয়েরই এক চিন্তা, এক আকাঙ্ক্ষা, এক চেষ্টা; উভয়েরই এক মন, এক প্রাণ, এক হৃদয়; উভয়েই কি এক অজ্ঞাত, অলক্ষিত

মহাজ্যোতির অভিমুখে অগ্রসর হইতে ব্যাকুল; উভয়েই যেন এই পাপতাপময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোন্ এক দেবরাজ্যে বিচরণ করেন; উভয়েই যেন দিব্যলোকবাসী; কি এক মহদ্‌-দেশ্যসাধনের জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন! উভয়েই যেন আনন্দরাজ্যের প্রজা, জগতে আনন্দজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন! উভয়ে উভয়কে বুঝিলেন, মিলনও সম্পূর্ণ হইল। ইহারই নাম আধ্যাত্মিক মিলন; এই মিলনই প্রকৃত বিবাহ!

রাজর্ষি জনকের গৃহে লালিত পালিত হওয়া সীতার যেরূপ সৌভাগ্য, রামের ন্যায় দুর্লভ স্বামিরত্ন লাভ করা সীতার তদপেক্ষাও অধিকতর সৌভাগ্য। পিতার স্নেহবারিসেকে যে লতা অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, স্বামীর প্রেমবারিসিঞ্চনে তাহা পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া লাবণ্যময়ী হইল। ব্রহ্মনিষ্ঠ জনকের গৃহে সীতার চরিত্রে সে অস্ফুট জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, দেবকল্প ভর্ত্তার কৃপাগুণে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরি-স্ফুট হইয়া সীতাকে অলৌকিক মহিমায় উদ্ভাসিত ও স্বর্গীয় গৌরবে প্রদীপ্ত করিল। পিতৃগৃহে সীতার অন্তর্নিহিত যে আলোক বৃক্ষ লতা, পুষ্প ফল, বন উপবন, পশু পক্ষী, পিতা মাতা, দাস দাসী ও নরনারী মাত্রেরই উপর পতিত হইয়া সকলকে অপার্থিব শোভায় সুশোভিত করিত, এক্ষণে সেই আলোক সহসা ঘনীভূত ও শত গুণে উজ্জ্বলীকৃত হইয়া রামের অন্তর্বাহ্য ওতঃপ্রোতঃরূপে আচ্ছন্ন করিল, এবং তাঁহার অভ্যন্তর দিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডের উপর সুস্নিগ্ধ কিরণধারারূপে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সূর্য্যপ্রভা যেন

চন্দ্রমণ্ডলে নিপতিত হইয়া সুশীতল জ্যোৎস্নাজালরূপে ধরাতল আলোকিত করিল। রামকে ভালবাসিয়া সীতা যেন দেবতা হইয়া গেলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন দেবরাজ্যে পরিণত হইল! স্বর্গের দ্বার যেন উদ্‌ঘাটিত হইল! সৌন্দর্য্যধারা যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল! আকাশ যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইল! সীতার হৃদয়ে যেন শত বীণার ঝঙ্কার হইতে লাগিল! সীতার দিব্য চক্ষু যেন উন্মীলিত হইল। সীতা সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন; প্রকৃতি যেন নববেশ ধারণ করিল; অনন্ত পবিত্রতাসাগরে সীতা যেন নিমজ্জিত হইলেন; অনন্ত সৌন্দর্য্যের সহিত সীতা যেন মিলিত হইলেন; আলৌকিক জ্যোতিঃরাশির মধ্যে সীতা যেন সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। সীতার আত্মা যেন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল; এতদিনে সীতা যেন প্রকৃতই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিলেন। সীতার জীবন যেন বাস্তবিক ধন্য হইয়া গেল। তখন সীতা বুঝিলেন যে "পিতা মাতা ও পুত্র, ইহাঁরা কেবল পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন; কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহই নাই।" তাই পতিই সীতার দেবতা হইলেন; তাই পতিই সীতার ধর্ম্ম, পতিই সীতার স্বর্গ এবং পতিই সীতার একমাত্র মুক্তি।

এহেন পতি আজ বনবাসে যাইতেছেন। পতি গৃহেই থাকুন আর বনেই গমন করুন, তিনিই সীতার একমাত্র গতি; "পতির সহবাসই স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক;" পতি ভিন্ন পতিপ্রাণার সুখ ও সুখসাধন আর কি আছে? সুতরাং রামের যখন বনবাসের আদেশ

হইয়াছে, ফলে সীতারও তাহাই ঘটিয়াছে; ইহাই সীতার সরল স্বাভাবিক যুক্তি। রাম বনবাসের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু বুঝিলেন না যে, তাঁহার সহবাসে অরণ্য সীতার পক্ষে পিতৃগৃহ অপেক্ষাও সুখকর হইবে, প্রকৃতির প্রিয়তমা দুহিতা তাঁহাকে কেমন মনোহর রাজোদ্যানে পরিণত করিয়া লইবেন। রামের সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গ হউক, কোনটিতে সীতা সঙ্কুচিত নহেন। অরণ্যের কষ্ট সীতার নিকট কষ্টই নহে। "আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, পথ সুখশয্যার ন্যায় বোধ হইবে. তাহাতে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ, কাশ, শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে সকল কণ্টক বৃক্ষ আছে, আমি তাহা তূল ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহা অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব।" অরণ্যবাস সীতার অপ্রীতিকর হইবে না; সীতা স্বামীর সহিত আশ্রমপর্য্যটন করিতে কতবার ইচ্ছা করিয়াছেন; স্বামীর চরণযুগল গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিদুহিতা প্রকৃতির স্বহস্তরোপিত উদ্যানে বাস করিতে কতবার সাধ করিয়াছেন। সীতা স্বামীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কত নদ, নদী, গিরি, গুহা, বন উপবন দর্শন করিবেন। সীতার অরণ্যবাসে বিতৃষ্ণা নাই; তবে রাম যদি সীতাকে সঙ্গে লইতে একান্তই আপত্তি করেন, তাহা হইলে সীতা বিষপান করিয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন।

পতিই যাঁহার একমাত্র সুখ, তাঁহার নিকট রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মাত্র। সে সমস্ত ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে বিস্ময়কর নহে। ইহাকে আত্মত্যাগ বলে না; যাহা প্রকৃত সুখ

ও আনন্দ, তাহারই বিসর্জ্জন প্রকৃত আত্মত্যাগ। স্বামী অপেক্ষা ধনরত্ন যাঁহাদের চক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা ইহাকে আত্মত্যাগ বলিলেও বলিতে পারেন, কিন্তু সীতাদেবী যখন নিজ আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনাবলে বনবাসে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে অনুমতি পাইলেন, তখন আর তাঁহার ত্যাগ কি? সুখ ত্যাগ করা দূরে থাক্, বরং অরণ্যে স্বামীর অনুসরণ করিয়া তিনি প্রকৃত সুখেরই অধিকারিণী হইলেন। পতিই সীতার সুখ, তাই সীতা পতিব্রতার অগ্রগণ্যা; তাই জগতে তাঁহার তুলনা নাই!

সীতা রামের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বভাবতঃই তিনি বনবাসে স্বামীর সুখদুঃখের সমভাগিনী হইতে ব্যাকুল হইলেন। বনে বনে পর্য্যটন করিয়া সীতা ক্লান্তি অনুভব করিলেন না; বরং এক একবার ভর্ত্তার প্রেমময় মুখমণ্ডলের দিকে এবং এক একবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন অরণ্য-পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা মনোহর পঞ্চবটীবনে এক কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটী যেন প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি; নদ নদী, বন উপবন, গিরিনির্ঝর ও মৃগপক্ষীতে এই স্থান যেন অপূর্ব্ব শোভাময়। এই মনোহর পঞ্চবটীবনে স্বামিসহবাসে ও দেবরের পরিচর্য্যায় সীতা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রাম যেখানে বিদ্যমান, সীতার চক্ষে তাহাই স্বর্গ; কিন্তু এই পঞ্চবটী সীতার নিকট যেন স্বর্গ অপেক্ষাও সুখকর বোধ হইতে লাগিল। আলোকময়ী জানকী জ্যোতিষ্মান্ রামের সহিত একমন, একপ্রাণ ও একহৃদয় হইয়া জড়-জগতে

চর্ম্মচক্ষুর অগোচর কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন! জড়জগতেও যে মহাজ্যোতিঃ ওতঃপ্রোতঃ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে, রাম ও সীতার নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় আত্মা তন্মধ্যে নিমজ্জিত হইল; তাই সীতা স্বামীর সহিত নির্ভয়ে মহোল্লাসে পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, অরণ্যে নির্ভীকচিত্তে পর্য্যটন করিতেন, পুষ্পরাশি চয়ন করিতেন, হংসসারসনিনাদিত গোদাবরীতীরে ভ্রমণ করিতেন, কমলশোভিত স্বচ্ছ সরোবরে অবগাহন ও স্বহস্তে কমলরাশি উত্তোলন করিতেন, এবং গিরিনির্ঝর, বন উপবন দর্শন করিয়া বিমল আনন্দলাভ করিতেন। তাই সীতা পুষ্পের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইতেন, লতিকার সহিত সখিত্ব করিতেন, মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেন, হরিণীর সহিত ভ্রমণ করিতেন, পক্ষিগণকে আহ্বান করিতেন এবং আনন্দধ্বনিতে বনস্থল পরিপূর্ণ করিতেন। সীতা যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা; সীতা যেন মূর্ত্তিমতী কাননশ্রী! তাই সীতাকে দেখিয়া হরিণহরিণীসকল ভয় ত্যাগ করে, হরিণশিশু সীতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া যায়, ময়ূরসকল ময়ূরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সীতার করতালিশব্দে কুটীরাঙ্গনে নৃত্য করে, কত মনোহর সুকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ পুষ্পিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক অমৃতধারা বর্ষণ করে, এবং রাজহংসশ্রেণী গ্রীবা নত করিয়া অস্ফুটস্বরে বিরাব করিতে করিতে সীতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে! তাই সীতার দর্শনমাত্রে পুষ্পমুকুল বিকশিত হয়, লতিকা আনন্দে দুলিতে থাকে, বৃক্ষসকল মর্ম্মরশব্দে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, শিশুবৃক্ষগুলি করতালি দিয়া নাচিয়া উঠে এবং কাননভূমি আলোক-

ময়ী হয়! সীতাই যেন সকলের জীবন, সীতাই যেন সকলের শোভা, সীতাই যেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আলৌকিক দীপ্তি! সীতা যেন পুষ্পের সৌন্দর্য্যে, পত্রের সৌকুমার্য্যে, পল্লবের স্নিগ্ধতায়, লতিকার কোমলতায়, হরিণীর শান্তভাবে, কোকিলের কূজনে, দাত্যূহের চীৎকারে, ময়ূরের কেকারবে, হংসের কলস্বরে, কাননের কমনীয়তায়, গিরির গাম্ভীর্য্যে, নির্ঝরের উল্লাসে ও নদীর কুলুকুলুতানে ওতঃপ্রোতোভাবে বিদ্যমান! তাই এই অপূর্ব্ব শ্রী অপহৃত হইলে কানন অন্ধকারময় হইল, এবং রাম উন্মত্তের ন্যায় বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল, বন, উপবন, গিরি, নির্ঝর, মৃগ, পক্ষী, সকলকেই সীতার সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সীতার অভাবে সকলেই নিরানন্দ ও বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। রাম জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন; রামের জীবনালোক যেন সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল!

পাপরাক্ষস পুণ্যময়ী দেবতাকে অপহরণ করিল। রাবণ অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধনের চেষ্টা করিল; অমানিশার প্রগাঢ় তিমির-জাল আলোকময়ী প্রভাকে নির্ব্বাপিত করিতে প্রয়াস পাইল, অধর্ম্ম ধর্ম্মকে সিংহাসনচ্যুত করিতে যত্ন করিল! কিন্তু পুণ্য পাপকেই দূরীভূত করিল; আলোকপ্রভা অন্ধকারে আরও উজ্জ্বলীকৃত হইল এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মকে নিষ্পেষিত করিল। রাবণ ধন, রত্ন, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সমস্তই সীতার চরণতলে সমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিল, কিন্তু পতিই যাঁহার ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র সুখসাধন, তাঁহার নিকট ত্রিলোকেরও ঐশ্বর্য্য অতিশয় ঘৃণিত ও তুচ্ছ কথা। শৈশবে ও যৌবনে সীতাচরিত্রে যে

স্নিগ্ধজ্যোতিঃ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, রাক্ষসের উৎপীড়নে তাহা প্রাখর্য্যলাভ করিয়া বহ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! সীতা শত্রুগৃহেও নির্ভীক ও সিংহীর ন্যায় তেজোগর্ব্বিতা হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সীতার সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পামর রাবণেরও হৃৎকম্প হইয়াছিল। রাবণের সাধ্য ছিল না যে, সে সীতার স্থাপিত একটী তৃণখণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার একটী কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়! সীতা সেই অশোককাননে রাক্ষসীপরিবৃত হইয়া তাপসীর ন্যায় কেবল রামেরই অনুধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন; দেহে দেহে বিচ্ছিন্ন হইলেও ভর্ত্তার সহিত ক্ষণকালের নিমিত্তও তিনি আত্মাতে আত্মাতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না। রাক্ষসের সহস্র চেষ্টা বিফল হইল। সীতাদেবীও ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইলেন।

রাক্ষসগৃহেই সীতার প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল; রাবণ নিহত হইলে, রাম লোকাপবাদভয়ে তাঁহার যে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ইহার তুলনায় সামান্য ব্যাপার মাত্র। পাপ ও প্রলোভনের সহিত ভীষণ সংগ্রামই প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা, এবং সেই পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হওয়াই প্রকৃত চরিত্রবল। এই চরিত্রবলের মূল ধর্ম্মে নিহিত। সীতা ধর্ম্মতেজে সর্ব্বদাই প্রদীপ্ত; তাই তিনি সূর্য্যপ্রভার ন্যায় রাবণের অস্পৃশ্যা ছিলেন। সীতা কায়মনোবাক্যে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিলেন; পাপ তাঁহাকে কোন মতেই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই; তাই অগ্নিও তাঁহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। অগ্নির সাধ্য কি যে, সে তেজঃপ্রদীপ্তা ধর্ম্মরক্ষিতা সীতাকে দগ্ধ করে? বিশ্বপাতার সমগ্র বিশ্বরাজ্য

সাধুতা ও পবিত্রতার সহায়; তাই মূর্ত্তিমান্ অগ্নি সীতাকে অঙ্কে লইয়া তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে রামের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। রামের সমস্ত সংশয় অপনীত হইল; পুণ্যজ্যোতিঃ আবার পুণ্যজ্যোতিঃর সহিত মিলিত হইল। স্বামী সীতাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; সীতাও পরম-দেবতার চরণতলে স্থান পাইয়া সমস্ত দুঃখজ্বালা বিস্মৃত হইলেন। নারীজীবন যেন সার্থক হইয়া গেল!

সীতা এখন রাজমহিষী! রাজমহিষী হইয়াও সীতা অবিকৃত ও অপরিবর্ত্তিত। এই রাজপ্রসাদেও সাধারণের অদৃশ্য স্বর্গ-রাজ্য সীতাকে বেষ্টন করিয়া আছে! এই স্থূল বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য স্বর্গরাজ্য; সীতাদেবী তন্মধ্যে সমাসীনা! সীতার অশরীরী আত্মা তন্মধ্যে বিলীন হইয়া আছে! কি সুন্দর, কি মনোহর, কি পবিত্র! রাজমহিষী সীতাদেবী ঈদৃশ দিব্যধাম-বাসিনী হইয়াও লৌকিক কর্ত্তব্যপালনে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ নহেন। রাম গুরু রাজ্যভার বহন করিতেছেন; সীতা প্রিয়তমের সেই গুরু ভার লঘু করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহাতে সুচারুরূপে প্রজাপালন হয়, সীতা তজ্জন্য সর্ব্বদাই সমুৎসুক। কিন্তু এই রাজসংসারের বাহ্যাড়ম্বর ও কৃত্রিমতা মধ্যে সীতার আত্মা যেন স্ফূর্ত্তিলাভ করিত না; তাই সীতা শান্তিময় পবিত্র আশ্রমদর্শনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে লালায়িত হইতেন; তাই অন্তর্ব্বত্নী হইলে, স্বামীর দোহদপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি অন্ততঃ এক রাত্রির নিমিত্তও আশ্রমে বাস করিতে অভি-লাষ প্রকাশ করিলেন।

মন্দভাগিনীর ভাগ্যচক্র আবার পরিবর্ত্তিত হইল! রাম লোকাপবাদভয়ে সীতাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিলেন। আনন্দের মুখ্য কারণ অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জানকী জগৎ-সংসার অন্ধকারময় দেখিলেন। জানকী প্রেমময় জীবিতনাথের এই নির্দ্দয় ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার উপর কোনও দোষারোপ করিলেন না। সীতা বুঝিলেন, স্বামীর কিছুমাত্র দোষ নাই; যত দোষ তাঁহার অদৃষ্টের, তাঁহার জন্মান্তর পাতকের। সীতার অপবাদে রাম দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইয়াছে; এই কলঙ্কক্ষালনের জন্য সীতাকে যদি প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। তাই সীতা অশ্রুপূর্ণলোচনে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু; অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য।" সীতা দেহসম্বন্ধে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, আত্মাতে তাঁহার সহিত অবিযুক্ত রহিলেন। এজন্মে সীতা স্বামিসহবাসসুখ লাভ করিলেন না বটে, কিন্তু যাহাতে পরজন্মে আর তাঁহার সহিত বিপ্রয়োগ না ঘটে, তজ্জন্য তিনি ঘোরতর তপস্যা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অন্তর্নিহিত তেজঃপুঞ্জ আবার স্বর্ণপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সীতার হৃদয়মধ্যে স্বামিসম্বন্ধে যে সামান্য বাসনা লুক্কায়িত ছিল, সেই প্রদীপ্ত তেজে তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল। বিশ্বসংসার এখন সীতার চক্ষে জ্যোতির্ম্ময়, তন্মধ্যে কেবল রাম ও সীতা; সীতা সেই প্রজাবৎসল অলোকসাধারণ দেবতার ধ্যানে নিমগ্না।

সীতা আজ প্রকৃতই তপস্বিনী; পরমদেবতা পরমগুরু পতির চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া সীতা এই তপস্যায় দেহপাত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

দ্বাদশ বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। লবকুশের পরিচয় পাইয়া রাম বিশুদ্ধস্বভাবা সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন; কিন্তু সাধারণের প্রত্যয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে সভামধ্যে স্বীয় চরিত্র উদ্দেশে শপথ করিতে হইবে! বাল্মীকি সীতাকে রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সীতা পরম-দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিলেন না। অলৌকিকজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী জানকী বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করি-লেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র লঘুচেতা ক্ষুদ্রমনা প্রজাবর্গ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল; সেই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার উপস্থিতি মাত্রে তাহাদের হৃদয় কম্পিত ও দেহ রোমাঞ্চিত হইল। রাম সীতাকে স্বীয় চরিত্র উদ্দেশে শপথ করিতে বলিলেন। সীতার কোন দিকে দৃষ্টি নাই; সীতা নিজ পদযুগলেই দৃষ্টি নিহিত করিয়া আছেন। চরিত্র উদ্দেশে আবার শপথ! অবলার প্রাণে আর সহ্য হইল না। সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, "আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনে স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী

পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।" সতীর প্রার্থনা বিফল হইল না। দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হইলেন, সহস্র অলৌকিক জ্যোতিঃরাশি বিনির্গত হইল, জ্যোতিম্ময়ী সীতাদেবী জ্যোতির মধ্যে বিলীন হইয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন!

এই জ্যোতিম্ময়ী দেবতাকে আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, সকলকে সেইরূপই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এই দেবতা ধর্ম্মের তিল তিল জ্যোতিষ্কণায় বিনির্ম্মিত, সে ধর্ম্মের অপর নাম পাতিব্রত্য! ইঁহার অলৌকিক পবিত্র চরিত্র আমাদিগকে ধর্ম্মের পথে নিয়ত আকর্ষণ করুক; ইঁহার নির্ম্মল আত্মার সুস্নিগ্ধ কিরণজাল আমাদের সন্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল করুক; আমদের হৃদয়ক্ষেত্র স্বর্গরাজ্যে পরিণত হউক; ইনি আমাদের মুক্তিপথের সহায় হউন; ইঁহার পবিত্র সত্ত্বাতে আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ হউক। ইনি আমাদের নারীজাতির কল্যাণ করুন।

সমাপ্ত

জীবনের শান্তি

প্রথম চিত্র।

জগতে যাঁরা শিক্ষিত, যাঁরা ধনী, যাঁরা সভ্য তাঁরা মনে করেন যাকিছু শিক্ষা, যাকিছু জ্ঞান, যাকিছু সভ্যতা সব তাঁদেরই করুণায় জগতে বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে—জ্ঞান, সভ্যতা, শিক্ষা ইহারা যে সকলেই প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইতে জন্ম নিয়া, অভিজ্ঞতারূপে মানুষের বাহিরে বিকশিত হইয়া পড়ে, তাহা তাঁরা আসলেই আমল দিতে চাহেন না। তাঁরা ভিন্ন আর কেহই জ্ঞানী, ধনী বা সভ্য হইবার গোপনকৌশল মোটে জানিতে পারে না, এই তাঁদের ধারণা; কিন্তু তাহা নয়। কেননা, হরিশপুর গ্রামের সুকান্ত মুসলমানচাষী, বুড় বয়সে যখন তার একমাত্র সন্তান

জীবনের শান্তি

মধোগাজীকে কেবলই দেশের জমিদারের কাছে একটা বিপুল দেনার উত্তরাধিকারী রাখিয়া, এ সংসারের সমস্ত ক্ষণিকসুখ ও সারাজীবন দুঃখের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সমস্ত চেনাপরিচিতের মধ্য হইতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও, একটা শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া পরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করিল; তখন সেও কেবলই ভাঙা গলায়, জীবনের সকল কথাটি যার কাছে গোপন করেনি,—সেই নিজের প্রথমকার ছেলে মধোগাজীকে এই কথাটি বলিয়া যায়—"বাপধন, তোর খাবার জন্যে কিছুই রাখতে পারলুম না, তোকে পথে বসিয়ে চললুম। কিন্তু এই কথাটা শুধু মনে রাখিস্—সহ্য, ক্ষমা আর দয়ার চেয়ে গরীবের ভাণ্ডারেতে আর কেউ নেই।" এই কথাটি—কেবলই এই কথাটিকে পিতার বক্ষমূল দানের মত মাথায় করিয়া লইয়া মধোগাজী সেদিন তার চির দুঃখী, বাপকে কবরে ঘুম পাড়াইয়া আসিল—তার বাপের এই শেষ-শয়নের ভূমিখণ্ডের জন্য কোন জমিদারই আর খাজনা আদায় করিবার কূটবুদ্ধি মাথায় জোগাইয়া আনিতে পারিল না; কারণ, শেষ-জীবনের এশখ্যাটি মধোগাজীর গরীব বাপ তার জন্মদিনের অধিকার-হিসাবে দগ্ধদেহের শান্তির শীতলতার জন্য পাইয়াছিল।

মানুষের যাকিছু কান্নাকাটি এই জগতকে লইয়া।—

জীবনের শান্তি

এই জগতেই মানুষ সুখেসচ্ছন্দে একটা চিরদিনের-অধিকার হিসাবে থাকিতে পায় না বলিয়াই তার যত দুঃখ, যত বিবাদ, যত ব্যাকুলতা আবার যত কান্নাকাটি। কিন্তু মধোগাজীর বাপের ভাগ্যে মানবের জন্মগত অধিকারহিসাবে প্রাপ্ত-সুখ পর্যান্ত ভোগকরা হয় নাই—কেন যে হয় নাই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে, নানামুনির নানামতের মত অনেকের নিকট হইতে অনেক বিভিন্নরকমের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। দেশহিতৈষী পরার্থীদল বলেন—"স্বার্থপর জমিদারের নির্দ্দয়তার জন্যই, গরীব সারাটা জীবন চোখের জলে বুক ভাসিয়েচে।" যারা চোখকাণ বুজিয়ে দিনগুলো কাটাইয়া দিতে চায়, তারা বলে—"নিছাৎ ভাগ্যটা তার খারাপ ছিল, তাই সারাজীবন এত কষ্ট পেয়েচে—আহা, আত্মা তার সুখী হোক্।" আবার দার্শনিকভক্তের দল বলেন—"একেই বলে লীলাময়ের লীলা।" কিন্তু সন্ধ্যার সময় যখন আলো আর অন্ধকার হাসিকান্নাভরা ক্ষণিক একটা জীবনের মত শস্যক্ষেত্রের অপর প্রান্তে কাঁপিতে কাঁপিতে মিলাইয়া যায়, আজিও তখন মধোগাজী তার সারাদিনের খাটুনীর পর আপনার কুটীরে ফিরিবার সময় বাপের কবরের পার্শ্বে উপুড় হইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া আসে; নিজের কোঁচার কাপড় দিয়া কবরের উপরটি ঝাড়িয়া

পরিষ্কার করিয়া দেয়। তখন বনের পাখিরা সেই একই ভাবে কলস্বর করিতে থাকে—ফুলেরা নিত্যনূতন গন্ধ ছড়ায়। পাখীর কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য্যে মধোগাজীর কাণ থাকে না, নাসিকা তখন আঘ্রাণ-শক্তিও হারাইয়া বসে।—মধোগাজী কেবলই কবরটি ঝাড়িতে থাকে; আর সেই সঙ্গে তার দুঃখীপিতার সারাজীবনের দুঃখভরা ইতিহাসখানির পাতাগুলি কে যেন বড় নির্দয়ভাবে তাহার চক্ষের সামনে খুলিয়া খুলিয়া ধরিতে থাকে—মৃতপিতার এক একটা দুঃখে, জীবন্ত-মধোগাজী ফুলিয়া ফুলিয়া নূতন করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। (হায় মানুষ, মৃত্যু অনিবার্য্য জানাসত্ত্বেও কি তুমি কেবলই জীবনের সংতপ্ত ইতিহাসখানি দেখিয়া, এতদুর্ব্বল হইয়া পড় ?)

এইরূপে দিনের দিন চলিয়া যায়, আবার নূতন দিন আসে। মহাগুরু নিপাতের বৎসরটা সাধারণে দুর্ব্বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। মধোগাজীর কিন্তু পিতা থাকিতে যেভাগ্য ছিল, পিতার মৃত্যুর পরও তার সেই ভাগ্যই রহিল—কেননা দুর্ভাগ্যের স্থিতি যার সারাজীবন, তার নিকট সৌভাগ্যের মধুর হাঁসিটাই বিদ্যুৎ-স্পর্শের মত জীবনের সকল অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া দেয়। পিতার মৃত্যুরপর সৌভাগ্যের কোন মধুর হাঁসিই মধোগাজীর চাষী-জীবনের সকল দগ্ধক্ষতগুলি স্পর্শ করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া-

দিল না যে, সে সমগ্র মানবজাতিরমধ্যে বাছাই করা একজন দরিদ্রঅজ্ঞজীব। বরং পিতার মৃত্যুরপর মধোগাজীর দুঃখের বোঝা আরো বাড়িয়া উঠিল—তার পিতার মৃত্যুটাই দেশের জমিদারের চ'ক্ষে মধোগাজীর ব্যক্তিগত একটা মহা দোষ হইয়া দাঁড়াইল।

সেদিন জমিদারের কাছারী হইতে মধোগাজীর ডাক আসিল। যুবকমধোগাজী মুখ শুখাইয়া আসিয়া হাজির দিল। কাছারী বাড়ীতে ঢুকিয়া হঠাৎ মধোগাজীর কেমন মনটা একটু গা ঝাড়া দিয়া সবল হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। এই সেইস্থান, যেখানে মধোগাজী কতবার তার বাপেরসঙ্গে শৈশবে আসিয়া লাল কুকুরটার সঙ্গে কতই-না খেলা করিয়াছে; কৈশরে আসিয়া, তার বাপকে জমিদার ভৎর্সনা করিলে মধোগাজী কতইনা জমিদারের করুণা আর তাদের দুঃখে সহানুভূতি জাগাইবার জন্য, জমিদারকে দেখাইয়া দেখাইয়া একবারের জায়গায় দশবার কুর্ণিশ করিয়াছে—এই সেইস্থান, যৌবনে যেখানে বুড়ো বাপের হাত ধরিয়া মধোগাজী আসিয়া প্রাণপণে জমিদারকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত—কখনো বা নিজেদের এহেন অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য, যেন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুদূর আকাশের পানে চাহিয়া গালে হাত দিয়া

ভাবিত; আর জমিদারের ভর্ৎসনায় মধ্যে মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠিত। সকালবেলা বাল-সূর্য্যের কিরণরেখা লইয়া আকাশ উন্মুক্ত স্বাধিনতায় বিভাসিত থাকিত, দুপোহরের রৌদ্রে ঝকঝক্‌ করিত—সন্ধ্যায় চাঁদের আলোকে ভাসিয়া আকাশ যেন মৃদুবাতাসের কোলে হাঁসিয়া গড়াইয়া পড়িত। সেই আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া মধোগাজী নিজেদের এই দুরবস্থার যেন কারণ খুঁজিয়া বেড়াইত, কিন্তু কোন কারণই সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না—কেন যে এই ভর্ৎসনা, কেন যে এই কুর্নিশকরা আবার কেনইবা এই চম্‌কাইয়া ওঠা। সকল তিরস্কার; সবদুঃখ প্রাণে থাকা সত্বেও, তবু যুবকমধোগাজীর মনে তখন অনেক সাধআহ্লাদ থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিত—কবে সে বুড়োবাপকে অব্যাহতি দিয়া সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে লইয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে, নিজেদের অবস্থা ফিরান যায় কিনা। মধোগাজীর তখন মনে হইত, তার বাপ নিহাৎ ভালমানুষ বলিয়াই জমিদারকে সবকথা ঠিকটি করিয়া বুঝাইতে পারে না; সেই কারণেই বোধহয় জমিদার এত চটিয়া ওঠে। মধোগাজীর বিশ্বাস ছিল—বাপের যা' ক্রুটি, সে নিজে সেটা সংশোধন করিয়া দুরবস্থার গতি ফিরাইয়া লইবে। আজ সে দশজন সংসারীলোকের

একজন হইয়া, কার কারবারের ভার নিজের হাতে পাইয়া জমিদারের কাছারীতে চলিয়াছে, তাই তার পিতার শোকে সংতপ্ত-মন আবার খাড়া হইতে গেল ; কিন্তু এই যুবকের তপ্ত-মনের স্বাধীনপায়ে কে যেন কুড়ল মারিয়া আবার ভাঙ্গিয়া দিল—যে দুঃখকে বুকে করিয়া তার তিরস্কৃতবাপ, এই ধরনীর সমস্ত স্বাধীন আর স্বাভাবিক সুখআনন্দকে চিরদিনেরমত ছাড়িয়া গেছে, যুবক মধোগাজী হয় তো সময় ফিরাইবে, কিন্তু তার বাপের কি হইবে ? মধোগাজীর মন ঝিমাইয়া আসিল—তার মনে পড়িয়া গেল, একদিন জমিদারের নায়েব তারই সামনে তার বাপকে সবেগে জুতা ছুঁড়িয়া মারিয়া ছিল,—হায়, তখন মধোগাজী যে নিহাৎ ছোট ! ছেলের সাম্নে বাপ মার খাইয়া, ছোট ছেলের হাত ধরিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিয়া ছিল। বাড়ী ফিরিবার পথে মধোগাজীকে আদর করিয়া বাপ নিষেধ করিয়াছিল—"বেটা, দেখিস তোর মা যেন খবরদার একথা শোনেনা, এবার মহরমের সময় তোরে খুব রঙ্গিন জামা কিনে দেব—তোর মাকে একথা বলিস্ নি।"

জমিদার মধোগাজীকে দেখিয়া ভীষণ গম্ভীর হইয়া মুখ খিঁচাইয়া কহিল—হ্যাঁরে মধো, শুনলুম তুই বেটা নাকি

আর কাজকর্ম্ম কিছুই করিস্ না—কেবলই বাপের কবরের ওপর প'ড়ে প'ড়ে কাঁদিস্? তোর ন্যাকামি দেখে যে আর বাঁচি নারে!—তুই কি এটা মগেরমল্লুক পেয়েচিস্ নাকি, যে সোহাগ ক'রে নবাবী করবি, খাজনা পাতির নাম করবিনে?—পাঁচ বছরের খাজ্না সুদে আস্লে তোর জমির দাম ছাপিয়ে উঠেছে।

অনেক দুঃখ আছে, নীরবতায় যেটা পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়। মধোগাজী আস্তে আস্তে শুধনো মুখখানা হেঁট করিল। জমিদার কিন্তু উল্টো বুঝিল, সে কহিল—তুই বেটা চুপ করে র'ইলি যে, তোর কি উদ্দেশ্য আমার অপমান করা?

মধোগাজী চম্‌কাইয়া উঠিয়া হাত জোড় করিল, কহিল—না হুজুর, সুয্যিকে হেলা ক'রে পিরথীবি বাঁচে কোথা? বাপ মরতে বড় দরদ নেগেছেল—আর তো ভু-ভারতে আমার নেই কেউ, হুজুরের কাছেই বাপ আমায় রেখে গেছে—বাপ মরতে ব'সে আমায় ব'লেছেল—জমিদার রাখুক্ মারুক্,পেরজা হ'য়ে কখনো চোখের উপরি চোখ তুলে কথা বলিস্ নি—

বাধাদিয়া জমিদার দাবড়ি দিয়া কহিয়া উঠিল—আরে থাম্ গাধা, তোর ও নবাবী ন্যাকামো শোন্বার আমার এত সময় নেই; এখন বল্, খাজ্নার বন্দোবস্ত করবি, না সব জমিজায়গা নিলেম্ ডেকে নেব?

মধোগাজী পূর্ব্ববৎ কহিল—এঁজ্ঞে হুজুর, বাপ আমার মরতে বসে বলে গেছ্যাল্—সহ্য করতি, ক্ষমা করতি আর দয়া করতি—তাই হুজুর, বাপের দরদটা দিন কয় একটু সহ্য ক'রেনি, তারপর খাজনা দিব না ত কি ?

জমিদার মুখ লাল করিয়া দ্বারবানকে ডাকিয়া কহিল—এ গাধাকে এখান থেকে দূরক'রে দেত—মগেরমল্লুক পেয়েচে—বেটার চোদ্দপুরুষের খান্সামা কিনা, ও'র কথাঅনুযায়ী আমায় চুপ চাপ ক'রে বসে থাক্তে হবে। আর একমাস সময় দিলুম—তারপর আমি যা' জানি ক'রবো।

দ্বারবান মধোগাজীকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল, আর কিছুই বলিতে দিল না।

দ্বিতীয় চিত্র।

পান্থরমা একজন নাপ্‌তিনী, মধোগাজীরই প্রতিবেশী। দুইজন ভাগ্যবান একজায়গায় থাকিতে পারে না, তাদের উভয়েরই মধ্যে টেক্কাদিয়া বড় হইবার প্রবৃত্তিটা স্বভাবতঃ জাগিয়া ওঠে; কিন্তু দুটী দুর্ভাগার মিলন বড়ই ঘনিষ্ট-ভাবে বাড়িয়া যায়—তাই বোধ হয় সকল প্রতিবেশীর মধ্যে পান্থরমা মধোগাজীরই উপর বড় বেশী অনুরক্ত ছিল। কেননা, পান্থরমাও এই পৃথিবীর সব দগ্ধজীবের মধ্যে একজন। পান্থরমা একটি ছোট মেয়ে লইয়া বিধবা—সেই কেবলমাত্র মেয়েটির নাম পান্থ বলিয়া, লোকে ইহাকে পান্থরমা বলিয়া জানে। পান্থরমা হিন্দু, তবু মধোগাজীর সঙ্গে তার বড়ই ভালবাসা।

পান্থর-মার স্বামীবহুদিন গত হইয়াছে, সে এখন দেবরের ভাতে দিন কাটায়। সারাদিন তাকে অনেক কাজই করিতে হয়—গরুর কাজ, সংসারের রান্নাবাড়ার কাজ, ধান ভাঙ্গা, রৌদ্রে ধান শুখাইতে দিয়া মাথায় ভিজে

গামছা চাপা দিয়া সেই খান চৌকি দিতে হয়—অবসর-টুকু দেবরের ছোট ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়ান—এই রকম তাকে দুবেলা দুমুঠি ভাতের জন্য অনেক খাটুনিই খাটিতে হয়। কেবলইএকটা পেটের জন্য এই সব খাটুনী ভিন্ন, সেই দু'মুঠি ভাতের খাতিরে প্রায়ই দেবরের অসহ্য প্রহারও তাকে সহ্য করিতে হয়। সংসারের খাটুনী ভিন্ন আর কিছুই পান্থরমার হাতে থাকে না—তবু সংসারের কিছু লোকসান হইলে দেবর-পত্নী বলে, পান্থরমাই চুরী করিয়া বিক্রী করিয়াছে। দেবর-পত্নীর এই অপবাদ মিথ্যা বলিবার তার পান্থরমার অধিকার নাই, তাহা হইলে এ সংসারে টেঁকা তার দায় হইবে—সুতরাং মিথ্যাদোষে দোষী হইয়া দেবরের নিকট পান্থরমাকে অনেকই অসহ্য প্রহারযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। পান্থর-মা দেবরের নিকট যেদিন মার খায়, সেদিন তার আর ভাত খাওয়া জোটে না। সংসারের ঘৃণ্য-নিপীড়নে উত্যক্ত হইয়া পান্থরমা মধোগাজীর কুটীরে ছুটিয়া পলাইয়া আসে, কেননা জগতে কেবল মধোগাজীই তার হৃদয়ের বেবাক পীড়নের অভাবঅভিযোগ নীরবে ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিয়া যায়—সে-অভাব নিবারণকরা যদিও মধোগাজীর সাধ্যের অতীত, তবু সে পান্থর-মার সকল

কাহিনী শুনিয়া একটি নিশ্বাস ফেলে;—তাই পাথর-মা মধোগাজীকেই তার দগ্ধহৃদয়ের ভালবাসার অধিকারী করিয়াছে। সে প্রণয় কেবলই দুঃখের আদানপ্রদানে জমিয়া উঠিল—বিনা-দোষের অপরাধে যে দুঃখ, দিনে দিনে কেবলই গুরু হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেছে—চাঁদ তার হৃদয়ের সমস্ত পূর্ণ আনন্দের বিমলতা, একটা চিরস্বাধীন-মুক্তির মত ছড়াইয়া দিয়াছে। তারাগুলি :একদল বিভ্রান্তশিশুরই মত সারাঅকাশটা দাপাইয়া বেড়াইতেছে। বাতাস সমস্ত বাঁধনবিহীন উন্মুক্ত ইচ্ছায়—কখনো ধূলি লইয়া, কখনো গাছের পাতা ছড়াইয়া, কখনো আকাশে উঠিয়া, কখনো দিঘীর জল দোলাইয়া সারাদিন ব্যাপিয়া সমান চির-অধিকারে পূর্ণানন্দে খেলিতেছে। মেটেরাস্তা বাহিয়া মধোগাজী জমিদারের কাছারী হইতে ধীরে ধীরে নিজের কুটীরে ফিরিতেছে—কুটীরে তার কেহই আপন বলিবার নাই, আকর্ষণের কোন সম্পদযুক্ত বিলাসসম্ভার বা কোন বিরহ-কাতর-চাহনির গভীরতা, তেমন প্রাণ অলসকরা কোন কিছুই সেই গোলপাতার কুঁড়েটাতে নাই; তবু মধোগাজী ভৎ সনায় আলোড়িত আপনার মনটিকে বুকে ধরিয়া, সেই কুটন্ত জ্যোৎস্নার-ঢেউ দুভাগ করিয়া কুটীরেরই দিকে ফিরিয়াছে।

কুটীরে আসিয়া চাঁদের আলোকে মধোগাজী বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার দাবায় কে বসিয়া আছে—ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল না। তাই জিজ্ঞাসা করিল—আঁধারে বইসে আছে কে রে?

উত্তর হইল—আমি রে মধু! অন্ধকার যদি তো, তুই আমায় দেখ্‌তে পেলি কি ক'রে?—এমন চাঁদের আলোও তোর অন্ধকার হ'ল?

মধোগাজী একগাল হাঁসিয়া কহিল—হিঁ হিঁ কে দিদি? দিদি? হিঁ হিঁ, আমি চিন্‌তি পারিনি।

বলিয়া মধোগাজী ঘর খুলিয়া কেরোসিনের দের্‌কো টানিয়া, আলো জ্বালিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

পান্থরমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। আলো জ্বালিতে জ্বালিতে মধোগাজী কহিল—এ বিটার পেরানটারে ক'ল্‌জিথে' কেম্‌নে বের ক'র্‌তি পারি ব'ল্‌তি পার দিদি? আমরা গরীব লক্‌ আমরা ছোটলক্‌ আমাদের চাঁদই বল আর আঁধারই বল সবই সমান। বাচ্ছা কোচি ছেলেটি যখন ছিনু, তোমায় আজ ব'ল্‌তি পারিনি দিদি, ঐ বিটার চাঁদেরে আকাশে দেখে, এই বাকুলে আমি কত নাচ নেচেচি। এখন আর নাচ্‌তি ইচ্ছা হয় না দিদি, পেরানটারে ক'ল্‌জিথে' টেনে বার ক'রতি পার্‌লি বাঁচি।

পান্থর-মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ষাট্ ষাট্! তোরা যে ষাট্-জোয়ান মদ্দ ভাই, তোরা যদি মরবি তো আমরা কি ক'রতে আছি বল?

আলো জ্বালিয়া খোল দিয়া হাত রগড়াইতে রগড়াইতে মধোগাজী কহিল—বাপ যখন মরতি গেল দিদি, কইছ্যাল—সহ্য করতি; আরে, আবাগীর পুত, সহ্য তো করতিইচি—আমিও সহ্য করতেচি, বেদ্‌নাও বাড়তিচে—এখন করি কি আমায় বল্ দিদি!

ফোঁস্ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পান্থর-মা কহিল—তুই সত্যি কথা ব'লেছিস্ মধু, কিন্তু সহ্য না করেও যে আর উপায় নেই ভাই, এ সংসারে সুখে আছে কে বল?—তোর কালাচাঁদ দাদা আবার আজ আমায় মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রেদিয়েচে।

বলিয়া পান্থর-মা আর একটা নিঃশ্বাস ফেলিল; তারপর আবার কহিল—এই দেখেচিস্, কপালটা কতখানি ফুলে উঠেচে! সেকথা তোকে ব'লবো কি মধু, বাকুলের মাঝে ফেলে, এই দেহখানের উপ্রি সে কি ধেই ধেই নাচ—এই দেখ্, গা সব খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে গেচে।

বলিয়া পান্থর-মা মধোগাজীকে দেহের তিন চার জায়গায় ক্ষতেরচিহ্ন দেখাইতে দেখাইতে, নূতন করিয়া প্রহার

বেদনায় আবার কাঁদিয়া উঠিল।—কাঁদিতে কাঁদিতে পান্থর-মা কহিল—তুই আমায় বল্ তো মধু, আমার কি অপরাধটা—তোমরা সব আন্‌চ, ঢাক্‌চ, রাখ্‌চ—আমায় দাসীর মত বা ক'র্‌তে ব'লচ, তাই ক'রচি—তোমাদের খরচখরচার যদি টানাটানি হয় তো আমি পোড়ামুখী কি ক'রবো—আর আমি সইতে পাল্‌লুম না। তাই এমাস চাল এত শীগ্‌গির ফুরল কেন, এই নিয়ে বকাবকি ক'চ্ছিল—আমি দেয়োরকে ঐ কথাটা ব'লে ফেলেছিনু ;—আমি তোমার কিসের মাঝে থাকি, খাটা খাটুনি ক'রবো না জিনিযের হিসেব রাখ্‌বো—তোকে ব'লবো কি মধু, ব'লতে গিয়ে কেমন হটাৎ চোখ ফেটে আমার জল এল—এই আমার দেয়োরেরবৌ বলে কিনা, তার ছেলেমেয়ের শাপ করবার জন্যে ঢং ক'রে কাঁদ্‌চি —

বলিতে বলিতে পান্থরমা চুপ করিল। সে আবার কাঁদিল, বলিল—অাচ্ছা তুই বল্‌তো মধু, দেয়োরের ছেলেরা কি আমার কেউ নয়, আমি তাদের শাপ ক'র্‌তে যাব কেন ? আমার শৌ-শাউড়ীর বংশ, আমি কি তাদের শাপ কর্‌তে পারি ?

পান্থর-মা চুপ করিল, মধোগাজীও একেবারে নীরব হইয়া দু'হাটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিল। এইরকম

ভাবে অনেক্ষণ কাটিয়া গেলে, মধোগাজী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোরে আজ খাতি দেছ্যাল?

মধোগাজীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পান্থর-মা কহিল—ওরে নারে মধু, আজ সমস্তদিন আমি একফোঁটা জল পর্য্যন্ত খেলুমনা, তবু কেউ একবার খাবার জন্যে একটিও রা' কাটলে না। সন্দেপর্য্যন্ত আঁচল বিচিয়ে শুয়েছিলুম, মনে করেছিলুম বুঝি কেউ খাবার জন্যে ডাকাডাকি ক'রবে—

বলিয়া পান্থর-মা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তোকে ব'লবো কি মধু, সেবচর আমার সেই কলেরা হয়ার পর থেকে, কেমন আর ক্ষিদে মোটে সহ্য ক'রতে পারি না—বড্ড কষ্ট হয়।

মধোগাজী আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর উঠিয়া গেল—কতকগুলি কলা, একটি বড় পেঁপিয়া আর একখানা ছোট বোঁটি আনিয়া পান্থর-মার হাতে দিয়া মধোগাজী কহিল—এইগুলো বনায়ে বনায়ে খা—আমি গরু দুয়ে দুধ এনেদি, আমার রাঙ্গির দুধ তুই যদি এক ঘটি খাস্ দিদি, তোরে আমি ঠিক্ ব'লতি পারি, তোর পেরাণ ঠাণ্ডা হ'ইয়ে যাবে।

বলিয়া মধোগাজী ঘটি হাতে লইয়া গাই দুহিতে গেল।

অল্পক্ষণমধ্যে দুধ লইয়া আসিয়া পান্থরমাকে খাইতে দিল। পান্থর-মা কলা আর পেঁপিয়া খাইয়া, ঠাণ্ডা কাঁচা দুধটুকু খাইয়া বলিল—আঃ, আমায় বাঁচালি ভাইরে। তুই যে আমায় কেন এতযত্ন করিস্ মধু, তার আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না—

পান্থরমার চ'খে জল আসিল। মধোগাজীরও চোখ-দুটো ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল; সে কহিল—দয়া যে সবারেই ক'র্‌তি হয় দিদি!

তৃতীয় চিত্র।

সহ্য, ক্ষমা আর দয়া, প্রকৃতির এই নিভৃতের-কথা কয়টি সারাজীবনের ওঠা-পড়ার অভিজ্ঞতাস্বরূপ মধো-গাজীর বুড়ো-বাপের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল—তাই তার এ ভুবনের একমাত্র অবলম্বন, কৃষাণীর সহিত প্রণয়ের প্রথমকার ফলটিকে, এই অসভ্য গ্রাম্য-কৃষক মরিবার সময় নিজের একমাত্র ধনদৌলত-স্বরূপ, এই কথা কয়টিই বার বার করিয়া বলিয়া যায়।—যাহাকে সে এই বিভিন্নতা-ভরা বিপুলজগতের কুমরচাকে আনিয়াছিল, যখন বুড়-কৃষক দেখিল, তাহাকে চিরদিনেরই মত এই ঘুর্ণিপাকে ফেলিয়া সরিয়া পড়িতে হইতেছে, তখন সে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় লাভকরা মন্ত্রটি শিখাইয়া গেল। কিন্তু মধোগাজী দেখিল, শুধু সহ্য করিয়াও এ ভুবনে নিস্তার নাই। অভিজ্ঞতা জিনিষটাও ভিন্নলোকের কাছে বিভিন্ন-মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। বৃদ্ধের দগ্ধমনে, সংসারের আশা-নিরাশা যে

সহ্য, ক্ষমা আর দয়া গুণের কারণ হইয়াছিল, মধোগাজীর কল্পনায় রঙিন তরুণ-যুবক-মনে কিন্তু সেই আশার-ক্ষোভ আর পীড়নের-লজ্জা, কেবলই নিজেকে মানুষের-দেওয়া যত দুঃখ সংতাপের হাত হইতে সবলে ছিঁনাইয়া মুক্ত করিবার জন্য গুমরিতে রহিল—তাই, তাহার পিতার জীবনের শেষ-আদর্শ শুধুই হাহাকারে শঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

যেদিন সমস্ত জায়গা-জমি, ইস্তক্ বসবাসের কুঁড়েখানি পর্য্যন্ত জমিদারের দেনারদায়ে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল, সেদিন মধোগাজী আবার নূতন করিয়া পিতার শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতার কবরের নিকট পড়িয়া, মধোগাজী কাঁদিয়া কহিয়া উঠিল—ওরে বাপ্, বাপ্রে! সহ্য কেম্নে করতি হয় বল্রে?—ঐ কুঁড়ের দাবায় আমি কত ভাত খেয়েছিরে—ঐ কুঁড়ের মধ্যি আমার বাপ্-মা যে মরে ছেল—আমি ঐ কুঁড়েতি মর্তিও কি পাব না গো!—মধোগাজীর সব গেল—শেষে একেবারে তার কপাল ভাঙ্গিল। মধোগাজীকে দেশও শেষ ছাড়িতে হইল। মধোগাজীর কুঁড়ের কাছে একটা অনেকদিনের বুড় তেঁতুল গাছ ছিল; সে গাছটা এত বুড়, যে গ্রামের অনেক প্রাচীনলোকেও বলিতে পারে না, গাছটা কতদিনের। একদিন সেই গাছেরকোল দিয়া মধোগাজী

সন্ধ্যাবেলা তার কোন প্রতিবেশীর বাড়ী যাইতেছে, এমন সময় পান্থর-মা ডাকিল—মধু! মধোগাজী দাঁড়াইল। পান্থর-মা কাছে আসিল। একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া পান্থর-মা কহিল,—ওরে মধু শুনেচিস্, সবাই ব'লচে—আমার চরিত্তি আর নাকি ভাল নেই, তাই শুনে দেয়োর আমায় আজ তিনদিন ঘরথে' দূরক'রে দিয়েচে—

বলিতে বলিতে পান্থর-মা গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল— তার কান্না দেখিয়া মনে হয়, এখনি বুঝিবা তার বুকটা ফাটিয়া যায়। সেই কান্নারবেগে পান্থর-মা আর দাঁড়াইতে পারিল না,— সেইখানেই উপু হইয়া বসিয়া পড়িল।

মধোগাজী কহিল—আরে চুপ কর্ দিদি, কি বলিস্ বুঝ্‌তি পারি না যে,—আরে চুপ কর্।

পান্থর-মা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কহিতে রহিল— তুই জানিস্ না মধু, তুই জানিস্‌না—এই নিচ্চের জন্যিই নাতি-ঝ্যাটা খেয়ে, আমার পোড়া-কোপাল নিয়ে, ঐখানে পড়েছিনু—আমায় সব বলে কিনা আমার চরিত্তি—

পান্থরমার কান্না আরো গুমরিয়া উঠিল; সে আবার কহিল—আমায় ব'লে দে মধু, আমার নিচ্চে গেল যদি, তো আমি আর কি নিয়ে রইব?

মধোগাজীর কুটীরে হামেসা ঘন-ঘন যাওয়া-আসা করারদরুণ প্রতিবেশীরা সকলেই একবাক্যে জাহির করিল, যে পান্থর-মার জাতি নাই—সে বিধর্ম্মি হইয়াছে। পান্থর-মার দেবর-পত্নী আরো কিছু বলিল, সে তার স্বামীকে বলিল—"মাগীর চরিত্রি মন্দ হ'য়েচে, ঘরে ঠাঁই দিলে ছেলে-পিলের অনাচার লাগ্‌বে।" সুতরাং পান্থর-মার দেবর একদিন দশের সাম্‌নে যারপরনায় জঘন্ন অপমানে পান্থরমাকে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত করিয়া, নিজের ছেলেদের কল্যাণ বজায় রাখিবার মানসে, ঘর হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিল। প্রতিবেশীর মধ্যে এই ভ্রষ্টা নারীকে আর কেহই ঘরে স্থান দিল না। মধোগাজী কিন্তু এইবার ক্ষেপিয়া উঠিল। সে সমস্ত শুনিয়া তার অসভ্য নিরক্ষর মনটাকে ক্রূর-সর্পের ফণার মত উঁচু করিয়া কহিল—আরে আবাগীর মেইয়ে, থাম্ থাম্,—তা তুই কাঁদিস্ কোন সরমে? আমি জমিদারের জুটো-পায়ে ধরি কইব—মা আমার অনেক দিন মরিচে, এ আবাগীর মেইয়ে আমার মা। ওঠ্ তুই, কাঁদিস্ কোন সরমে? শূয়োরদের ঘরগুল সব পুড়ায় দিতে পার্‌লিনি? আমি এখন ছিদাম-মুদির ঘরে বাসা ক'রিচি—তুইও থাক্‌বি চল্।

হিতে বিপরিত দাঁড়াইল। কেহই যাহাকে ঘৃণায় স্পর্শ

করিল না, তাহার প্রতি মধোগাজীর এহেন আত্মীয়তায় সকলের মনের কু-চিন্তা আরো বলবতী হইয়া উঠিল,—যাহারা এতদিন আড়ালে-আব্‌ডালে বলা-বলি করিতে ছিল, তারা আজ স্পষ্টভাবে জাহির করিল, সত্যই পাগ্গর-মা ভ্রষ্টা হইয়াছে। দেবর যে পাগ্গরমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়াছে, আর কেহই যে তাকে ঘরে স্থান দিল না, এসব কথাই একেবারে চাপা পড়িয়া গেল; সেই স্থানে দাঁড়াইল,—মাগীর এতই প্রবৃত্তির তাড়না,—সে সচ্ছন্দে দশের সম্মুখ দিয়া কু-কাজের সুবিধার জন্য গৃহের বাহির হইয়া গেল। শেষ একথা জমিদারেরও কানে উঠিল। জমিদার মধোগাজীকে তলপ করিয়া, কাছারীরমধ্যে তাহাকে জুতাশুদ্ধ-লাথি মারিয়া জানাইয়া দিল যে, তাহার জমিদারীর সীমানায় এরূপ ব্যাভিচার পোষাইবে না—সত্বর সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাক্। ইহাভিন্ন জমিদার দেশের প্রত্যেক প্রজাকে জানাইয়া দিল—"যে মধোকে তার ঘরে ঠাঁই দিবে, তাকে জমিদারের কাছে বিধিমত শাস্তি নিতে হবে।"

সেইদিন—কেবলই সেইদিন যুবক-মধোগাজীর হৃদয়ের সমস্ত রক্ত অসাধারণ উত্তাপে জ্বলিয়া উঠিল। সে স্পষ্ট জমিদারের মুখের উপরই সেদিন বলিয়াছিল, যে, তাহাকে কেহ ঘরে স্থান দিক্ বা না-দিক্ 'এদেশে সে আর থাকিবে

না। জমিদারকে সে বুঝাইয়া দিবে, যে ছোটরাভিন্ন বড় কখনই বড় হইতে পারে না,—পৃথিবীতে ছোট না থাকিলে, বড়দের কেহই চিনিত না। এইকথা বলিয়া জমিদারের লাথি খাইয়া, অপমান, পীড়ন আর কুৎসারবোঝা মাথায় করিয়া সে-দিনই মধোগাজী দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল—যাইবার সময় ভুলিয়া গেল, এই দেশেই তার মৃত-পিতার কবর এখনো রহিয়াছে। মধোগাজীর শান্তি কোথায়?—প্রাণে তার প্রতিহিংসা জ্বলিয়া উঠিল—যে-প্রাণকে, সে একদিন কলিজা হইতে বাহির করিতে চাহিত, কেবলই একটা প্রতিশোধের জন্য সে-প্রাণটাকে আজ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মধোগাজী উধাও হইয়া চলিল। স্বামী স্ত্রীকে পীড়ন করে, রাজা প্রজাকে পীড়ন করে, ভাই ভাইকে হেয় করে, শক্তিমান দুর্ব্বলকে নিজের অধিকার বুঝিতে দেয় না, মানুষ মানুষকে জব্দ করিতে চায়—মধোগাজী তবে কোথায় গিয়া শান্তি পাইবে?

মধোগাজী একটা ডাকাতের দলে গিয়া যোগ দিল। —সে এখন কেবলই মন্দ হইতে চায়; সে আগে মন্দকে ভয় করিত,—ভাল হওয়াই মধোগাজীর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখন সে ইচ্ছা করিয়াই মন্দ হইবে। তার যাকিছু ভাল, তাহা তো কেহই দেখিল না—তার ভালকেই সকলে

মন্দ বুঝিল ;—মধোগাজী এখন কেবলই প্রতিশোধ লইতে চায়। মধোগাজী ডাকাত হইল। সময় মধোগাজীকে অভিশাপ দিয়া, আপন-ছাঁচে ঢালিয়া, সময়ের ঠিক্ মানুষটি করিয়া নিল। মধোগাজী যখন ডাকাত হইল, তখন সকলেই তাহাকে মধো-ডাকাত বলিয়া ঘৃণায় মানুষ-সমাজের ঘোর শত্রুজ্ঞানে, তাহার শাস্তির জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল—কিন্তু কি কারণে বা কেন যে সে ডাকাত হইয়াছে, তাহা কেহই বিচার করিল না। বর্ত্তমান-ঘটনা আর নিজস্ব অভাব লইয়াই মানুষ বিচার করিতে ব্যস্ত ;—মানুষ যত সভ্য বলিয়াই নিজেকে প্রচারিত করুক্, প্রত্যেক কার্য্য-কারণটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া বিচার করিবার মত বুদ্ধিবৃত্তি এখনো তার হয় নাই—বিচার জিনিষটাও মানুষের কতকগুলি সময়োচিত নিয়ম-বিধানের মধ্যে নিষ্পেষিত করিয়া সীমাবদ্ধ।

দশে-চক্রে ভগবান ভূত—যখন দশজনে নিয়ত অজস্র-ভাবে বলিতে রহিল—পাম্বরমা ভ্রষ্টা, পাম্বরমা মন্দ, তখন এই সভ্যতার নাম-গন্ধহীন নিরক্ষর সরল বিধবারও মনে হইতে সুরু হইল—তবে সত্যই বুঝি সে মন্দ হইবে! —সত্য বুঝি তার ধর্ম্ম গেল, তার নিষ্ঠা গেল। পাম্বরমা জানিত, লাথি-ঝাঁটা খাইয়া তবু স্বামীর ভিটায় দেবরের

ভাতে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুল কাটাইতে পারিলেই তার নিষ্ঠা বজায় থাকিবে, স্বামীর প্রতি ভালবাসা অটুট রহিবে—অন্তেও তাহাকে আর যম-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না।—কিন্তু এখন পান্থর-মার একি হইল—তাহার সমস্তই যে হারাইয়া গেল! দশজনের সঙ্গে সুর মিলাইয়া পান্থরমাও নিজেকে আজকাল অবিশ্বাস করিতে রহিল—তাহার আত্মা কেবল হায় হায় করিয়া উঠিল। মধোগাজী যখন দেশ ছাড়িল, তখন পান্থরমার এই নিজের উপর অবিশ্বাসটা আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল,—আগে একটা লোক তাহার দলে থাকিয়া তাহাকে সাহস দিয়া বলিয়া দিত,—তাহার নিন্দা যায় নাই; এখন সেই মধোগাজীর আর সাহস বাণী নাই—এখন দশজনের জনমেটাই সর্ব্বদা সে শুনিতে লাগিল। দশজনের বিচার-বিহীন মন, আজ পান্থরমার সরল-মনকে জয় করিয়া, তাহাকে বিনা-দোষের অপরাধে বিমূঢ়ঃ করিয়া দিল।

পান্থরমা নিহাৎ নিঃসহায়ভাবে কাতরচক্ষে জগতের দিকে চাহিয়া রহিল। কেবলই একটি প্রশ্ন সে মানুষকে রহিয়া রহিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ওগো তবে সত্যই কি আমি ভ্রষ্টা—কেমন ক'রে, সেইটে কেবল বুঝিয়ে দাও?" কে বুঝাইবে?—আকাশ, ধরণী, হরিৎশস্যের

যৌবনভরা-ক্ষেতগুলি কেবল শিহরিয়া উঠিল—কোন উত্তরই আসিল না।

হটাৎ পান্থরমা কোথায় গেল? যে গেল, সেই কেবল নিজের কথা নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া, নীরবে সরিয়া গেল—কেহই তাহার কোন খবরই রাখিল না। রাত্রি প্রায় দুপোহর। চারিদিক অন্ধকার—সেদিন আর চাঁদ ওঠে নাই। সেই অন্ধকার চিরিয়া পান্থরমা জমিদারের তাল শ্বেত-পাথরে বাঁধানো পুকুরঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যহ বিকাল-বেলা এই পুকুরঘাটেই জমিদার নিজের বন্ধুদের লইয়া গান বাজনা করে—তাই এইস্থানটি বড় সুন্দর কারুকার্য্যে সজ্জিত। এই সবে ক্ষাণিক্ষণ জমিদারের প্রমত্তসঙ্গীত আর আমোদ-স্রোত নীরব হইয়াছে। এখন চারিদিক তাই এত বেশী নীরব, অন্ধকার তাই এত বেশী ঘণ, দিঘীর ঘাট তাই এত ফাঁকা ফাঁকা;—মনে হয় যেনবা, এই পাথর-বাঁধানো ঘাটেরও একটা প্রাণ আছে; তাই যেন রাক্ষসের মত মুখব্যাদন করিয়া গিলিতে আসিতেছে।

পান্থরমা আস্তে আস্তে সেই দিঘীর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুরের বাগান হইতে হ'স্নুহানার পাগল-গন্ধ আসিয়া তাহার নাক স্পর্শ করিল; পান্থরমা মুখ শিঁট্‌কাইল—এগন্ধ ভাল কি মন্দ, যেন তার বোধে আসিল

না। পান্থরমা দিঘীর জলে পা ডুবাইয়া সিঁড়ীর উপর বসিল। গভীর অন্ধকারে কোন-কিছুতেই পান্থরমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল না। সে দিঘীর জলের পানে চাহিল। বাতাসে জলটা আস্তে আস্তে দুলিতেছে—আকাশের তারাগুলি সব সেই দিঘীর জলে ফুটিয়া, জলের সঙ্গে নাচিতেছে। পান্থরমা বেশ স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি মন্দ?" কোথা হইতে যেন উত্তর আসিল—না, না, না। পান্থরমা বিপুল ভাবে চম্‌কিয়া শিহরিয়া উঠিল—চারিদিকে চাহিল; আবার তার সব গুলাইয়া গেল।—সে কাঁদিয়া উঠিল। আবার যেন কে কহিল—তবে মর্। মরনই ভাল। পান্থরমা কহিল—যদি আমি মন্দ, তবে আর কি নিয়ে থাক্‌ব? আমায় বুঝিয়ে দাও—বুঝিয়ে দাও।—হঠাৎ দিঘীর জল বিপুল-আন্দোলনে আলোড়িত হইয়া উঠিল, তারাগুলি মুহূর্ত্তের জন্য সব যেন ঢাকা পড়িয়া গেল। পান্থরমা কোথায় গেল? একটা পেঁচক কেবল কর্কশ-শব্দে ডাকিয়া উড়িয়া গেল—একদল বড়ইঁদুর ভয়ে কিচ্-কিচ্ শব্দ করিয়া উঠিল। এ সংসারের ঘৃণ্য-ভয়ের পীড়িত-কবল হইতে অব্যাহতি লইতে, পান্থরমা কোথায় পলাইয়া গেল?

তারপর আর কেহই পান্থরমাকে জগতে দেখিতে পাইল না। তারপর দিন হইতে সন্ধ্যা বেলা, যখন ফুলের

রাশি ছড়াইয়া গানবাজনার বিপুল-কলস্রোতে ঐ দিঘীর ঘাটে জমিদারের মজ্‌লিস বসিত, তখন জমিদারের প্রত্যেক বন্ধুই বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন, কে যেন তাঁহাদের গান-বাজনার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া, বড় করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"আমায় বুঝিয়ে দাও,—ওগো, কে আমায় বুঝিয়ে দেবে?

চতুর্থ চিত্র।

অ-শিক্ষিত মধোগাজী শিক্ষার অভাবে সবকথা গুছাইয়া বলিতে পারে না—তার প্রাণের কথা প্রাণেই মিলাইয়া যায়। মধোগাজী যদি শিক্ষিত হইত, তবে সে বলিত যে, একটা কোথাকার অবুঝ-ভালবাসাই তাহাকে এহেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। যদিও মধোগাজী সকলের সংস্রব ছাড়িয়া দেশ ত্যাগী হইল - তবু পান্নরমার কথা সে ভুলিতে পারিল না। মধোগাজী মনে ভাবিল, যে কোনরকমে দশের উপর প্রতিশোধ লইতে পারিলেই, সে পান্নরমাকে দৃঢ় করিয়া বুঝাইতে পারিবে—তার নিষ্ঠা যায় নাই।

মধোগাজী যে-ডাকাতের দলে আসিয়া যোগ দিল, সেই ডাকাত-দলের সর্দ্দারের এক কন্যা ছিল. তার নাম শিবানী। জনহীন-বনের ভিতর শিবানী জন্ম নিয়াছে, শ্বাপদ-শকুল গভীর বনানির নির্জনতায়, গাছপালার সহিত বাড়িয়া বাড়িয়া শিবানী আজ যুবতী হইয়াছে। শিবানী ডাকাতের মেয়ে,

সে নিজেকেও একজন পুরো ডাকাত করিয়া গড়িতে চায়।—যেন শিবানীর ভূমিষ্ট হইবার দিনে, এই বনের কোন বাঘিনী আসিয়া তাকে মাই দিয়া বড় করিয়াছিল। শিবানীর এখন পূর্ণযৌবন, এখন হইতেই এক একদিন বাপের দলের সঙ্গে শিবানী ডাকাতি করিতে বাহির হয়। জন্মাবধি চারিপাশের আবেষ্টনের চঞ্চল ঢেউয়ে, শিবানীর নারী-প্রকৃতির সমস্ত মাধুর্য্যময়-শোভারাশি একেবারে লুকাইয়া পুরুষ-প্রকৃতির হিংস্র-উচ্চাকাঙ্ক্ষার পঙ্কিলতায় তলাইয়া গেল।

এই ডাকাতের দলে আসিয়া মধোগাজীর একটা উপকার হইয়াছে --মধোগাজীর ভাষাটা একটু পরিমার্জিত হইয়া উঠিয়াছে।—সে নিজের প্রাণের কথা অনেকটা গুছাইয়া বলিতে শিখিয়াছে। সেদিন মধোগাজী শিবানীকে কহিল—তুমি এমন ডাকাত সাজ, সে আমার ভাল ঠেকে না।—নেই গেলে তুমি ডাকাতি করৃতি।

শিবানী হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—সে কি বলিস্‌রে!—ডাকাতিতে আমি যাব না?—বাবা যদি আজ মরে যায়—দেখ্‌বি, আমিই তখন সর্দ্দার হব; সবাইকে বুঝিয়ে দেব, যে বাবারও বাবা আছে।

মধোগাজী প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল · না দিদি,

তুমি দেখ্‌তি এমন সুন্দর, তা কি হয়? কিইবা তোমার চুল—তুমি যখন পিছুন ফিরে দাঁড়াও দিদি, আমার মনে লাগে—হেঁদুরের যেন একখানি পিঁর্‌তিমে কে গড়ি তুলেচে।

শিবানী আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল—তোমায় একদিন শেষে ঘুমোবার সময়, কিন্তু কেটেরেখে দেব মধু!

বলিয়া শিবানী সেদিন নাচিতে নাচিতে বনের অন্ত প্রান্তে চলিয়া গেল। ঐযে বনের অদূরে একটি পাহাড় রহিয়াছে, যে-পাহাড়ের সারাঅঙ্গটি ঝরণার জল আর রৌদ্রের সম্মিলনে ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে, ঐ পাহাড়ের পাদদেশটি শিবানীর বেড়াইবার বড় প্রিয়স্থান। শিবানী পুরুষের মত মাল-কোঁচা দিয়া কাপড় পরে, পুরুষদের সহিত যত রকম ব্যায়াম আছে, সবই শিক্ষা করে—পিতার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার-সূত্রে এই ডাকাতদলের নেতা হইয়া, এতগুল পুরুষের উপর আধিপত্য করাই, তার জীবনের একমাত্র আদর্শ। অবকাশকালে শিবানী এই পাহাড়ের পাদদেশেই আসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সুন্দর বিবিধ-রঙের পাথর খণ্ডগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কুড়াইয়া, নিজের ঘরে জড় করা একটা তার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেছে; এই

পাথরের লোভেই শিবানী হেথায় এত ছুটিয়া আসে। কিন্তু কেন যে পাথর খোঁজে, কেন যে পাথরগুলি তার এত ভাল লাগে, আবার কেনইবা এই পাথরগুলিকে একটা সম্পদের মত এত যত্ন করিয়া সে ঘরে রাখিয়া দেয়, তাহা বনের এই ক্ষিপ্ত-যুবতী জানে না—বুঝে না।

সেদিন পাথর কুড়াইতে কুড়াইতে শিবানী ঝরণার-কূলে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন সবেমাত্র সকাল হইয়াছে —গলিত রূপার মত ঝরণার জলটা নাচিতেছে। সেই ঝরণার জলের পানে শিবানী চাহিল,—দেখিল সেইজলে নিজের সারাঅঙ্গের ছায়াটা ভাসিয়া উঠিয়াছে। হটাৎ শিবানীর মনে পড়িয়া গেল—"তুমি দেখ্‌তি এমন সুন্দর, তা কি হয়? হেঁদুদের যেন একখানি পিরতিমে কে গড়ি তুলিচে" শিবানীর আবার আজ হাঁসি পাইল। কিন্তু তার মনে হইল—কি এমন মধু দেখেচে, আমি একবার ঠাহর ক'রে দেখি; ভাবিয়া সেই জলে নিজের ছায়াটিকে ভাল করিয়া নিখুঁতভাবে শিবানী দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হটাৎ শিবানীর কেমন লজ্জা হইতে লাগিল— শিবাণী আস্‌তে আস্‌তে সেখান হইতে সরিয়া গেল। শিবানীর দ্রুতগতি, চলনের যত ক্ষিপ্রতা সব যেন কোথায় লুকাইয়া পড়িল, সে কেবল আস্‌তে আস্‌তে গভীর অন্যমনস্ক-

ভাবে ঝরণা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; সেথায় আর দাঁড়াইতে পারিল না।

শিবানীর পিতা কোন একটি ক্ষুদ্রদলের নেতা করিয়া সে-দিন শিবানীকে এক দূরদেশে ডাকাতি করিতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিল—ডাকাতির জন্য বাহির হইবার দিনও স্থির হইল। পিতার নিকট হইতে শিবানীর ডাক আসিল। শিবানী গেল না। দস্যুসর্দ্দার মধোগাজীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইল। শিবানী উত্তর দিয়া, বলিয়া দিল—মধু, বাবাকে বলগে,—আমি আর ডাকাতি করতে যাব না।

মধোগাজীর প্রাণ কেমন নাচিয়া উঠিল; তবু সে বিস্মিত-ভাবে কহিল—কেন দিদি?

শিবানী ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল—কি জানি মধু, ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।—তবে ডাকাতি ক'রতে যাব মনে হ'লেই, পা'ছুটো কেবলই আজ কেমন বড় কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ছে।

মধোগাজী কেমন একরকম হইয়া গেল। সে একগাল হাসিয়া, তাড়াতাড়ি শিবানীর হাতদুটো ধরিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল—মণি, মণি, তোমায় আমি এই পেরানটার মত ভালবাস্‌বো!

শিবানী হিংস্র-জন্তুর মত চোকদুটো পাকাইয়া উঠিল—

৩

কিন্তু মুখে সে আজ কিছুই বলিতে পারিল না; তার কে যেন মুখ চাপিয়া ধরিল। শিবানী আস্তে আস্তে ঘাড় হেঁট করিল।

মেয়ের যে হঠাৎ কি হইল, তাহা দস্যুসর্দ্দার কিছুই বুঝিতে পারিল না; সে নিজে আসিয়া শিবানীর সাম্নে দাঁড়াইয়া, ডাকিল—শিবানি!

শিবানীর দেহের সমস্ত রক্ত যেন বরফের মত হিম হইয়া গেল—সে অপরাধীর মত বাপের মুখের উপর চোখ তুলিল। দস্যুসর্দ্দার দেখিল, তাহার কন্যা হঠাৎ স্ত্রীলোকের-মত কাপড় পরিতে শিখিয়াছে; বাপকে দেখিয়া শিবানী লজ্জায় একেবারে জড়সড় হইয়া গেল—তাহার দৃষ্টি একটা আবেশের-শিথিলতায় ভীরু হইয়া পড়িল। দস্যুসর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল—শিবানি, তোমায় এমন ক'রে কাপড়-প'রতে, কে শেখালে?

শিবানী নীরব। দস্যুসর্দ্দার ধমক্-দিয়া আবার কহিল—সত্য কথা বল শিবানি: এরকম কাপড়-পরা, কোথা থেকে শিখ্‌লে?

শিবানী একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল; দুই হাতে করিয়া বাপকে জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—বাবা, বাবা, কে শেখালে তা তো জানিনা বাবা—তবে, এমনি

ক'রে কাপড়-প'রলে, আমায় যে ভালদেখায় বাবা! মেয়ের পানে চাহিয়া, দস্যুসর্দ্দার সেদিন কেবল গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ভবিষ্যতের অনেক আশাই তার নষ্ট হইয়া গেল।

মধোগাজী কিন্তু তার জীবনের প্রতিশোধ লইবার কথা ভুলে নাই। সর্দ্দারকে বলিয়া-কহিয়া মধোগাজী একদিন জমিদারের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার অনুমতি পাইল—জীবনের সমস্ত-পীড়নের প্রতিশোধ এইবার তুলিবে, এই কল্পনায় মধোগাজীর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। শিবানী সেদিন মধোগাজীকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যা মধু, আজ তোমার এত আনন্দ দেখ্‌চি কেন মধু?—আমাদের দলকে ধরবার জন্যে চারিদিকে গ্রেপ্তারি বেরিয়েচে, আর তোমার আজ এত আনন্দ কিসের মধু!—

মধোগাজী হাসিয়া উত্তর করিল—আহা দিদি, সে কথা বুঝ্‌লিনি?—আজই যে আমরা জমিদারের বাড়ী হাজীর গাড়বো—সব-বিটাকে দেখিয়ে দিব, যে দিদির আমার, নিষ্টে যায় নি।

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল—কে তোমার দিদি মধু।

মধোগাজী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—আহা, সে কথা জাননি?—আমার দিদি গো, সেই সাঁঝ্-সকালি চাঁদ যখন

উঠে হাঁস্‌তি থাক্‌তো, আমরা দু'জনে দাবায় ব'সে কত কান্না কেঁদেচি—কখনো দিদি কথা ব'ললিই আমি কেঁদে মরি, আবার আমি কথা ব'ললি, দিদি কেঁদে মুখ-রাঙা ক'রি দেয়।

শিবানী আবার জিজ্ঞাসা করিল—তাকে তুমি খুব ভালবাস্‌তে, না মধু?—আচ্ছা, আমার চেয়েও কি তারে ভালবাস্‌তে?—

মধোগাজী হত-ভম্ব হইয়া গেল। শিবানী ভালবাসার কথা তো এর আগে একদিনও বলে নাই—সুতরাং মধোগাজী ঘুরাইয়া শিবানীকেই জিজ্ঞাসা করিল—আমি কি তোমায় ভালবাসি?

শিবানী কথার কোন উত্তর দিল না; আগুয়ান হইয়া চলিল। সন্ধ্যা বেশ ঘন হইয়া আসিল। দু'জনে ঘুরিতে ঘুরিতে পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধোগাজী কহিল—দিদি, সন্ধ্যে এল, চল্‌ আড্ডায় ফিরি,—আজ আর দেরী কর্‌লি হবে না।

শিবানী হঠাৎ পিছ্‌ন ফিরিয়া মধোগাজীর হাতদুটো ধরিয়া, কহিল—না মধু, জমিদারের বাড়ী ডাকাতি ক'রতে তুমি পাবে না।

মধোগাজী হাত ছাড়াইয়া, একটু সরিয়া আসিয়া কহিল—সে কি বলিস্‌ দিদি!

শিবানী নিজের বড়-বড় চোখদুটো মধোগাজীর চোখের উপর নিবদ্ধ করিয়া ডাকিল—মধু, মধু, ভুলে গেলে ? কিন্তু সেদিন আমি যা ঝর্ণার জলে দেখেছি, তা তো আজও ভুল্‌তে পারিনি ভাই,—সেদিন থেকে আমি সব ছেড়েছি।—ডাকাতির নাম শুন্‌লে, আমার লজ্জা হয়—ভয় হয়। মধু, মধু, কিন্তু তুমি তোমার বাপ্‌কে একেবারেই ভুলে গেলে!

মধোগাজীর বুকটা ধড়্‌-ফড়্‌ করিয়া উঠিল; সে ছুটিয়া গিয়া শিবানীর হাত ধরিয়া কহিল—ভুলিনি, ভুলিনি দিদি, বাপ্‌ আমার কেঁদে-কেঁদে মরেচে—তবু সুখের সে এক-দিনও পায়নি!

শিবানী আবার কহিল—বোধ হয় সে একটু সুখ পেয়েছিল মধু।—মধু, তুমিই তো আমার কাছে গল্প ক'রেচ—তোমার বাপ্‌ কেবল একটি কথা তোমায় দিয়ে গেছে; কেবল যত্ন ক'রে সেই কথাটাই পালন ক'রতে তোমায় যত বলা সব ব'লে গেছে। কিন্তু কৈ, ক্ষমা তো তোমার করা হ'ল না—সহ্যের বাঁধও তো তোমার ভেঙ্গে গেছে মধু!

মধোগাজী কাঁদিয়া শিবানীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, সে যে আর পারা যায় না, ওগো, আর যে পারা যায় না।—বেদ্‌না যে দিন দিন কেবলই বাড়্‌তি লাগে।

শিবানী মাথাটা উঁচু করিয়া গলাটা রাজহাঁসের মত

বাড়াইয়া, চড়া-সুরে কহিল—বাড়ুক্ বেদনা।—মধু, বেদনা বাড়বে ব'লে কি, তুমি শাস্তিকে নেবেনা? একবার বেশ অন্তরের ভেতর খুঁজে দেখ দেখি মধু, এই প্রতিশোধ নিয়ে অন্তরে তুমি কতটা শাস্তি পাবে?—বরং, আবার যখন তুমি এই জমিদারকে ধনে-মানে শক্তিমান হ'য়ে উঠ্‌তে দেখ্‌বে, তখনই আবার প্রতিহিংসা তোমার মন অশান্ত ক'রে তুল্‌বে—তখন কি তুমি আবার তার পিছনে ছুট্‌বে? তুমিও তো তোমার বাপের মত একদিন বুড়ো হ'য়ে প'ড়বে মধু! কিন্তু তাকে যদি ক্ষমা কর, তাহ'লে দেখ্‌বে—কেবলই ক্ষমা ক'রতে পেরেচ জেনে, তুমি অসীম আনন্দ পাবে—তোমার বাপেরও মুখ-রক্ষা হবে। যে-পীড়নের চাপে তুমি অধীর হ'য়ে পালিয়ে এসেচ মধু, তুমিই তো আবার সেই পীড়নই আর একজনকে ক'রতে ছুটচ—এই কি তোমার পীড়নের উপর বীৎরাগ! যে-আঘাতে নিজে ব্যথা পাও মধু, একবার ভাব দেখি, সেই আঘাত অপরকে তুমি কেমন ক'রে দেবে?

মধোগাজীর চোখের সম্মুখে সমস্ত অন্ধকার হইয়া আসিল—তার পা'দুটো ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শিবানী আবার কহিল—মধু, মধু, ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! দয়া কর—তোমার বাপ সত্যই ব'লে গেছে, তুমি নিশ্চয় শান্তি

পাবে।—আমার নিজের একটা কথা বলি শোন মধু,—বলবানকে আমার আসলে ভয় হয় না; কিন্তু দুর্ব্বল দেখ্‌লে আমি শিউরে উঠি—মধু, মধু, মানুষের অশান্তির জন্যে মানুষই কেবল দায়ী—আমরা একজন অশান্ত হ'য়ে, দশজনের অশান্তি ডেকে আনি। দীন-দুঃখী আমরা, এই রকম চুপ্‌ ক'রে সংসার হ'তে সরে যাওয়াই ভাল মধু,—তোমার বাপের ওপর যে-মমতা, সেটা কেন ছাড়্‌বে! তাই আমি বল্‌চি, আজ কিছুতেই তোমায় ডাকাতি ক'রতে ছাড়্‌ব না—তোমায় ক্ষমা ক'র্‌তে হবে—অশান্তির ওপর আরো নতুন-অশান্তি জাগিয়ে তুল্‌তে তুমি পাবে না।

মধোগাজী বিপুলভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখ ঠুকিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সেই নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে মধোগাজীর সারাজীবনের বেদনা, আবার প্রবল-মত্ততায় হাহাকার করিয়া উঠিল। প্রতিশোধ লইতেও তাহার আর হাত উঠিল না; নিপীড়িত-জীবনের যতকান্না, চিরদিনের জন্য একখানি মর্ম্মান্তিক ইতিহাসের মত, সেই পাহাড়ের পাদদেশে অ-শিক্ষিত দীন-মধোগাজীর সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ-বুকখানায় কেবলই জাঁতার মত চাপিয়া রহিল।

প্রেমেই মানুষ অমর।

দ্বিতীয় কাহিনী।

প্রেমেই মানুষ অমর।

প্রথম চিত্র।

ঐ, যে-কুটীরখানির চালের উপর কৃষ্ণচূড়া-গাছটা হেলিয়া, বেবাক লাল-ফুলেররাশি স্তূপাকার করিয়াছে, ঐ কুটীরেই গুখন জেলের বাসা। গুখনের স্ত্রী আছে, তার নাম রুক্মিণী। রুক্মিণী গুখনের তৃতীয়-পক্ষের বিবাহ, তাই গুখন যখন একেবারে বুড়, রুক্মিণী তখন বেশ শক্ত-সুডৌল পূর্ণ-যুবতী। তবু তারা বড়ই সুখে ছিল। রুক্মিণী তার নিজের যৌবনের আভায়, বুড়-গুখনকে রঙ্গিন করিয়া তাহাকে যুবকের মতনই দেখিত। যখন গুখন একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িল,—যখন দাবার উপর ছেঁড়ামাদুরে বসিয়া, কেবল হাঁপান আর খক্-খক্ করিয়া কাশাই তার সবকাজের কাজ হইল, তখনও রুক্মিণী তাহাকে যুবকই

দেখিত। মেয়ে-মানুষকে পুরুষ প্রতিপালন করিবে—এ কথার উত্তরে রুক্মিণী মনে-মনে বলিত—তা নয়, পুরুষকে ঠাকুরের মতন বসাইয়া, তাকে প্রতিপালনকরাই মেয়ে-লোকের ধর্ম্ম—তাই শুখন বুড় হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে বলিয়াই যে, মাছেরঝুড়ি মাথায় করিয়া রুক্মিণীকে বাজারে মাছ বেচিতে যাইতে হয়, তাহা সে ভুলিয়া গেল। ভোরের আলোতে যেমন হাঁসিমুখে রুক্মিণী বাজারে যাইত, ঠিক তেমনি হাঁসিমুখে, সে আবার দুপুরের-রৌদ্রে, তার প্রাণ-ঢালা আদরের কুটীরখানিতে ফিরিয়া আসিত। সর্ব্বদাই তাহাদের কুটীরখানি পরিচ্ছন্নতায় ঝক্-ঝক্ করিত; কোন-কালে কুটীরের কোথাও ময়লা জমিয়া, অপরিষ্কার জড়ো করিতে পারিত না—কুঁড়েখানির প্রত্যেক ফাটায়, তার প্রত্যেক ধুলিবিন্দুর উপর পর্য্যন্ত, এমনই রুক্মিনীর বিশাল-দৃষ্টি ছিল। ভগবানের ভক্তিতে মানুষের দেহ যেমন সুন্দরতায় সদা উজ্জ্বল থাকে, রুক্মিণীর হৃদয়খানি লইয়া কুঁড়েটীও, বড় সরল শোভায় বিভাসিত থাকিত। রুক্মিণীর একটী ছেলে আর একটী মেয়ে। প্রায়ই দেখা যায়, সকলের ছোট যে-সন্তান তারই উপর জননীর টান বেশী হয়—কিন্তু রুক্মিণীর তাহা ছিল না; রুক্মিণীর ছেলের মুখখানি একেবারে বজায় শুখনের মত ছিল—তাই রুক্মিণী কোলের কচি-মেয়ের

অপেক্ষা, ছেলেকে বেশী ভালবাসিত। রুক্মিণীর ছেলের নাম যাদু।

যাদু পাঠশালে যায়। রুক্মিণী এখন থেকেই হাতে টাকা রাখে, দুই একখানা খুব রঙিন কাপড় কেনে, দুই-এক ভরি করিয়া রূপা কিনিয়া বাক্সে রাখে,—আর মনে মনে বলে, যাদুর-বৌ যখন আসিয়া এগুলি পরিয়া কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন কেমন দেখাইবে,—এইসব চিন্তা করিয়া রুক্মিণী বড় সুখী হয় আর আনন্দ পায়। মৃত্যুকে সে একেবারেই অস্বীকার করিল ; এই-বুড়কে লইয়া, এই আনন্দেই সে শুধু বাঁচিতে চায়।

দিনে রুক্মিণী খুব পরিশ্রম করিত ; সুতরাং রাত্রে যখন সে যাদুর একটা হাত নিজের স্তনের উপর রাখিয়া, আর আপনার একটি হাত দিয়া যাদুকে একেবারে একটা দেহেরই মতন বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া, সে শুইত—তখন আর নিদ্রার জন্য তাহাকে কোনদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না। দিনের প্রচুর পরিশ্রম, রাত্রে তাহাকে গভীর নিদ্রা আনিয়া দিয়া, পরদিন ভোরের-বেলা জীবনটাকে তার একখানা স্নিগ্ধ-বিমল-চিন্তার মত জাগাইয়া তুলিত। কোন দিন তাহার কোন অসুখ করে নাই। পীড়া আর শরীরের অসুস্থতা যে কেমন,রুক্মিণী তাহা জানে না—কেননা, সে বেশ

জানিত, অসুখ করিলে তার চলিবে না। গুখনের কে সেবা করিবে, যাদুকে কে আদর করিবে, কচি-মেয়েটাকে কে মাই দিবে! অসুখ আবার কি? রুক্মিণীর ধারণা, যাহাদের কেহ নাই, তাহাদেরই অসুখ করে—পীড়া হয়। রুক্মিণী যাদুর বালাই লইয়া মরুক্‌, রুক্মিণীর পীড়া হইবে কেন!

রুক্মিণী গ্রামের জমিদারকে বড় ভক্তি করিত। যদিও অনেক-দিন পূর্ব্বে খাজনার জন্য, জমিদার একদিন গুখনকে অসহ্য প্রহার করিয়া তিনদিন এক ছোটঘরে আটক করিয়া রাখিয়াছিল,—যদিও রুক্মিণীর অনেক-ক্রন্দন জমিদার সেদিন অগ্রাহ্য করিয়াছিল,—উপরন্তু জমিদারের কর্ম্মচারীর বিপুল লজ্জাকর গালাগালি শুনিয়া, যদিও রুক্মিণীকে সেদিন কাঁদিতে কাঁদিতে, লজ্জায় অভিমানে সেই কপালগুণের স্রষ্টাকেই কেবল ভৎর্সনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল—তবু জমিদারকে রুক্মিণী ভক্তির চক্ষেই দেখিত। রুক্মিণীর ধারণা, ভগবান জমিদারকে জমিদার করিয়া, আর রুক্মিণীদের তারই প্রজা করিয়া পাঠাইয়াছে। রুক্মিণী জানে, ভগবানই রুক্মিণীকে ভক্তি করিতে পাঠাইয়াছে, আর জমিদারকে শাসন করিতে পাঠাইয়াছে;—রুক্মিণীর ভক্তি-করাই যেন কর্ত্তব্য। আর রুক্মিণী বলিত, জমিদার শাসন

করিবে না তো করিবে কে! যাহারা ছোটলোক, প্রহারে তাদের লজ্জা কি? গালি খাইয়া অভিমান করিলে চলিবে কেন —সবই ত ভগবানের খেলা!—তাই জমিদারের খাজনা আর পড়িয়া থাকে না। না-খাইয়া একদিন চলিতে পারে, কিন্তু খাজনা একদিন না-দিয়া কেমনে চলিবে—কেননা খাজনা দিতেই যে ভগবান রুক্মিণীকে পাঠাইয়াছে। ভগবানকে হেলা করিয়া, রুক্মিনী তার যাদুর আর খুকীর অকল্যাণ করিতে চায় না।

ঠাকুর-দেবতার উপর রুক্মিণীর ভক্তির অবধি ছিল না। দেবালয় সম্মুখে দেখিলেই, রুক্মিণী একেবারে গড় হইয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিত। আস্‌তে আস্‌তে মাথা মাটীতে ঠেকাইতে ঠেকাইতে রুক্মিণী কেবলই বর মাগিত —আমার যাদুকে বাঁচিয়ে রাখ, আমার সোয়ামীকে বাঁচিয়ে রাখ, আমার খুকীকে বাঁচিয়ে রাখ—আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আরকিছুই রুক্মিণী চাহিত না। উঠিয়া ফিরিবার সময় খুব মনে-মনে, যেন নিজেরও অগোচরে রুক্মিণী বলিত—আর খাজনাটা যেন ঠিক্ সময়ে দিতে পারি। ছোটলোক হইলেও, নিজেকে খুব ছোট জানিলেও তবু অপমানিত হইলে, রুক্মিণীর কোথায় যেন গভীর ব্যথাই বাজিত—কে একেবারে শুখাইয়া মরিয়া যাইত।

রুক্মিণী ছেলে-মেয়েকে কখনো প্রহার করিত না। রুক্মিণী কখনো তাহাদের গালি দিত না। বুড়ো-শুখন, সেও এক কচিছেলের মতন রুক্মিণীর উপর অত্যাচার করিত, তাহাতে রুক্মিণী কোনদিন-ক্লান্তি বোধ করিত না; বরং বুক তার এক নূতন-রসে ভরিয়াই উঠিত। শুখনের উপর তারদরুণ রুক্মিণীর এক গভীর আকর্ষণ পড়িয়া যাইত। তবে, শুখন যখন অযথা মুখ-ছোট করিয়া তাহাকে গালি পাড়িত, তখন রুক্মিণী কেবল বলিত—ছোটলোক ব'লে ভদ্রলোকে ঘৃণা-করে, সেটা বুঝি শুখনের ভাল লাগে। রুক্মিণী সব সহ্য করিতে পারিত; কিন্তু ছোটলোক বলিয়া কেহ ঘৃণা করিলে তাহার বড়ই ব্যথা লাগিত। তাই রুক্মিণী সর্ব্বদাই মনে-প্রাণে ভাল হইবার চেষ্টা করিত। খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বেশভুষায় সজ্জিত বাবুকে দেখিলে, রুক্মিণী অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। রুক্মিণীর চোখে ভদ্রলোকেরা বড় মহা-রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইত—কিন্তু কোন্-রহস্য যে তাহাদের এহেন সভ্য ও ভদ্র করিয়াছে, তাহা রুক্মিণী কিছুই বুঝিতে পারিত না।

সেদিন যাদু পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়া, মাকে ভাত দিতে বলিয়া পুকুরে হাত-পা ধুইতে গেল। রুক্মিণী ভাত বাড়িয়া বসিয়া রহিল, যাদু তখনও খাইতে আসিল না। দাবা

হইতে রুক্মিণী চীৎকার করিল, তবু কোনমাত্রই সেদিন তার মায়ের ডাকে, বাড়া-ভাত খাইয়া, ছড়াইয়া, বিবিধ অত্যাচারের আব্দার করিয়া, রুক্মিণীকে সুখী করিতে আসিল না। কোন প্রতিবেশী আসিয়া রুক্মিণীকে খবর দিল—যাদু জলে ডুবিয়া গেছে। রুক্মিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে পুকুরের দিকে ছুটিল!—ভাত তেমনই পড়িয়া রহিল।

———

দ্বিতীয় চিত্র।

শুধুই "যাদু! আমার যাদুরে—!" বলিয়া পুকুরের ঘাটে পড়িয়া, কান্নার সঙ্গে সেদিন রুক্মিণী যাদুকে যে রকম তার বুকেরই ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিয়াছিল, তখন যাদুকে যদি কেহ জল হইতে খুঁজিয়া তুলিতে পারিত, তাহা হইলে মৃত্যু'ও বোধ হয় লজ্জার-সঙ্কোচে যাদুকে আবার বাঁচাইয়া দিত—কিন্তু তার তিনদিন পরে, মৃত্যুদেহ পুকুরে ভাসিয়া উঠিল। সেদিন রুক্মিণীর চীৎকার, কেবল খণ্ড পাতলা-মেঘের মত উড়িয়া উড়িয়া, আকাশের গায়ে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। চীৎকার করিয়া রুক্মিণীর গলা-ভাঙ্গিয়া গেল—সেদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া, রুক্মিণী কেবলই গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল। তবু কোন যাদুই সেরাতে তার স্তনে হাত দিয়া, কই শুইল না।

ছয়মাস পরে শুখনও মরিল। রুক্মিণীর এখন কেবল খুকিই রহিল। রুক্মিণীর রং বেশ ফরসা ছিল; শুখন মরিবার

পর দিনে-দিনে তার মুখখানা ঠিক্ ঝুলেরই মতন কালো হইয়া গেল। কুঁড়েখানির যত জঞ্জাল, উঠানে আসিয়া জমা হইল। বর্ষার দিনে ঘরে জল পড়িতে লাগিল। ঘরে ঝুল পড়িল। চালের ফাটলে তক্ষকসাপে বাসা করিয়া, রোজই সন্ধ্যাবেলা ডাকিতে সুরু করিল—সেডাক রুক্মিণীকেই যেন উপহাস করিত। কোনদিন রাত্রে ঘরে বিছা বাহির হইত। গরমের দিনে আরশুলা উড়িয়া বড়ই উত্যক্ত করিত। রুক্মিণীর কপাল একেবারে ভাঙ্গিয়াছে। শেষে খুকিও জ্বরে পড়িল, মোটে সাতদিন ভুগিল—তারপর আট দিনের দিন, রুক্মিণীকে এইবার একেবারেই একা ফেলিয়া, দিন-শেষের সূর্যের মত হঠাৎ কোন্‌মেঘের অজানা গভীরতায় ডুব মারিল। রুক্মিণীর দিন ফুরাইল। খুকির বেলায় রুক্মিণী আর তত কাঁদিল না। সে কেবলই সন্ধ্যার আঁধারের দিকে নীরবে চাহিয়া—শুধুই চাহিয়া রহিল।

জগত রুক্মিণীর নিকট এখন একটা বিপুল জ্বালাময় তীব্রতায় পরিণত হইল। তাই এখন রুক্মিণীর কেবলই চিন্তা—কি করিলে জগত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়! জীবন রুক্মিণীর নিকট প্রসূতির প্রসব-বেদনার মত অসহ্য যন্ত্রণাভরা, তবু সারাজীবনের ইচ্ছার মধুরতায় রঙ্গিন, এক

বীভৎস-সৌন্দর্য্যের অসহ্য-উপহাস বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাই এখন রুক্মিণী কখন কখন আত্ম-হত্যা করিবারও সংকল্প করে। সকলেই হাসে, রুক্মিণী তাহাদের সহিত আর হাসিতে পারে না; সকলেই পাঁচ-রকম কথা কয়, রুক্মিণী আর যোগ দিতে পারে না;—স্বাভাবিক-প্রীতির বাধনে সকলেই বাঁধা থাকে, কাহাকেও রুক্মিণী আর ভালবাসিতেও পারে না। ছোট-ছোট ছেলেরা লগি হাতে করিয়া, ঘুঁড়ীর পিছু-পিছু ঊর্দ্ধে চাহিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহার উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, খেঁকী কুকুরের মত মুখ খিঁচাইয়া, রুক্মিণী তাহাদের তাড়া করে। কোন যুবতী নিজের ছোট ছেলে কিম্বা মেয়েকে দুই স্তনের উপর দাঁড় করাইয়া আদর করিতেছে দেখিলে, রাগে রুক্মিণীর সকল অঙ্গ জ্বলিয়া ওঠে—সে কেবল ডাইনের মত, বকিতে বকিতে সেখান হইতে চলিয়া যায়। রুক্মিণীর চক্ষে মানুষ দিনে-দিনে ভীষণ স্বার্থপর, অসহ্য কুটিল,—এক উপহাস-প্রবণ মহাপাপীরূপে চলিতে ফিরিতে লাগিল—এই পৃথিবী, সেই পাপীদের নরক-কুণ্ড—কেবলই পচাদুর্গন্ধে ধু-ধু করিয়া জ্বলিতেছে; বিরাম নাই। রুক্মিণী যখন কাঁদে, কে তাহার যাদুর জন্য রুক্মিণীর সহিত কাঁদিয়াছে! কোন্-নারী রুক্মিণীর যাদুকে স্মরণ করিয়া, এক তিলের জন্যও নিজের সন্তানকে

বক্ষ হইতে নামাইয়াছে—তাহাদের সান্ত্বনা শুধু একটা কুটীল উপহাসই কি নয়? ছোট-ছেলে দেখিলেই রুক্মিণীর কেমন হিংসা হইতে লাগিল—তাহার ইচ্ছা হয়, জগতের সব কচি-কচি ছেলেগুলিকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে। কেননা, খাড়ুভিন্ন, তাহার খুকিভিন্ন সংসারে যে আরো অন্য ছেলে মেয়ে আছে, তাহা তো পূর্ব্বে রুক্মিণী জানিত না;—এখন খাড়ু যখন নাই, তখন এরা আবার কিল-কিল করিয়া অনন্তের কোন্ সাগর-কূল হইতে বহিয়া আসে? রুক্মিণীর এক-একবার মনে হয়, খুব চীৎকার করিয়া—গগন ভেদকরা চীৎকারে, প্রচার করিতে থাকে—জগত অসার—শুধুই জ্বালাময়; জীবন পাপ—শুধুই বন্ধন;—এখানে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই—এখানে দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ভালবাসা নাই—এখানে সকলই ভগবানের খেলা, মানুষকে লইয়া তাঁহার শুধুই অবহেলার খেলা।—তোমরা আর কেহ ঠকিও না।

এখন প্রতিবেশীর সঙ্গে রুক্মিণী কেবলই ঝগড়া করে। একটুতেই সকলের সহিত তাহার এখন বিবাদ হয়। রুক্মিণীর সহিত আর কাহারও বনে না। দুপোহরে একটু সে যখন বিশ্রাম করে, তখন মুখে মাছি বসিলে, মাছিরও উপর সে বিরক্ত হইয়া, নিজের গালে চড়াইতে থাকে—শেষে কাঁদিয়া

ওঠে। নরম হইয়া কোন বৃদ্ধা যদি রুক্মিণীকে বুঝাইয়া বলে—তুই এমন হ'লি কেন? রুক্মিণী কাঁদিয়া চেঁচাইয়া কহে তোমরা বোঝনা, তোমরা বোঝনা—আমি যে আর পারি না—আমি যে আর পারি না। রুক্মিণী ঘরের গাই-বাছুর বিলাইয়া দিল। লাল কাপড় আর রূপারতাল লইয়া ছুঁড়িয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। অনেকদিনের একটা টিয়াপাখী ছিল, রুক্মিণী তার শিকল কাটিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিল। পাখী বেশ বনের দিকে উড়িয়া গেল। গাছের উপর পাখী-বিহীন বাসার মত, রুক্মিণীই কেবল সেই কুঁড়েতে নীরব-নিস্তব্ধে পড়িয়া রহিল। পূর্ব্বে যে সব ভিখারী তাহার দাবায় বসিয়া জল খাইয়া দু'দণ্ড গল্প করিয়া জিরাইত, তাহারা রুক্মিণীকে আজকাল ভয় করিতে লাগিল। যাহারা পূর্ব্বে রুক্মিণীকে বন্ধুরমত ভালবাসিত, তাহারাও নিজেদের রুক্মিণীর নিকট হইতে দূরে রাখিতে লাগিল। রুক্মিণী তাহাতে কোন ক্ষতি বিবেচনা করিল না। সে মানুষের সুখ-সম্পদ, হাঁসি-আনন্দ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারিলেই সুখী হয়। লোকে স্থির করিল, রুক্মিণীর মাথা খারাপ হইয়াছে।

তৃতীয় চিত্র

সেদিন প্রলয় দুর্য্যোগ—সন্ধ্যা হইতে সেদিন মেঘের ডাক, মুষলধারায়-বৃষ্টি আর প্রবল-ঝড়, বিশ্বের প্রাণীগুলিকে লইয়া যেন সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ করিল। এরকম ঝড়-জল অনেকদিন হয়নি। কত লোকের ঘরবাড়ী ভূমিস্যাৎ হইল। রুক্মিণীর ঘাটের দিকের ঘরখানি সশব্দে পড়িয়া গেল—রুক্মিণী পাগলেরই মতন, অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সেহাঁসির ধ্বনি ঝড়ের সাঁইসাঁই রবের সঙ্গে মিশিয়া, বিদ্যুতের কোলে, কচিছেলের প্রথম-চলনের মত কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া, ঝাঁপাইয়া পড়িল। রুক্মিণী তার মেটে-ঘরের খুব ছোট-জান্‌লাটা খুলিয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া, বসিয়া রহিল—তাহার প্রাণে আজ যেন কেবলই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। দূরে কাহার বাড়ী পড়িয়া গেল, বাড়ীশুদ্ধ লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—রুক্মিণী শুনিল। শকুনীর বাসা ভাঙ্গিয়া গেল—শকুনী অন্ধকার মথিত করিয়া চীৎকার করিতে করিতে,

সবেগে রুক্মিণীর জানেলার তলায় আসিয়া পড়িল। রুক্মিণীর মেটে-দেয়াল আঁচড়াইয়া শকুনী প্রবল ঝট-পটশব্দ আরম্ভ করিল। জানেলার ক্ষুদ্র গহ্বর দিয়া একটা একটা দমকা বাতাস আসিয়া, রুক্মিণীর হৃদয়ের মধ্যে ঢুকিয়া সমস্ত হৃদয়খানা শুলাইতে লাগিল। বৃষ্টিপাতের শব্দে, ঝড়ের গতির বেগে, মেঘের বিকট গর্জনে, বিদ্যুতের ঝিলিক-ঝিলিকে আর অন্ধকারের স্তব্ধতায়— আজ রুক্মিণীর মন বড়ই মজিতে লাগিল। রুক্মিণীর হৃদয়ের গভীর কোন্-দেশে গুরু-গুরু করিয়া কি যেন কাঁপিতে লাগিল। রুক্মিণীর শীত পাইল। রুক্মিণী মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া, আপাদমস্তক একখানা কাঁতা মুড়ি দিয়া শুইল। বাহিরে বিপুল দুর্যোগ চলিতে লাগিল। রুক্মিণী শুইয়া-শুইয়া সবই পূর্ব্বের মত শুনিতে লাগিল—কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা রুক্মিণীর মন আরো যেন প্রফুল্ল হইল। মেঘের বজ্রধ্বনি, ঝটিকার গর্জ্জন আর বৃষ্টির ঝম্-ঝম্ শব্দ, সব এক সঙ্গে মিশিয়া, রুক্মিণীর কানে একটা সঙ্গীতের মত বাজিতে লাগিল—সে-সঙ্গীত এতই ক্ষীণ, যে, রুক্মিণীর মনে হইতে লাগিল, কোন্ এক সুদূর-প্রদেশে হাজার গভীর-আবরণের মধ্যে যেন এইসঙ্গীত গীত হইতেছে—সেই হাজার আবরণের স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া, শেষে এক ক্ষীণতায় রুক্মিণীর কর্ণে বাজিতেছে। শুইয়া, রুক্মিণী শুধুই শুনিতে লাগিল।

ভীত-চকিত ও সহায়হীনের হাতের আঘাতে, ঝন্-ঝন্ রুক্মিণীর দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল। শুনিতে পাইলেও রুক্মিণীর সাড়া-দিবার প্রবৃত্তি হইল না। রুক্মিণী পূর্ব্বে যাহাদের আদর করিয়া ঘরে আনিত, তাহাদের এখন সে কেবলই ঘর হইতে বিদায় করিতে চায়। শুইয়া-শুইয়াই রুক্মিণী বিকট গর্জ্জন করিয়া সাড়া দিল। বাহির হইতে এক-কণ্ঠ আসিল—বড়ই বিপদে প'ড়েছিগো? শেষে বড়ই জ্বালাতন হইয়া, "ভারতে কি আর স্থান নেই" বলিতে-বলিতে গিয়া রুক্মিণী দ্বার খুলিল। হাতে শুধুই একটা কাপড়ের ব্যাগ লইয়া ভিজিয়া একেবারে বানরেরমত মূর্ত্তি ধরিয়া, এক বৃদ্ধ! বৃদ্ধ যেন কোন্ সাগরে ডুবিয়াছিল, সেখান হইতে বড-কষ্টে উঠিয়া আসিয়াছে—মুখে তার তেমনই ভয়, চ'খে তার তেমনই দৃষ্টি, কণ্ঠ তার বাক্‌শূন্য—বৃদ্ধ কেবল প্রবলভাবে কাঁপিতেছে! এ অবাঞ্ছিতকে রুক্মিণীর দ্বারে কে আনিল?—রুক্মিণী তাহাই কেবল ভাবিতেছিল। রুক্মিণী কেমন এক রকম হইয়া গেল; অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কে যেন জোর করিয়া রুক্মিণীর দ্বারা কতক-গুলি কাজ করাইয়া নিল—রুক্মিণী আগুণ করিল, বৃদ্ধকে কাপড় ছাড়াইল, তাহাকে বিছানা পাতিয়া দিল—শেষে বৃদ্ধ সুস্থ হইল। রুক্মিণী তামাক সাজিয়া দিল, বৃদ্ধ তামাক সেবন করিল। এখন রুক্মিণী শুনিল—ইনি গোঁসাই-ঠাকুর পর-

গ্রামে সেবক-বাড়ী যাইতেছেন, পথে সাথি-চাকরটী হারাইয়া গেছে, বৃদ্ধ কুমরের চাকের মত ঘুরিতে ঘুরিতে, রুক্মিণীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত—তারপর রুক্মিণী সবশেষে ইহাও শুনিল, যে বৃদ্ধ তাঁহার বয়সে এমন দুর্য্যোগ কখনো দেখে নাই! রুক্মিণী গড় হইয়া, গোঁসাই-ঠাকুরকেপ্রণাম করিল।

গোঁসাইঠাকুরের কিছু নূতন ঠেকিল। মধুরই হোক্ আর বীভৎসই হোক, প্রত্যেক নূতন-জিনিষেরই একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র-সৌন্দর্য্য আছে। গোঁসাই-ঠাকুর একটু হাঁসিয়া কহিল—মা, তোমার দেখ্‌ছি বয়স অল্প, কিন্তু এগৃহে আর কাহাকেও দেখ্‌চি না। এখানে কি তুমি একলা থাক? রুক্মিণী উত্তর করিল—কি ক'রবো? ভগবান যে একলা রেখেছেন। রুক্মিণী চুপ করিল—আর কিছু বলিল না।

এতক্ষণ পরে গোঁসাই-ঠাকুর লক্ষ্য করিল—বয়স অল্প বটে, চেহারা সুন্দর বটে, কিন্তু একি! গোঁসাই-ঠাকুরের মনে হইল, সে যেন শ্মশানে সঞ্চরণশীল আসমানের এক বান্দার সঙ্গে কথা কহিতেছে। গোঁসাই-ঠাকুর দেখিল যাহার সহিত কথা কহিতেছে, তার সারামুখখানা ঈষৎ লাল, জোড়া ভ্রূ-যুগ একটু অমনি কুঞ্চিত, চক্ষু নাই বলিলেই চলে, সেচক্ষুএমনই গভীরতায় ঢুকিয়া গেছে—অন্ধকারে আলেয়ার মত, প্রতিকথা কহিবার পূর্ব্বে একবার জ্বলিয়া

উঠিয়াই, নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। রমণী চুল-গুলি নিজেই যেন ছাঁটিয়াছে, তাই চুলগুলি কোথাও বড়, কোথাও ছোট—কোথাও বা একেবারে নাই, এমনি-ভাবে সারামাথা ঘেরিয়া কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। গাল বেশ পুরন্ত, তবু কে যেন চড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। দুইস্তন একেবারে শুষ্ক হইয়া বুকের সঙ্গে লাগিয়া, কাগজের মত ঝুলিতেছে—তবু যদিও রমণীর সারাদেহ তেমন রোগা নয়। গোঁসাই-ঠাকুর অনেক কাব্য, দর্শন পড়িয়া পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু কিসে যে মানুষের চেহারা এমন হইতে পারে, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। গোঁসাই-ঠাকুর মনে করিলেন, এই দুর্য্যোগের মধ্যে মরিতে-মরিতে কোথায় আসিয়া আবার জীবন পাইলাম। প্রকৃতি আমার সঙ্গে একি তামাসা সুরু করিল? রমণীর কোন সঙ্কোচ নাই—নারীর যেটা স্বাভাবিক-সঙ্কোচ সেটাও নাই। আজকের সেবকবাড়ী যাত্রার সমস্ত ইতিহাসটা, গোঁসাই-ঠাকুরের যেন সবই স্বপন বলিয়া মনে হইল।

রুক্মিণী কহিল—আমি জাতে কিন্তু জেলে, আপনি কি এখানে আহার ক'র্‌বেন? ঘরে ভাল চিড়ে আছে—কলা আছে আর গুড় আছে। আমি ছোট-জাত

জল খাওয়া বোধ হয় চ'লবে না। গোঁসাই-ঠাকুর কহিলেন —আমাদের প্রভু গৌরাঙ্গ তোমাদের মত ছোট জাতের জন্যই এসেছিলেন। তোমাদের মত ছোটজাতকেই সবার চেয়ে বেশী-খাতীর ক'রতেই, তিনি আমাদের ব'লে গেছেন। তোমরা যত ছোট-জাতই তখন তাঁর সব প্রেমের জিনিষ ছিলে। তুমি যদি আমায় আদর ক'রে দাও, তো আমি কেন খাবনা মা?

প্রাণ যখন কোথাও কোন আদর পায় না, তখন অতি সামান্য—নিহাৎ অল্প-আদরটাই উদার আকাশের মত আকৃষ্ট করিতে থাকে। রুক্মিণী গোঁসাই-ঠাকুরকে আদর করিবে কি!—রুক্মিণীর মনে হইল, গোঁসাই-ঠাকুর যেন গভীর-আদরে তাহাকেই বুকে চাপিয়া ধরিতেছে। এত আদর রুক্মিণী যে কাহারো কাছে কখনো পায় নাই—এমন করিয়া কথা রুক্মিণীকে যে কেহ বলে নাই। রুক্মিণীর ইচ্ছা হইল গোঁসাই-ঠাকুরের কোলে পড়িয়া, জীবনের তার সকল বেদনার কথাটি বলে। রুক্মিণী গোঁসাই-ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া পড়িল—দুইচোখদিয়া রুক্মিণী গোঁসাই-ঠাকুরকে যেন গিলিতে লাগিল!

রুক্মিণীর চোখদু'টো দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে নিহাৎ ছোট-মেয়ের মতন জিজ্ঞাসা করিল—আমার

যাদুর কথা প্রভু গৌরাঙ্গ কি কিছু ব'লে গেছেন?—আমার কেমন যাদু ছিল—আমি সেইথেকে যে আর ভাত খেতে পারি না ঠাকুর?

গোঁসাই কহিল—যাদু বুঝি তোমার ছেলে? রুক্মিণী কহিল—হ্যাঁ গো ঠাকুর! কিন্তু সে যাদুও মরে গেছে, আমার সোয়ামীও মরেছে—শেষ আমার খুকিটিও মরে গেল।—এখন শুধু আমি র'য়েছে, কি ক'রবো বল! মানুষ কেন হয়? হ'য়েই মানুষ মরে না কেন? যাদু আমায় কি ভালবাসত, সোয়ামী আমায় কি আদর ক'র্‌ত'—খুকি আমায় ছেড়ে, কোথাও থাকতে পারত না। গোঁসাই কহিলেন—তুমিও তো তাদের খুব ভালবাসতে? রুক্মিণী উত্তরে কহিল—কি জানি?—কিন্তু যাদু যে আমর ছেলে, খুকি যে আমার মেয়ে—আর দেখ, যাদুর আমার মুখখানি ঠিক সোয়ামীর মত ছিল। গোঁসাই-ঠাকুর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন—তবে তোমার যাদু, তোমার খুকি—তারা কেহই তো মরেনি

রুক্মিণী একেবারে চম্‌কাইয়া উঠিল—একটা মৃতদেহ যেন লাফাইয়া উঠিল।—সে কহিল—মরে নি?—সে কি ঠাকুর? গোঁসাই-ঠাকুর কহিলেন—তুমি যে কিছুই

জাননা দেখ্‌চি।—ভালবাস্‌লে কেহ কি কখন মরে? যে ভালবাসে সেও মর্‌তে পারে না, যাদের ভালবাসে তারাও কখনো মরে না। তারা মরে নি—আবার তুমি তাদের পাবে, খুঁজে দেখ। রুক্মিণী রাগিয়া আগুণের মত জ্বলিয়া উঠিল। রুক্মিণী চড়া-গলায় কহিল—আবার আমি তাদের চাইব কেন? ঠাকুর, তুমিও এখান থেকে চ'লে যাও।—আমি আর তাদের চাই না। জীবনকে আর চাই না—আমিও শুধু মর্‌তে চাই। আমি আত্মঘাতী হ'ব। আমি বেঁচে থাক্‌তে চাই না। আমি এই মাই দু'টোকে *পুড়িয়ে ফেল্‌তে গিয়েছিলুম—এই দেখ ঠাকুর*—বলিয়া রুক্মিণী বুকের কাপড় খুলিল। গোঁসাই দেখিল, বুকখানায় ঘা তখনো লাল হইয়া রহিয়াছে।

গোঁসাই কহিলেন—তুমি জাননা তাই, একথা ব'লচ। আত্মহত্যা যে পাপ, তাকি তুমি জান না? রুক্মিণী কহিল—তা জেনে কি হবে?—অনেকই তো পাপ ক'রেছি। গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি পাপ ক'রেছ? রুক্মিণী কহিল—তা'তো জানি না ঠাকুর, তবে লোকে বলে মানুষমাত্রেই পাপী!—আমিও বলি, পাপ না ক'রলে এত কষ্টও কি লোকে পায়? গোঁসাই ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন—যারা কিছুই জানে না, তারাই একথা বলে; আর

তুমি কিছুই জান না, তাই তুমিও তাদের কথা বিশ্বাস কর। কে ব'ল্লে তুমি পাপী? তুমি তো পাপী কোনদিন নও—

রুক্মিণী ঠাকুরকে বাধাদিয়া কতকটা আপনার মনেই কহিল—আমি পাপী নই? ঠাকুর উত্তর করিল—না আমি ব'ল্‌চি, তুমি কখনো পাপী নও। কিন্তু তুমি যেদিন আত্মহত্যা ক'র্‌বে, সেই দিনই তুমি একমাহাপাপী হবে—সেপাপ কিছুতে ঘুচ্‌বে না। এতদিন পরে রুক্মিণী আবার আজ কাঁদিল। রুক্মিণী কাঁদিয়া কহিল—কি ক'র্‌বো ঠাকুর, আর যে পার্‌চি না। গোঁসাইঠাকুর কহিল—তুমি যে কিছুই ক'র্‌চ না—তাই তুমি আর পারচ না। তোমার কেহই মরে নি, তবু তুমি জোর-ক'রে মনে ক'র্‌বে, তারা মরেছে—কিম্বা তুমি তাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বুঝি ভালবাসনি, তাহ'লে তারা মরে কখনো! তুমি খুঁজে দেখ, তাদের পাও কি না।—রুক্মিণী আবার একটু রাগিল, কহিল—যদি তারা থাকে তো যেখানে আছে, সেখানেই সুখে থাক।—আমি বেঁচে থাক্‌তে আর চাই না। আত্মহত্যা ক'র্‌লে কেন এত পাপ হয়, বলুন ত ঠাকুর? আমি যদি বলি সব মিথ্যে—আমি আত্মহত্যাই যদি করি? গোঁসাই-ঠাকুর কহিল—তুমি কি তা'ও জান না?

ভালভাবে বেঁচে থাকাই যে তোমার ধর্ম্ম। রুক্মিণী কহিল—আমি যে হিন্দু। গোঁসাই-ঠাকুর কহিল—হিন্দুই তো বটে।—কিন্তু সবার উপর তুমি মানুষ। হিন্দুধর্ম্মের মতগুলি তুমি পালন ক'র্‌তে রাজী আছ ব'লেই, তুমি হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মের মতগুলি তোমায় উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে, কি ক'র্‌লে তুমি ভালভাবে বেঁচে থাক্‌তে পার্‌বে। শুধুই ভালভাবে বেঁচে থাকাই, তোমার আসল ধর্ম্ম। জীবনই তোমার কাজ। সেই জীবনকে তুমি পালন ক'রচ না বলেই, তুমি আর পারচ'না। ভগবান তোমায় পাঠিয়েছেন, ভালভাবে শুধুই বেঁচে থাক্‌তে—তিনি তোমায় মরবার জন্যে পাঠাননি তো—যারা মরে, তারা যে মহা-পাপী।

রুক্মিণীর প্রাণ যেন লাফাইয়া বলিয়া উঠিল—তবে আমি মরিব কেন? তৎক্ষণাৎ আবার তাহার মনে হইল—আমি কতখানি ভালভাবে বাঁচিয়াছি! আমি পাপী বলিয়াই ত' মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার ভালভাবে কি বাঁচা হইয়াছে! একদিন তো শুধুই বাঁচিতেই চাহিতাম, আজ কেন তবে মরিতে চাই! আমি মরিব না—শুধুই ভালভাবে বাঁচিতেই জীবনে চেষ্টা করিব। রুক্মিণী নীরবে গোঁসাই-ঠাকুরের কথাগুলি সব শুনিল। রুক্মিণীকে

এমন আদর করিয়া, আর কখনো তো কেহ কিছু বলে নাই। রুক্মিণী নীচ-কুলে জন্ম নিয়া, চিরদিনই লোকের সমাজ হইতে সভয়ে পিছাইয়া আসিয়াছে। সে আজ শুধুই ভাবিল—আমিও তবে মানুষ? সত্যই কি আমি পাপী নই! রুক্মিনী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল—তবে জগতে আমি এতদুঃখ পাই কেন? গোঁসাই-ঠাকুর কহিল—তুমি সুখ চাও বলে। মা, ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন, তোমার চেয়ে, তোমার উপর তাঁর-দৃষ্টি অনেক বেশী—তোমায় সুখী করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু সুখের মুখ-চেয়ে, তুমি ব'সে থাক্‌বার কে? তোমার কাজ শুধু ভালভাবে বেঁচে থাকা, আর তাঁর কাজ—বৃষ্টিধারার মত সুখ ঢেলে ঢেলে তোমায় ভিজিয়ে তোলা! তুমি নীচ নও তো, তোমাকেও সেই ভগবান পাঠিয়েছেন—তুমি নীচ মনে করে শঙ্কিত হও বা দুঃখিত হও, নিজেরই বুদ্ধির দোষে। সুখ আর চেও না, তুমি সুখ চাইবার কে?

রুক্মিনী ভাবিল—সত্যই তো, আমার যাদুকে তো কোনদিন কিছুই আমার নিকট চাহিতে হয় নাই। যাদুর তো শুধুই কাজ ছিল—পাঠশালে যাওয়া।

গোঁসাই আবার কহিল—বেশ-ক'রে খুঁজে দেখ, তোমার কেহই মরেনি।—তুমি জান না, তাই অমন কর।

প্রেমেই যে মানুষ অমর,—তুমি তাদের যখন এত ভাল-বাস, তবে তারা কোন্ দুঃখে মরবে? তারা সবাই বেঁচে আছে। এইবার রুক্মিণী ব্যাকুল-ভাবে কহিল—কোথায় আছে তারা?

গোঁসাই-ঠাকুর উত্তর করিল—তারা এই জগতেই আছে মা! কিন্তু তুমি যে তাদের চিন্‌তে পার না। কারণ তুমি কিছুই জান না।

রুক্মিণী আবার ব্যাকুল-ভাবে কহিল—কার ঘরে আছে তারা? ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল—মানুষ ঘুরে ফিরে কেবলই যে জন্ম নিচ্ছে, একথা কি বিশ্বাস কর? রুক্মিণী উত্তর করিল—তা করি।—হিন্দুরা সকলেই তা বলে। গোঁসাই-ঠাকুর কহিল—তবে হয়তো, তোমার যাদু পথের ঐ ভিখারীটার ঘরে আবার জন্ম নিয়েছে—তুমিই কেবল চিন্‌তে পার না। তোমার খুকি হয়তো, কোন বড়লোকের ঘরে আবার গিয়েছে। তোমার স্বামী হয়তো, আবার কোন চাষার ঘরে জন্ম নিয়েছে।

রুক্মিণী একেবারে বিহ্বল হইয়া কহিল—আমি তবু তাদের চিন্‌তে পারি না? গোঁসাই-ঠাকুর কহিল—তাহ'লে তুমি কাঁদ্‌বে কেন?—তাহালে তুমি শোক ক'রবে কেন? —তাহালে মরে গেছে, তুমি কোন্ সাহসে বল। তুমি আর

তাদের ভালও বোধহয় বাসনা, তা বাস্‌লে, তাদের এ রকম খোঁজ না ক'রে কি থাক্‌তে পারতে? রুক্মিণী উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া উঠিল—'ওগো', কোন্‌-অভাবে আমি চিন্‌তে পারি না—কেন আমি খোঁজ করিনি। চুপ কর, ওগো ঠাকুর, আর ব'ল না। বুক্‌ যে ফেটে যায়—বলিয়া ঝড়ের দম্‌কা-বাতাসের মত, রুক্মিণী ছুটিয়া সেথর হইতে তার শয়ন-ঘরে চলিয়া গেল।

রুক্মিণী মাটিতে শুইয়া পড়িয়া, প্রথম খুবখানিক কাঁদিল। তারপর তাহার মনের-মধ্যে এইভাবের কতকগুলি কথা কেবলই শুনাইতে রহিল আমি মরব না! আমি মরিব না! যাদুরে, শুধুই তোর খোঁজ করিব।—আমি নীচ নই! আমি পাপী নই। ভগবান, আমি ভালভাবে শুধুই বাঁচিয়া থাকিব। আমার যাদু আবার জন্মিয়াছে, আমার খুকি আবার জন্মিয়াছে। আমার সোয়ামী যে আবার আসিয়াছে গো—কি লজ্জা, নারী হইয়া আমি তাহাকে চিনিতে পারি না? এমনই হীন আমি! এমনই অবোধ আমি! এমনই কুটীল আমি!

রুক্মিণীর বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে আবার ভাবিল—কত আপনার হইতে আপনার, যারা কাঁচাফলের

মত অকালে ঝরিয়া গেছে, আমার হারান-জিনিষ যে আবার আসিয়াছে!—আমারই সম্মুখ দিয়া, আমার প্রাণের প্রাণ কতদিন ঘুরিয়া গেছে—আমি চিনিতে পারি নাই!—একদিন যাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াও, শান্তির পূর্ণতা হয় নাই—সম্মুখ দিয়া সে চলিয়া যায়, তবু তাহাকে চিন্‌তে পারি না—কোন অভাবে ওগো, কোন অভাবে?

এবার নাকি সে পথের ভিখারীটার ঘরে জন্ম নিয়ে, আহা, ছিন্ন-কাঁথায় পড়িয়া আছে!—আবার নাকি সে, ঐ ঢেউ-খেলান সবুজধান-ক্ষেতে, কোমরপর্য্যন্ত তাহার কচি শ্যাম-দেহখানা পাঁকের মধ্যে ডুবাইয়া—(আমার হৃদয়ের হৃদয়, কোমল শয্যায় শুইয়ে যাকে আশা মেটে নাই)—বরষার বারিধারার মধ্যে, কখনো বা চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে মাথা খুলিয়া দিয়া, আলের-কেউটের হিস্‌-হিস্‌শব্দে শঙ্কিত প্রাণে, তার বাপকে ধানকাটায় সাহায্য ক'রচে! কালামুখি, কেন চিনিতে পার না?—কোন-অভাবে দেখিয়াও দেখ না—তবে কি ভালবাস নাই! বাহুতে-বাহু, নয়নে-নয়ন, অধরে-অধর দিয়া, বালির উপর একফোঁটা জলের মত যে কত দীর্ঘ রজনী শুখাইয়া গেছে? তবু কালামুখি, তাহাকে চেননা—তবু কি তাহাকে ভালবাস নাই!—এ

কান্নার যে কোন দাম নাই, ওরে একান্নার তোর কোন দাম নাই।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রুক্মিণী কেবলই কাঁদিল—কেবলই নিজেকে গালি দিল।—শেষে মাটিতে নিজের মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

চতুর্থ চিত্র।

—※—

রুক্মিণীর কুটীরের কিছু-দূরে, ঐযে পাতার একখানি ছোট কুঁড়ে রহিয়াছে. ঐ কুঁড়েতে এক ভিখারীণী থাকে। ভিখারীণীর নাম সুমতি। সুমতি পূর্ব্বে বেশ্যাছিল। এখন বিগত-যৌবনা ও রুগ্না হইয়া, দেহের মধ্যে প্রাণটীকে বাঁধিয়া রাখিতে, ভিক্ষাবৃত্তি ধরিয়াছে। গ্রামের লোকের নিকট কোন ভিক্ষাই এখন সে পায় না—কেননা এখন যে ঘৃণাই শুধু তার প্রাপ্য। তাই সুমতিকে অন্যগ্রামে ভিক্ষায় যাইতে হয় কোন-কালে যে তাহাকে দেখে নাই, এমন লোকের কাছে তাহাকে প্রার্থনা করিতে হয়। চিরদিনের চেনা যারা, তাদের নিকট ঘৃণা আর লাঞ্ছনাই সুমতির সকল চাওয়ার নিত্যকার-পাওয়া—চেনালোকের নিকট প্রহার-ও সে মাঝে-মাঝে খায়! মার-খাইয়া সুমতি পথের কুকুর-টারই মত একবার চীৎকার করিয়া, আবার কুঁড়ের ভিতর ঢুকিয়া চুপ করে—কেননা, সে বেশ্যা ছিল, তাহার দাম এখন কিছুই নাই—তাহাকে দেখিতে এখন কেহই নাই

গ্রামের দুষ্টছেলেরা তাহার কুটীরে ঢেলা ছোঁড়ে ;—সুমতি চিরদিনের-নারীর মত শুধু তাদের আদর করিয়া নিষেধ করে। কি জানি, কেন ছেলেরা কথা শোনে ;—কোন দিন নিজেদের ঔদ্ধত্যে একটু লজ্জিতও হয়।

সেইদিন হইতে রুক্মিণী মনের মধ্যে অষ্টপ্রহর তোলা-পাড়া করিতেছে—আমার ধর্ম্ম, শুধুই ভালভাবে বেঁচে থাকা। তারা তো মরে নাই—ভালবাসিলে তারা কোন্ দুঃখে মরিবে?

কথাগুলি রুক্মিণী যতই মনের মধ্যে নাড়িতে লাগিল, যতই ভাবিতে লাগিল, যতই আপনার মনে, বলিতে লাগিল, ততই দৃঢ়ভাবে তার মন দাঁড়াইয়া উঠিল, ততই গভীরভাবে সে বুঝিতে পারিতে লাগিল, ততই জীবন তাহার নিকট মধুর বলিয়া মনে হইতে লাগিল ; এখন রুক্মিণী পথে চলে চন্-মন্ করিতে-করিতে—তাহার দৃষ্টি যেন সর্ব্বদাই কি খুঁজিতেছে। সুমতির কুটীরের নিকট দিয়া রুক্মিণী চলিয়া যায়, কোন তত্ত্বই লয় না—সুমতি বা তাহার কুটীর, না-থাকারই মধ্যে, জগতের একটা কিছু।

সুমতির কুঁড়ের নিকট হটাৎ রুক্মিণী সেদিন থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল—ওরে সুমতি, আবার তোর এ-ছেলে কবে হ'ল? সুমতি লজ্জিত হইল, দুঃখিত হইল—

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আজ চার মাস দিদি! ক্ষণিকক্ষণ ধীরভাবে তাকাইয়া-তাকাইয়া, রুক্মিণী সেদিন চলিয়া গেল। আবার একদিন রুক্মিণী দেখিল—সুমতি পাতার-জাল দিয়া সুজি ফুটাইতেছে।—রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিল—সুজি কি হবে রে? সমস্ত-গ্রামের মধ্যে সুমতির সঙ্গে এমন করিয়া তো কেহ কথা কহে না। সুমতির সারা-বুকখানা বেদনায় উথলিয়া উঠিল। সে গভীর এক নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ঐ ছোঁড়াটাকে খাওয়াব দিদি,—না খাইয়ে তো আর রাখ্‌তে পারি না।

রুক্মিণী চম্‌কাইয়া কহিল—চারমাসের ছেলে সুজি খাবে, সেকি রে? সুমতির চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কহিল—ভিখিরী-মানুষের তা চলে দিদি। সেদিনও রুক্মিণী চাহিয়া-চাহিয়া চলিয়া গেল। আর একদিন রুক্মিণী এক ঘটী দুধ লইয়া একেবারে সুমতির কুটীরে আসিয়া উপস্থিত। সুমতি সেদিন শুধুই কাঁদিতে লাগিল—হৃদয়ের সমস্ত কান্না লইয়া, সেদিন যেন সুমতি একেবারে রুক্মিণীর নিকট কাঁদিয়া উঠিল। সুমতি কাঁদিয়া-কাঁদিয়া কেবলই যেন বলিতে লাগিল—সুমতি মন্দ, সুমতি কুলটা,—সুমতি মহাপাপী। সুমতি বেশ জানে, জন্মান্তরে অনন্ত নরক-কুণ্ড তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা জানিলেও তো সে

তেমন দুঃখিত নয়—কেননা সুমতির ধারণা, ঈশ্বরের বিচার অনিবার্য্য।—কিন্তু, এ জগতে সে যাহা আশা করে, সে যাহা দাবীর-উপর পাইতে চায়—তাহা বল কেন পায় না?—ওগো দিদি, সে তাহা কেন পায় না? সুমতির চ'খের জল-গুলি যেন এত কথাই কহিতে লাগিল।

রুক্মিণী সুমতিকে জিজ্ঞাসা করিল—ওরে, মন্দ-কাজ কি তুই এখনো করিস্? সুমতি উত্তর করিল—কি ক'র্‌ব দিদি, সবারচেয়ে যারা আমায় বেশী দোষ দেয়, সেই পুরুষেরাই যে আমায় ছাড়ে না। এই তো আমার চেহারার দশা দিদি—কিছুতে সাধ তাদের মিটচে না—তবু আমায় জ্বালাতন ক'রে, কেবল এই মাংসের-ঢেলাগুলকে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।—তারপর, তারা তো আর এদের পানে ফিরেও দেখে না—তারা এসেছিল যেন শুধুই তৃপ্তি নিতে, এদের-ওপর তাদের কোন বাঁধনই নেই—আমি মন্দ, আমি কুলটা, আমি মহাপাপী—তবু আমি এদের তাদেরই মতন ফেলে দিতে পারি না কেন দিদি, তাই আমার বেশী কষ্ট হয়।

রুক্মিণীর মুখ একটু বিকৃত হইল।—সে তৎক্ষণাৎ আবার কহিল—না, না—কিন্তু আর পাপ করিস্ নি। এখনও যখন ভগবান তোকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কখ্‌খন

তুই পাপী নস্। এইবার তুই ভালভাবে বাঁচ্‌তে চেষ্টা কর্। চল্, আমি তোকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। সেখানে তোর কাজ, কেবল ছেলেকে মানুষ-করা আর ভালভাবে শুধুই বেঁচে থাকা। আমি আবার মাছের কাজ আরম্ভ ক'রব, তোকে কুট'কেটে দু'খানা ক'রতে হবে না। তোর ছেলেকে দুধটা খাওয়া, আমি দেখে যাই। সুমতি দুধ খাওয়াইতে লাগিল। বসিয়া-বসিয়া রুক্মিণী হটাৎ কাঁইয়া উঠিল—না, তুই পারচিস্ না—আমার কোলে দে দেখি? সুমতির একি আনন্দ! কুলটার সন্তান কাহারও নিকট যে কোন মূল্যের, ইহা তো সুমতি জানিত না। সুমতির মুখখানা প্রভাত আকাশের মত নির্ম্মল-স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিল।

রুক্মিণী নিজেই দুধ খাওয়াইতে লাগিল। হঠাৎ দুধ-খাওয়ান বন্ধ করিয়া, ছেলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া-চাহিয়া রুক্মিণীর মনে হইল, মুখখানি যেন রুক্মিণীর নিকটে বহুদিনের, কোন অনন্তদিনের পরিচিত—রুক্মিণীর শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐ মুখখানিই যেন তার ইচ্ছায়, জ্ঞানে ও কর্ম্মে নিবীড়ভাবে লাগিয়া আছে—এ জন্মের পূর্ব্বেও যেন, শুধু ঐ মুখখানিকে লক্ষ্য করিয়াই রুক্মিণী আবার জন্ম নিয়াছে। এ মুখখানিতে রুক্মিণীর শৈশব

আছে, যৌবন আছে—শতজন্মের জীবনগুলি তার যে বড় স্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে! রুক্মিণীর মন উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া উঠিল—যাদুরে, আমার যাদুরে—তোমায় চিনিনি ধন, তোমায় দেখিনি ধন, তোমায় খুঁজিনি ধন—বলিয়া শিশুকে বুকের ভিতর একেবারে পিষিয়া চাপিয়া লইয়া, রুক্মিণী নিজের বাড়ীর পানে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

বহুদিন পূর্ব্বে রুক্মিণী বড় সুখী ছিল—আজ-কাল সে গভীর আনন্দে ভাসিয়া উঠিল। প্রাণ তার শিশুর মত চঞ্চল হইয়া উঠিল—কিন্তু দেহ তার পাহাড়ের মত অটল রহিল। রুক্মিণীর রং পূর্ব্বাপেক্ষা ফর্‌সা হইল। দেহের প্রত্যেক শিরটী পর্য্যন্ত তাহার নূতন যৌবনের পূর্ণতায় ভরিয়া উঠিল। শোকে অধীর হওয়ার দরুন যাহারা বলিয়াছিল—ইহা কেবলই বাড়াবাড়ি, স্বামী-পুত্র কি কাহারো মরেনা।—তাহারাও আজ আবার বলিতে সুরু করিল—এত কষ্টেও মাগীর রূপ খুলিল কোন লজ্জায়?—মাগীর চরিত্র নিশ্চয়ই আর ভাল নাই।

সেদিন রুক্মিনী নিজের ঘরে শুইয়া, কি করিলে ভাল-ভাবে বেঁচে থাকা যায়, তাহা সুমতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় তাহার উঠানে কে দৌড়িয়া আসিল। রুক্মিণী সুধাইল—কে রে? উত্তর হইল—আমি নিতাই।

পিসী, আমায় ঘুঁড়িখানা পেড়ে দেনা। রুক্মিণী ছুটিয়া উঠানে চলিয়া আসিল, দেখিল গাছে এক ঘুঁড়ি বাধিয়া আছে। রুক্মিণী কহিল—তুই আগে আমার কে বল? পাড়ার নিতাই কহিল—দেনা পিসী পেড়ে?—সবাই যে এখনি দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে আস্‌বে! রুক্মিণী কহিল—আগে বল, তুই আমার কে। নিতাই অধৈর্য্যভাবে বলিল—ও পিসী, আমি তোর বাপ্, আমি তোর বাপ যে পিসী। দেনা পিসী। রুক্মিণী গাছ-কোমর বাঁধিয়া ঘুঁড়ি পাড়িতে লাগিয়া গেল।

কার্য্য-পরিদর্শনে আসায়, গ্রামের ঐ মাঠে ম্যাজিস্‌ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িয়াছে। ম্যাজিস্‌ট্রেটের অনেকগুলি ছেলেমেয়েকে লইয়া দাই গ্রামের ভিতর বৈকালে প্রায়ই বেড়াইতে আসে—সকলের ছোট যেটা, সেটাকেও ঠেলা গাড়ীতে বসাইয়া ঘুরাইয়া নিয়া যায়। গ্রামের লোকে কেবলই তাহাদের চাহিয়া দেখে—বয়স্থ সাহেবের স্পষ্ট কথাই কেহ বুঝিতে পারে না, ঐ ছোটদের কথা বুঝিবে কে? রুক্মিণীর সহিত তাহাদের কিন্তু বড় ভাব হইয়া গেল—তাহাদের কথা বুঝিতে রুক্মিণীর কোন কষ্টই হইত না, রুক্মিণীকেও তাহারা বেশ বুঝিতে পারিত। তাহাদের হৃদয়গুলি নিয়া রুক্মিণী চিরদিনই

যেন জগতে একই ভাষা কহিয়া আসিতেছে—রুক্মিণী তাই কিছুতে পিছাইল না। তাই ভিন্নদেশের জল-বায়ুর ও আবেষ্টনের যে বিভিন্ন ভাষার-পৃথকতা, সেটা রুক্মিণীর হৃদয়ের নিকট আসিয়া শুখাইয়া গেল, তাহাকে আর প্রতারিত করিল না। ছেলেরা রুক্মিণীর উঠানে আসিয়া তার খোলার চালের উপর গুল্‌তি ছুঁড়িয়া শব্দ করে, রুক্মিণী অমনি টের পায়—সে ছুটিয়া আসে। কেহ রুক্মিণীর ঘরের ভিতর অবাধ-মনগতির মত ঢুকিয়া যায়, কেহ রুক্মিণীর কাঁধে চড়ে—কেহবা রুক্মিণীর বুকের কাপড় খসাইয়া দিয়া প্রবলভাবে হাসিয়া,বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে—ছোটমেয়েটী কেবলি কাঁচের-পুতুলেরমত ঠেলা-গাড়ীতে বসিয়া থাকে, রুক্মিণী তাহাকে বুকে তুলিয়া লয়।

রুক্মিণীর ব্যবহারে পাড়ার-লোকের কেমন হিংসা হইল ; তাহারা উহাদের সহিত ও রকম গায়ে মাখা-মাখি করিতে নিষেধ করিল—একে সাহেব তার উপর ম্যাজিষ্ট্রেট। রুক্মিণীর কিন্তু তাহাদের সাহেবের ছেলে বলিয়া তো আসলে মনে হয় না, বড়লোকের সন্তান বলিয়া মোটেই ভয় হয় না —রুক্মিণী তাই পাড়ার-লোককে সন্তুষ্ট করিতে কিছুতেই পারিল না। শেষে পাড়ার-লোক বলিতে সুরু করিল,—রুক্মিণী যেরকম মাখা-মাখি করিয়া

মুখে মুখ দিয়া চুমা-খায়, রুক্মিণীর জাতি নাই।—সে বিধর্ম্মি হইয়াছে। বিধর্ম্মি অপবাদ শুনিয়া, এইবার রুক্মিণীর একটু ভয় হইল—সে আবার একটু শুখাইতে লাগিল।—প্রস্ফুটিত-কুসুমে তপ্তবারি সিঞ্চিত হইলে যেমন সে শুখাইয়া ওঠে, রুক্মিণীও তেমনি শুখাইয়া উঠিল। ছেলেদের সহিত রুক্মিণী আর তেমন করিয়া খেলিতে পারে না।—তাহাদের চুমা-খাইবার সময় একবার রুক্মিণী চারিদিক দেখিয়া লয়। ছেলেরা রুক্মিণীর এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে কেবলই ঘুঁষি মারিতে সুরু করিল। এ রকম ঘুঁষি যাদুও যে রুক্মিণীকে কত মারিয়াছে—রুক্মিণী একেবারে লাফাইয়া উঠিল, দেখিল—যাদুতে তার কুটীর আজ ভরিয়া গেছে। কাঁচের-পুতুলের মত মেয়েটীর মুখে মুখ দিয়া সে আবার চুমা খাইল—মুখখানি ঠিক যেন তার খুকিরই মতন। রুক্মিণী গভীরভাবে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। রুক্মিণী চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো আমায় শুধুই তোমরা বাঁচিতে দাও! আমি হিন্দু হই, খৃষ্টান হই—আমি বাঁচিতেই শুধু চাই! ওগো আমার যে কেহই মরে নাই, কেন দেখিতেছ না, আমি বিধর্ম্মি কিসে? তোমরাও খুঁজিয়া দেখ, তোমাদেরও কেহ কখন মরে নাই—তবে ইহাদের কেন ভয় কর, কেন অবহেলা কর, কেন ঘৃণা কর!

আজ যে আমার মনে হইতেছে—ওগো, আজ যে রুক্মিণীর মনে হইতেছে—একা রুক্মিণী হিন্দু, তবু রুক্মিণী খৃষ্টান, তবু রুক্মিণী মুসলমান—ওগো, শুধুই আমি মানুষ। আমার খাদু যখন বিধর্ম্মি—তখন রুক্মিণীর ধর্ম্ম কোথায় রহিল! আমি কি দোষ করিয়াছি তোমাদের, যে আমার খাদুকে আর খুকিকে তোমরা কেবলই মরা দেখিতেছ—ওগো, কেমন করিয়া বুঝাইব, তারা আমার কেহই মরে নাই—কেহই মরে নাই—কেহই মরে নাই।—আমি যে বুকে চাপিয়া রহিয়াছি, তাহারা কোন দুঃখে মরিবে? হিন্দু হইয়া, খৃষ্টান হইয়া, মুসলমান হইয়া—ওগো, ভালভাবে আমি বাঁচাইতেই শুধু চাই।—তোমরা এমন-করিয়া আমায় বধ করিও না।—মরিলেই যে আমি পাপী হইব, বাঁচিতেই যে আমি আসিয়াছি।

———

সম্পাদকের ছুটি।

তৃতীয় কাহিনী।

সম্পাদকের ছুটি।

প্রথম চিত্র।

—:০:—

দেশের ঘরে-ঘরে আমার নাম; লোকের মুখে-মুখে আমার যশের কথা, চন্দ্রসূর্য্যেরও মনে যেন হিংসা জাগাইয়া তোলে। চন্দ্রসূর্য্য একদিন না উঠিলে আমার দেশের লোকের ক্ষতি আসে না, কিন্তু আমি যদি একদিন একটু গা-আড়াল দি, তবেই সেদিন অন্ধকার।—সমাজ-সংস্কার বল, ধর্ম্মবিচার বল, রাজনীতি বল—সর্ব্বক্ষেত্রেই আমার উপস্থিতির মুখ সকলেই চাহিয়া আছে। আমি দেশের একজন বিজ্ঞ-সম্পাদক। থাক্ রাজা, থাক্ শাসক-সম্প্রদায়—প্রকৃতপক্ষে আমিই দেশের নেতা, আমিই রাজ্যের রাজা, আমিই সমাজের অধিপতি। ধন্য আমার বিচক্ষণ-বুদ্ধি! রাজা প্রজা, ধনি দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ—সকলেই

সমান-ওজনে আমায় খাতির করে। আমার কথাই দেশের কথা, আমার অভিমতই দশের অভিমত, আমার যুক্তি-তর্কই পণ্ডিতের জ্ঞান। আমার মত কে আছে? আমার মত হইতে সকলেরই কামনা—কিন্তু, আজ তবু তোমরা আমায় ছুটি দাও। হে দেশবাসি, আজ তবু আমি ছুটি চাই; এই যশের হাত হইতে, এই নেতাগিরীর হাত হইতে, আমার সম্পদের হাজার লোভনীয় গৌরব সত্ত্বেও, তবু আমি ছুটি চাই; আমায় তোমরা ছুটি দাও। প্রবৃত্তির দুর্দমনীয় সংগ্রাম শেষ হইয়া আসিতেছে; এই-বার আমায় সন্ধি করিতে হইবে তাই আজ ছুটি চাই। আজ এই জীবনাকাশের পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়া, কেবলই পূর্ব্বচক্রবালের পানেই আমার দৃষ্টি ফিরিতে চায়। জগতের একদিক বাঁচাইতে, অপরদিক্ কাঁদিয়া ধ্বংস হইয়া যায়; সমাজের একদিক পরিষ্কার করিতে, অপরদিক কেবলই শ্বাপদ-শঙ্কুল হয়—কোনদিক সামলাইব;

আজ এই ছুটি নেওয়ার পূর্ব্বে, আমি কয়টি কথা তোমাদের নিকট নিবেদন করিয়া, আমার কর্ম্মকাতর জীবনকে অব্যাহতি দিব। তোমরা কেহ আর ঠকিও না, ভুলিও না—আমার মত এরূপ কাঁদিও না। সেদুঃখ অতীব যন্ত্রণাদায়ক, যে-দুঃখ দশের নিকট প্রকাশ করা

যায় না—নিজেও সবসময় ঠিক্ বুঝা যায় না। লোকে বলে অতীতের স্মৃতি আনন্দময়—কিন্তু জীবনের অনেক স্মৃতি আছে, যেগুলি প্রাণে কেবলই নিত্য-নূতন জ্বালা দিয়া যায়—অতীতের অনেক আনন্দও আছে, যারা ভবিষ্যতে একটা উজ্জ্বল-জীবনকে, কেবলই বিষের-চাদরে মুড়িয়া রাখিতে, চক্ষু মুগ্ধ করিয়া উদয় হয়। আনন্দের মাঝেও জ্বালা আছে—যাহা একদিন উত্তম, মঙ্গল, গৌরব-ময় বলিয়া মনে করিতাম, আজ দেখি—তারাই অধম, তারাই অনিষ্ট,—তারাই আমার হৃদয়ের ছোট-বড় প্রত্যেক কক্ষগুলি গভীর লজ্জায় ভরিয়া দিয়াছে। এতদিন কি করিলাম!—কিসের জন্য, কাহার পিছনে এমন প্রমত্ত-তায় ধাইয়া আসিলাম; কিইবা পাইলাম—এত যশ, এত গৌরব, এত সম্পদ, তবু হৃদয়ে-হৃদয়ে এ কিসের অন্ধকার, মর্ম্মে-মর্ম্মে এ কিসের জ্বালা, প্রাণে-প্রাণে এখনো তবু এ কিসের ব্যাকুলতা জড়ানো? লক্ষ সম্পদের হীরক-সৌধে বসিয়া, আমি আজ দীন হইতেও দীন। প্রত্যেক মানুষ আমায় খাতির করে; প্রকৃতি কিন্তু আমায় ক্ষমাও করিতেছে না।—তার চিরদিনের সমান চির-নিয়মে, অতীত-স্মৃতির কঠোর-বেত্রাঘাতে আমার মনকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। আমার এই বিশাল যশ-

গৌরবের মূল-আরম্ভ কোথায়, আমি সেইটাই আজ বলিতে চাই। তোমরা আমায় সহানুভূতি কর বা না-কর, ক্ষতি নাই,—কেবল তোমরা আমায় ছুটি দিও।

আমার জীবন তখন চোদ্দ-বৎসরের আধ-আলো আধ-অন্ধকারের সেই চঞ্চলতায় প্রমত্ত ছিল, মনের যে অবস্থা জগতের কিছুই গ্রাহ্য করে না, অথচ প্রত্যেক বস্তুকেই সে অসাধারণ মূল্যে আশ্চর্য্য সম্পদশালী মনে করে,—এই রকম জীবন যখন আমার না-যৌবন না-বাল্যের একটা অসামঞ্জস্য বিসদৃশ-অবস্থার নেশায় পূর্ণ ছিল, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা হটাৎ আমার মাতামহ আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমার মাতামহ নিহাৎ সদাশয় লোক ছিলেন; সুতরাং এরকম অসময়ে কাছারী-বাড়ী হইতে তলপ্ করাতে আমি কিছুমাত্র নিজেকে বিচলিত মনে করিলাম না—তাভিন্ন, এই মা'বাপহীন ছেলেটার মাতুল-সংসারে একটু বিশেষ প্রতিপত্তির কারণও তিনি; মামারা আমায় কোন কাজে শাসন করিতে আসিলে, তাঁকে আমি বলিতে শুনিয়াছি—'আমি যতদিন আছি, সেকটাদিন তোমরা একটু ওর উৎপাত সহ্য কর'।—আমি তখন একথার অর্থ বা উদ্দেশ্য কিছুই

বুঝিতাম না ; আমার বুকটা কেবল আবার নূতন দুষ্টামির কল্পনায় ফুলিয়া উঠিত।

কাছারী-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মাতামহ আফিমের নেশায় চক্ষু বুজাইয়া ইজিচেয়ারে কাত হইয়া আছেন ; আমাকে দেখিয়া, বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি গিয়া কালি-মাখানো চাদরখানার উপর বসিলাম। মাতামহ একবার তাঁর অভ্যাস মত কথা বলিবার আগে গলাটা ঝাড়িয়া আমাকে কহিলেন—অনঙ্গ, এবৎসরও তুমি ক্লাসে উঠ্‌তে পার নি ?

সত্যই, উপর্যুপরি দুই বৎসরই আমার সময়টা মন্দ চলিতেছে। কিন্তু মাতামহের এরকম প্রশ্নে আমি যারপর-নায় বিস্মিত হইলাম ; কেননা জীবনে এই ক্লাসে না-উঠিতে পারা অবস্থাটাকে তখনো পর্য্যন্ত আমার আসলে একটা অশুভ বা কোন নিরানন্দকর বলিয়া মনে হয় নাই। আমি মনে করিলাম—এই সামান্য কথার জন্য তিনি আমায় কাছারী পর্য্যন্ত তলপ্ করিয়া পাঠাইয়াছেন। মনের সে-অবস্থা দমন করিয়া পরিষ্কার ভাবে উত্তর দিলাম—আজ্ঞে না, আমি এবছরও উঠ্‌তে পারিনি ;—নিতাই আর সুরেন্দ্র তারা দু'জনেই ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হ'য়েছে—

নিতাই আর সুরেন্দ্র আমারই সমবয়সী দু'জন মামাত-

ভাই। আমি আরো-কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, মাতামহ আমাকে বাধাদিয়া একটা নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—নিতাই আর সুরেন ফার্ষ্ট'ই হোক্, আর জলপানিই পাক্, তাতে তোমার আর কি—তুমি কি তাদেরই চাকর-সেজে জীবনটা কাটাবে মনে ক'রেচ ?

সেই চোদ্দ-বৎসর বয়সেও 'চাকর-সাজা' কথাটা শুনিয়া, হটাৎ আমার বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। মাতামহের মনের এরকম ধারণাকে সবলে খণ্ডন করিবার জন্য, আমি কথা খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াসে একবার ঘরের আস্‌বাবপত্রের দিকে চাহিয়া, দূরের পুকুরঘাট পর্য্যন্ত নিজের উৎসুক দৃষ্টিকে পাঠাইয়া দিলাম ; কিন্তু মাতামহের মুখের উপর প্রতিবাদ করিবার মত তেমন কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলাম না—কেবলমাত্র একটা ঘৃণার তাচ্ছিল্যে আমার মুখটা বিকট হইয়া উঠিল।

মাতামহ কি বুঝিলেন, কেবল তিনিই জানেন, তিনি বলিলেন—তা নয় তো কি, যতদিন আমি আছি ততদিন বুদ্ধিক'রে নিজের দিন কিনে নাও।—তা না হ'লে, বরাতে তোমার কষ্ট আছে অনঙ্গ !

বলিতে-বলিতে মাতামহ চুপ করিলেন। আমার দাড়াইতে আর এতটুকু ইচ্ছা হইল না ; তিনি আফিমের

নেশায় আবার ঢোলা সুরু করিলেন দেখিয়া, আমি আস্তে-আস্তে সরিয়া পড়িলাম।

আমি সদরের কাছে আসিয়াছি, এমন সময় আমাদের উড়ে-মালিটা পিতলের ঘড়া কাঁধে করিয়া পুকুরঘাট হইতে আসিতে-আসিতে পরম উৎসাহে আমাকে বলিয়া উঠিল—অনিঙ্গ বাবু, আর ভয় নেই—একটা মস্ত সাধু আসিছে,—ওষুধ দিইকিড়ি, তোমায় কিলাসে উঠোয় দিবে।

আমি গম্ভীরভাবে কহিলাম—দূর্ বেটা, সব বেটার মন্ত্রই দেখা গেছে, বেটারা চোর।—উড়েমালি আমায় বাধা দিয়া কহিল—না অনিঙ্গ বাবু, তোমার সেই বুড়ো-সাধু।

আমার বুকটা কেমন দুলিয়া উঠিল; আমি তাড়াতাড়ি কহিলাম—কে? যে হীমালয় থেকে আমায় পরেশ-পাথর এনে দেবে ব'লেছিল?

মালি দ্বিগুণ উৎসাহে বলিয়া উঠিল—হঁ—হ'—সেই বুড়োসাধু—

আমি আর দাঁড়াইলাম না; সন্ন্যাসীর উদ্দেশে উধাও হইয়া চলিলাম—উড়ে-মালিটাও আনন্দে একটা চীৎকার করিতে-করিতে আমার পিছনে ছুটিল।

চোদ্দ-বৎসরের ছেলের ইহা মোহ বলিতে হয় বল,—

আমার কিন্তু সেরাতে হৃদয়ে ভয়ের পরিবর্ত্তে এক নূতন ধরণের আনন্দের উৎসাহ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যার তীক্ষ্ণ ব্যস্ততায় আমি একদিন গভীর রাত্রে পরশ-পাথর খুঁজিতে, সেই বৃদ্ধ জটাজুট সন্ন্যাসীর সহিত বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসীর সহিত গ্রামের বাহিরে আসিয়া, আমার মনে ভয়ের পরিবর্ত্তে কেবলই একটা আত্ম-প্রসাদ ফুলিয়া-ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে রহিল। আমার মনে হইল—নিতাই বল, সুরেন্দ্র বল, তারা শিখুক যত লেখেপড়া শিখিতে পারে, যত ফাষ্ট সেকেণ্ড হইতে পারে হোক্; আমি একবার এই পরেশ-পাথর হাতগত ক'রতে পার্‌লে সকলকেই তাক্ লাগিয়ে দেব। কিসের জন্যে আমি ওদের চাকর-সেজে জীবন কাটাব—পরেশ-পাথর দিয়ে সোনা তৈরী ক'রে, আমি দাদাম'শায়ের চেয়েও বড় লোক হব; তখন কত ভাল-ভাল লেখাপড়া-জানা লোককে আমারই চাকর ক'রে কাজ করাব—দাদা ম'শাই পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে। তবে, পেনিকে তখন একটা ছোট টাট্টু ঘোঁড়া কিনে দিতে হবে।

পেনি আমার এক মাসাত বোন—এই ছোট মেয়েটাই তখন আমার জগতে একমাত্র প্রিয়-জিনিস ছিল। অল্প-বয়সী বালক যখন যাহাকে ভালবাসে, তখন অন্ধভাবে

নারীরই মত নিজের হৃদয় ঢালিয়া দেয়—যে ভালবাসার পুরস্কারস্বরূপ ভবিষ্যৎ-জীবনে, কেবলই একটা প্রচ্ছন্ন নিভৃতের বেদনাই তার একমাত্র সম্বল থাকে। তখন বুঝিতাম না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, বিধাতা জীবনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ বহুপূর্ব্বে ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন—এই জীবনে পেনির আর আমার পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কি ক্ষণেই যে সেরাতে বাড়ী ছাড়িয়া ছিলাম জানি না; আজ এই বৃদ্ধ-বয়সে, যখন একটা স্নেহ-কোমল সদয় ব্যবহারের শীতলতার জন্য, প্রাণ নিত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে—যখন কোন স্নেহ-করুণ সোহাগ দৃষ্টিই বৃদ্ধের এই শিথিল হৃদয়ের ব্যস্ততা স্পর্শ করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া তোলে না, তখন আমার শৈশবের সেই পেনিরই কথা মনে পড়ে, যে পেনির সঙ্গে গৃহত্যাগের দিন সন্ধ্যাবেলা শিব-মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়া, আমি তাহাকে খুব আশা দিয়া, গম্ভীর বয়স্কের মত অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—উপার্জ্জন করিতে শিখিলে, নিশ্চয়ই সব-প্রথমে আমি তাহাকে একটা টাট্টু ঘোঁড়া কিনিয়া দিব;—সেই রাতে আমার সঙ্গে তার শেষ দেখা। সে পেনি আর নাই; কিন্তু আমার অঙ্গীকারটি আজও আমার বুকে জাঁকিয়া আছে, এখনো যখন একটা দুরন্ত সপ্রতিভ-

জীবনের শান্তি

কচিমেয়ের মত, সন্ধ্যা বড়-বড় তাল ও নারিকেল গাছের মাথাগুলি স্পর্শ করিয়া নিজের সভয় লাজুকতায় কাঁপিতে থাকে, আজও তখন আমার কাণের কাছে কে যেন বলিয়া ওঠে—টাট্টু ঘোঁড়া কৈ ?—আজ এই দীর্ঘপরিপক্ক-জীবন ব্যাপী আমি যেন পেনিরই ঘোঁড়া কিনিবার জন্য, যত যশ, মান, সম্পদের-ধুলি কুড়াইয়া ফিরিতেছি—সে তাই নিত্য সন্ধ্যাবেলা এম্‌নি করিয়া আমায় তাগাদা করে। কিন্তু এই পেনি-কেও একদিন ভুলিয়াছিলাম—সেই কথাই আজ বলিব। যাহার জন্য পেনিকে ভুলিয়াছিলাম, তাহাকেও একদিন আবার ভুলিলাম—একটার উপর ভর করিয়া, অপর আর একটাকে ভুলিয়া যাই ; এইরূপে কেবলই ভুলিতে-ভুলিতে, একটির জন্য আর একটিকে ছাড়িতে-ছাড়িতে আজ জীবনের সন্ধ্যার দিকে আগুয়ান হইয়া আসিয়াছি—এখন কেবল জীবনকেই ভুলা যেন দুসাধ্য হইয়াছে। সব ছোট-বড় সুখ, আনন্দ, প্রীতি, ভালবাসা নির্ব্বিঘ্নে ভুলিলেও, ঠিক তেমনি সহজে জীবনকে ভুলিয়া, মৃত্যুকে ধরিতে এই নিরস-বয়সেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

দ্বিতীয় চিত্র।

অন্ধকার আর নির্জ্জনতা; পৃথিবীতে জোনাকীর আলো, আর আকাশে নক্ষত্রের ক্ষীণতাভিন্ন জগতে যেন আর কিছুই নাই। আমি আর সেই সন্ন্যাসী, কখনো বনের ভিতরের সরু পায়েহাঁটা-পথ দিয়া, কখনো নদীর চড় ভাঙ্গিয়া, কখনো গ্রামের ভিতর দিয়া, কখনো বা আবার জোর করিয়া মণ্ডলাকার জঙ্গল দু'ভাগ করিয়া, চলিয়াছি—আমরা দুজনেই প্রায় নীরব; যেটুকু কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সে কেবলই সন্ন্যাসী আমাকে পথ চলিবার গতিবিধি বলিয়া দিতেছিল, আর সামনে ডোবা, খাল বা কোন উঁচু জায়গা দেখিলে আমায় সাবধান করিতেছিল, ইহাভিন্ন বড় কোন কথাই হয় নাই।

এইরূপে কতদূর যে চলিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পথও আর ফুরায় না, রাতও আর শেষ হয় না—পথক্লান্তির অবসন্নতার সঙ্গে-সঙ্গে অন্তরে একটু কেমন ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। প্রথমে মন যতটা পরি-

মাণে উৎসাহে জাগিয়া উঠিয়াছিল, এখন আবার ঠিক্ ততটা পরিমাণে ভয়ের হতাশায় দমিতে সুরু করিল। আমি শেষ অধৈর্যভাবে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হিমালয় আরো কতদূর, রাতের মধ্যে পরেশ-পাথর নিয়ে, বাড়ী ফির্‌তে পার্‌ব' তো?

অন্ধকারে সন্ন্যাসীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, তবু যেন মনে হইল সে একটু হাঁসিল; হাসিয়া সন্ন্যাসী কেবলমাত্র আমার কাঁধ্‌টা থাব্‌ড়াইল, কথার কোন জবাব দিল না। আমার মনে একটু লজ্জা হইল; ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হয় তো নিহাৎ আমায় ভীতু ঠাহরিল—সুতরাং আবার নীরব থাকিয়া, কেবল চলিতেই রহিলাম। চলিয়া চলিয়া এক নদীর তীরে আসিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। সন্ন্যাসী দাঁড়াইল, আমাকে বলিল—এইবার এই নদীটা পার হ'তে হবে।—হেঁটেই পার হওয়া যায়—কাপড় খুলে, মাথায় বাঁধ্‌!—

সন্ন্যাসীর কথাটা কেমন আমার অপ্রিয় ও তিক্ত ঠেকিল; কেননা, আমাদের গ্রামে যখন সে ছিল, তখন যাঃস্বরনায় আমাকে স্নেহ-মমতা করিত, এখন হটাৎ এরকমভাবে হুকুম করাতে আমার মনটা বেঁকিয়া দাঁড়াইল—তবু স্পষ্ট আমি কিছুই বলিলাম না।

শুধু কহিলাম—কাপড় ভেজে ভিজ্‌বে—কিন্তু আমি যে আর চ'ল্‌তে পার্‌চি না। সন্ন্যাসী যেন আমার কথা শুনিতেই পাইল না, এমনি ভাবে আবার বলিল—নে নে, আর দেরী করিস্‌নি—চল্‌; রাত শেষ হ'য়ে এল। কাল অমাবস্যা!—

সন্ন্যাসী আরো যেন কি বলিতে যাইতে ছিল, চুপ করিয়া তার পরনের লালরঙে ছোপান কাপড়খানা হাঁটু পর্য্যন্ত তুলিয়া, আমার কোন রকম বলা-কহার অপেক্ষা না করিয়া, পথ দেখাইয়া জলে নামিল। আমরা পল্লী-গ্রামের ছেলে, সাঁতারে খুবই পরিপক্ক—তবু তাহাকে অনুসরণ করিতে আর মোটেই আমার পা উঠিল না; আমি খুঁটী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্ন্যাসী একটু-থ.ইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া একটু শাসনের তীব্রতায় কহিল—দাঁড়িয়ে রইলি যে?—

দাদামহাশয়কে প্রজাদের ও অধিনস্থদেরই তুই-তাচ্ছিল্যে কথা বলিতে শুনিয়াছি, সুতরাং আমি একটু ক্ষুণ্ণ-রাগভরে ঝট্‌ করিয়া বলিয়া উঠিলাম—তুমি আমায় 'তুই-মুই ক'রচ কেন; আমার পরেশ-পাথরে দর্‌কার নেই—আমাকে বাড়ী যাবার পথ ব'লে দাও!—

আমার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে, সন্ন্যাসী

চীলের মত ছোঁ-দিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া হড়-হড় করিয়া জলের উপর দিয়া নদীর ওপারে টানিয়া চলিল। কোন রকম আপত্তি করিবার মত কোন শক্তিই আমার হইল না। জলের ভিতর দ্রুত চলা শক্ত—আমি কতবার পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। নাকে-মুখে জল ঢুকিয়া থাকিয়া-থাকিয়া আমার দম বন্ধ হইবার জো হইতে লাগিল। আমি ভয়ে একেবারে মরা হইয়া গেলাম। নদীর পরপারে আসিয়া বালির উপর দিয়া সন্ন্যাসী আমায় সেই সমান-ওজনেই টানিয়া চলিল। বিপদে উদ্ধার করিবার মত কাছে যখন কোন সহায়ই থাকে না, তখন ভয়টাই ভরসা হয়; তাহা না হইলে সেদিন সেই ভয়েতেই আমার মরা উচিতছিল—কিন্তু আমি হুঁচোট্ খাইয়া, বালি মাখিয়া, জলের বিষম খাইয়া তবু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সমান তালে পা রাখিয়া চলিয়াছিলাম। কিছুদূর আসিয়া এক গাছের তলে সন্ন্যাসী আমায় ঠুকিয়া বসাইয়া দিয়া কহিল—ব'স্ এখানে, আমি আস্‌চি—

বলিয়া সন্ন্যাসী কাছেরই বনের মধ্যে মিলাইয়া গেল। আমি এতই বেদম হইয়া পড়িয়াছিলাম যে কোন কথা বলিয়া তাহার দয়াকে জোর করিয়া জাগাইয়া তুলিবার আমার শক্তি ছিল না; আমি কেবলই

বাকহীন করুণ দৃষ্টিতে তার মুখ পানে চাহিলাম। তারপর আমি আর বসিতে পারিলাম না; সেইখানেই আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ শুইয়াছিলাম জানি না, তবে দুটো বাকযুদ্ধের ক্রুদ্ধ-ধ্বনিতে আমার যেন চেতনা আবার ফিরিয়া আসিল। আমার পাশেরই জঙ্গলের মধ্যে এইরূপ কথা কাটাকাটি চলিতেছিল; মনে হইল দুই ব্যক্তি যেন কলহ করিতে করিতে সেই জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। একজনের কণ্ঠ আমার পরিচিত, আর অপর-ব্যক্তির স্বর পরিচিত না হইলেও, সে-স্বর যে গভীর ক্রোধব্যঞ্জক তাহা বেশ বুঝিলাম। একটু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, সেই সন্ন্যাসী আসিতেছে,—তাহার সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোক বলিল—খবরদার, আর আমায় ওসব কথা ব'লিস্‌নে। তোর জন্যে আমি অনেক ক'রেচি—নিজেকে পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েচি। আর আমি ওসব পার্‌ব' না।

সন্ন্যাসী খুব মিনতি-স্বরে এইরূপ বলিল—আর তিনটে হ'লেই যে সিদ্ধ হ'ব কোনকরি, তীরের কাছে এনে নৌকা ডুবিয়ে দিবি?

সে-নারী গর্জ্জিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিল; কহিল—থাম্ থাম্, আর ভণ্ডামি বাড়াস্‌নি।—আমি নিজেকে

তোর হাতে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি—আমায় নিয়ে যা পারিস্ কর্; আমি ওসব আর পারবো না—

সন্ন্যাসী বাধাদিয়া আরো মধুর বিনীত-কণ্ঠে কহিল—তুই যদি এমন করিস্ ক্ষেমঙ্করি, আমার যে তাহলে কিছুই হবে না—আমি যে শব হ'য়ে যাব।

এইরকম কথা কহিতে-কহিতে দু'জনেই বনের বাহিরে আমার নিকট আসিল; সন্ন্যাসী আমাকে কহিল—এই ওঠ্, এঁর সঙ্গে যা, ইনি তোকে পরেশ-পাথর দেবেন—

সে-নারী চোখ পাকাইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিল; সন্ন্যাসী যেন কি ইঙ্গিত করিল। সে-নারী মুখ পাকাইয়া, গর্জ্জিয়া সন্ন্যাসীকে বলিল—তোকে যদি না আমি একদিন কেটে এই নদীর জলে ভাসিয়ে দি, তো কি ব'লেচি।

'এর সঙ্গে যা'—এই কথাটি শুনিয়া আমার তখন কার জীবন-বিধাতাকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার বোধহয় বড় ইচ্ছা হইয়াছিল; তাই আমি একবার নিখুঁত করিয়া সে-নারীকে দেখিয়া লইলাম। সেরকম দেহের বাঁধন, শক্ত-সুডৌল গঠন আমার চক্ষে আজও পড়ে না—হটাৎ দেখিলেই তাহাকে পূর্ণযুবতী বলিয়া মনে হয়।

তাহার এলো-চুলেরগোছা প্রায় হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে, গায়ের রং কতকটা লাল্‌চে ভাব, জ্বলা-জ্বলা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মধ্যে-মধ্যে প্রবাল বসান। পরনে তাহারো ঐ সন্ন্যাসীর মত একখানা লালরঙের কাপড়; কিন্তু কাপড় পরিবার-ধরণ সাধারণ নারী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তখন তার কাপড়-পরা দেখিয়া, আমাদের গ্রামের বৈষ্ণব-বাবাজীর কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল। কাপড়ের-কষি তার কোমরে গোঁজা ছিল না; কাপড়ের দুই খুঁট্‌ বুক ঢাকিয়া ঘাড়ের উপর গিঁঠ্‌ বাঁধা। তাহাকে দেখিয়াই তখন কেমন আমার তাহার আদর-যত্ন পাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছিল, এমনই তাহার সমস্ত দেহের উপর একটা স্বাভাবিক শোভা, বড় কোমল-স্নেহে ছড়ানো ছিল। যথার্থপক্ষে, তাহাকে দেখিয়া আমার ভয় অনেকপরিমাণে সরিয়া গিয়াছিল;—তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য, সত্বর আমি প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। তখন যে, কি-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা আমি আজিও বলিতে পারি না; তবে এই কথাটি তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে,—"তুমি কি আমায় নিয়ে যাবে"—

বলিতে-বলিতে আমি একেবারেই তাহার কাছ-ঘেঁসিয়া, সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। নারীও আমার কাছে একটু সরিয়া আসিয়া, তার হাতখানা আমার মাথার উপর রাখিয়া, কহিয়াছিল—হাঁা, চল।---তাহার কথা শুনিয়া, আমার নাক বাহিয়া ফোঁস্ করিয়া একটা নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। কি জানি, সে-নারী কি বুঝিল,—তার কোলের কাছে আমাকে একটু টানিয়া লইয়া, খুব অল্প একটু হাঁসিয়া কহিল---কেন, তুমি আমাদের কাছে থাক্‌বে না?

সেদিন সেই অচেনা রমণীর কথাগুলি আমার যত মিষ্ট লাগিয়াছিল, সেরকম মিষ্ট আর কোন প্রিয়জনের কথাই আমার আজিও মনে হয় না। তার সেই হাসি আর রহস্য-ভরা তামাসার প্রশ্নটি শুনিয়া, আমার চোখ দুটো ছল-ছলে হইয়া উঠিল; আমি দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

তারপর দেখিলাম, সন্ন্যাসী আর সেখানে নাই; জঙ্গলের মাঝে আবার মিলাইয়া গেছে। আমি তখন সে-রমণীর কোলের কাছে আরো একটু সরিয়া আসিলাম। তার গায়ের সঙ্গে আমার গা একেবারে মিলাইয়া দিয়া, দু'হাতে তাহার কোমরটা জড়াইয়া তাহার পেটের উপর আমার

মুখটা গুঁজিয়া দিয়া, আমি আর থাকিতে পারিলাম না—হটাৎ ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। সারারাত পথ-শ্রান্তি—সমস্ত রাত্রের মধ্যে চোখে একটু ঘুম নাই; তারউপর প্রাণে দারুণ ভয়। ভিজে কাপড় পরিয়া, বালি মাখিয়া, আমার দেহ সব সাদা হইয়া গিয়াছিল;—চকিতেরমধ্যে রমণী আমার দেহ পরিষ্কার করিয়া দিয়া, আমার ভিজে কাপড় নিজে পরিবার জন্য খুলিয়া লইতে গেল; আমি কিছুতেই তাহার সামনে কাপড় ছাড়িব না। এতক্ষণপর সে আবার একটু হাঁসিল,—এখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, মৃত্যুর-পরশনে এজীবনকে ভুলিলেও, যেন তাহার তখনকার সে-হাসিটিকে না ভুলি—সেহাসি এতই গভীর-শোভার-মধুরতায়, অল্প হইলেও, পরম উজ্জ্বল ছিল।

রমণী হাঁসিয়া জোর করিয়া আমার কাপড় ছাড়াইয়া লইতে লইতে বলিল—গোপালরে, তুমি যে ছেলে মানুষ ধন! আমিও একদিন ছেলের-মা ছিলেম; আমার ছেলে আজ থাকলে, তোমারই মত এত বড়টি হ'ত।

বলিতে-বলিতে রমণী একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর আমার ভিজে কাপড়খানি নিজে পরিয়া, তাহার সেই লাল-কাপড় আমাকে পরাইয়া দিয়া, একেবারে আমাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, হন্-হন্ করিয়া নদীর তীর ধরিয়া চলিল।

আমি নিতান্ত কাহিল ছিলাম না—তবু, সে আমাকে বেশ সচ্ছন্দে বুকের উপর লইয়া, সেই বালির উপর দিয়া ক্ষিপ্র-গতিতে চলিতে লাগিল। আমার শ্রান্ত-চক্ষু বুজাইয়া, তাহার কাঁধের উপর আমি মাথা রাখিলাম। বোধহয় সেই অযাচিত স্নেহের-পরশনে আমার নিদ্রালস চোখে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; হটাৎ এক কর্কশ-কথার উচ্চ-স্বরে সে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সেকণ্ঠ আমাদের পিছন হইতে শোনা গেল; সেকণ্ঠ কহিল—ক্ষেমঙ্করি, এপথ দিয়ে, এরে কোথায় নিয়ে যাস্?

রমণী যেন প্রস্তুত হইয়াছিল, বলিল—পোড়ারমুখো, তোর শ্রাদ্ধ ক'র্তে। আমি চোখ চাহিয়া দেখিলাম, কিছু-দূরে সন্ন্যাসী ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে; সন্ন্যাসী উচ্চ-স্বরে বলিল—দাঁড়া ব'ল্‌চি ক্ষেমা, ভাল হবে না।

তখনকার সন্ন্যাসীর সেই ছুটিবারধরণ ও চোখেরভঙ্গি দেখিয়া, আমার এত ভয় হইল যে, আমি অস্ফুটভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। রমণী কেবল আর একটু বুকের উপর আমায় টিপিয়া ধরিয়া, নির্ভিকভাবে তাহার স্বাভাবিক-গাম্ভীর্য্যে সন্ন্যাসীর দিকে মুখ করিয়া, আস্তে আস্তে দাঁড়াইয়া পড়িয়া, অপেক্ষা করিতে রহিল। সন্ন্যাসী নিকটে আসিলে, রমণী শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে সন্ন্যাসীকে

বলিল—ভাল চাস্ যদি, ফিরে যা—আমি একে সহরে পৌছে দিয়ে আসি।

সন্ন্যাসী তার জটাশুদ্ধ-মাথাটা বিপুলভাবে নাড়িয়া, বলিল—না, কিছুতেই না—আমার একে চাই-ই।

রমণী চোখ পাকাইয়া কহিল—কী? পুরনো কথা সব ভুলে গেছিস্ বুঝি?—আমার অ-মতে তুই কোনদিন, কোন কাজ ক'র্‌তে পেরেছিস্? আজ তুই একে আমার অ-মতে কেমন নিয়ে যাবি, যা দেখি—

রমণী আরো কি সব বলিতে যাইতেছিল, সন্ন্যাসী তাকে বাধাদিয়া চটাৎ ভয়ের ব্যাকুলতায় বলিয়া উঠিল—ক্ষেমি, ক্ষেমি, মারা গেলি তুই—মারা গেলি! একি, বালির ভেতর ক্রমশঃ পা-দুটো যে তোর ব'সে যাচ্চে—

আমিও দেখিলাম; প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত রমণীর পাদুটো কে যেন বালির ভিতর শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী আমাকে রমণীর কোলের উপর হইতে ছিঁনাইয়া নামাইয়া লইতে, আমার হাতদুটো ধরিল। রমণী ভীষণভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার ব'লছি—

সন্ন্যাসী কাঁদ-কাঁদভাবে ব্যস্ততায় কহিল—চোরাবালির-কবরে আজ আমার চ'খের সাম্‌নে, দু'দুটো মানুষ যে পোতা-হ'য়ে ম'রবি ক্ষেমি, ছাড়্ একে—

এখন এই বৃদ্ধ-বয়সে ভাবিতেছি, সন্ন্যাসীর কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল;—তখন কিন্তু, আসন্ন-মৃত্যুর কোল হইতেও নামিয়া, সেনিষ্ঠুরের কাছে যাইতে আমার মন সরে নাই।

রমণী পূর্ব্ববৎ উচ্চ-কথার সঙ্গে বিদ্রূপের হাসি মিশাইয়া, কহিল—দুটো এক সঙ্গে মরি যদি, তাতে ভয় কি;—তুই শীঘ্রই সিদ্ধ হ'বি।

———

তৃতীয় চিত্র।

—⊱✽⊰—

আমি মরিলাম না, আমি বাঁচিলাম!—কিন্তু আমাকে বাঁচাইবারই জন্য একজন চিরদিনের মত ধরণীর বুকে চাপ পড়িয়া রহিল—কিছুদিন পর আমারও তাহাকে আর মনে ছিল না; আমি আর একজনকে পাইয়া, আমার জীবনদাত্রিকেও ভুলিয়া গেলাম—তার নাম চারুশীলা; প্রায় আমারই সমবয়সী।

ক্ষেমঙ্করীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী পাগল হইয়া গেল; কেবল বিজ-বিজ করিয়া বকিত, আর উলঙ্গ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত—কিন্তু আমাকে সে ছাড়িতে পারিত না। শেষ আমাকে যে সে কিরূপ যত্ন-মমতা করিতে আরম্ভ করিল, তাহা বলিয়া জানান যায় না। আমার কিন্তু, সে বনজঙ্গলে তাহার কালিমন্দিরের গণ্ডির মধ্যে যেন প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিত। সে নিজে প্রায়ই কিছু খাইত না, কিন্তু আমাকে যে ঠিক্ সময়ে কোথা হইতে প্রত্যহ নানাবিধ খাদ্য আনিয়া খাওয়াইত,

তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। তবু আমার মন মোটেই টিঁকিত না; কতবার পলাইয়া লোকের-সমাজে আসিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু পথ ঠিক্ ধরিতে পারি নাই। সন্ন্যাসীকে যতবার আমি, আমায় মানুষ-সমাজে রাখিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছি, ততবারই সে কেবল আমায় জড়াইয়া ধরিয়া, আকাশেরপানে মুখ করিয়া নিছাৎ বোধহীন শিশুর মত ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, —আমি কেবলই স্তব্ধ হইয়া গেছি। সন্ন্যাসীর সে-কান্না মনে পড়িলে, আজও আমার চ'খে জল আসে।

একদিন বিকালবেলা আমি এপাশ-ওপাশ করিয়া বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি: এমন সময় হটাৎ দেখিলাম, জনকয়েক বেশ পরন-পরিচ্ছদে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভদ্রলোক বন্দুক হাতে করিয়া ঘুরিতেছে। আমাকে দেখিয়া তাহারা বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—আমায় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। আমি এতদিন পর মানুষের মুখ দেখিয়া যেন একেবারে বোবা হইয়া গেলাম; তাদের কোন কথারই জবাব দিতে পারিলাম না।—কিন্তু তাহাদের সঙ্গও আমি ছাড়িতে পারিলাম না।—মুখ শুখাইয়া তাহাদের পিছু-পিছু ফিরিতে লাগিলাম। একটি বন্দুক-আহত মৃগ রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের সঙ্গে দেখিয়া, মনে

বুঝিলাম—তাহারা শিকার করিতে আসিয়াছে; কিন্তু স্পষ্ট করিয়া তাদের খুলিয়া কিছুই বলিতে পারিলাম না। সন্ধ্যাও সময় তারা যখন বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল; তখন আমি কেবল তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। একটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?—আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। সেইদিন আমি বন ছাড়িয়া, মানুষের সমাজে আবার ফিরিয়া আসিলাম—ক্রমে-ক্রমে আমার বন-জীবনের ইতিহাস সবই ভুলিয়া গেলাম।

আমি যে বাবুর বাড়ী চাকর বলিয়া স্থান পাইলাম, সে বাবুটি বড় সৌখিন—নব্যগুণ-সম্পন্ন। নামেই আমি চাকর রহিলাম, গৃহিণী ও কর্ত্তা আমাকে নিজের সন্তানেরই মতন মনে করিতেন। এই বাবুর নাম—সুদর্শন রায়। সুদর্শনবাবুর বাড়ীতে আমার দৈনিক কাজ-কর্ম্ম খুবই অল্প ছিল—সকালে ও বিকালে চা তৈরী করিয়া সকলকে চা বিলি করা, বাবুর একটী ছোট ছেলেকে দেখা-শোনা করা, আর বাবুর বড় মেয়েকে স্কুলে দিয়া আসা, ও বিকালে গিয়া স্কুল হইতে লইয়া আসা। এই মেয়েটীরই নাম চারু-শীলা। চারুশীলা মা-বাপের যারপরনায় আদুরে-মেয়ে ছিল। গৃহিণীকে বা কর্ত্তাকে আমার যত ভয় কি সমিহ না হইত,

সংসারের এই শিক্ষা-নবিশ মেয়েটীকে, তার চতুর্গুণ আমার ভয় করিত ; আর আমিও যত তাহাকে ভয় করিতাম, সেও ততই আমাকে তাচ্ছিল্য, অপদস্থ ও অপমান করিত। আমার কেমন তবু তাহাকে বড় ভাললাগিত ;—চারুশীলার গলা ধরিয়া থাকিয়া-থাকিয়া, আমার বলিতে ইচ্ছা হইত— ওগো, আমি চাকর নই, আমি তোমারই মত একজন ধনী, মানী—উচ্চ-বংশের সন্তান। কিন্তু বলিতে পারিতাম না— কেই বা আমার কথা বিশ্বাস করিবে,—মামাদের কাছে কি বলিয়াই বা আবার আমি ফিরিয়া যাব ? মামাদের আমি চিরদিনই শাসনের জন্য বড়ই ভয় করিতাম—সেই শাসনের ভয়েই দাসত্ব করিতে রহিলাম।

চারুশীলার অশ্রদ্ধায় ক্রমে-ক্রমে আমার কেমন মনে জিদ্ জন্মিল—তাহাকে আমার নীচু করিবার জন্য, নিরন্তর আমার মন উৎসুক হইয়া থাকিত।—একে সে মেয়ে-মানুষ, আমি পুরুষ-মানুষ, তার উপর আবার সে আমাপেক্ষা দুই এক বৎসরের ছোট, কি প্রায় সমবয়সী—এক্ষেত্রে আমি কোনক্রমেই, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে চারুশীলার চাকর করিয়া, হীনভাবে রাখিতে পারিলাম না।

একদিন আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল ; আমার অন্তরের ভাব প্রকাশ হোক আর নাই হোক, আমি একটা

কথা সেদিন চারুকে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেদিন বিকালে স্কুল হইতে লইয়া আসিতে আমার একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল; চারুকে স্কুলে আমার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমি স্কুলের গেটের কাছে আসিয়া দেখিলাম, চরু তার আরো ক'জন সঙ্গিনীর সঙ্গে অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া চারুর সঙ্গিরা চারুকে কহিল—ঐ গো যাঁর পথ-চেয়ে কাতর হচ্ছিলে, তিনি ঐ উদয় হয়েছেন। এ কথাটা শুনিয়া আমার ভিতরটা যে একটু রসযুক্ত না হইয়াছিল, এমন নয়—আমি একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া ছিলাম। কি জানি, আমার এই হাসি দেখিয়া চারু একেবারে জ্বলিয়া গেল; আমাকে যা-তা বলিতে-বলিতে বাড়ী ফিরিতে লাগিল। আমি সেদিন তাহাকে বলিয়াছিলাম—ঠাকরুণ, হাজার হলেও তুমি মেয়ে-মানুষ আর আমি পুরুষ মানুষ—সে কথাটা ভুলে যাও কেন?

সংসারের গৃহিণীও, চারুর নিকট হইতে আমার বিপক্ষে এই কথাটার নালিশ শুনিয়া, একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া ছিলেন; আবার তখন অবশ্য এই আদুরে মেয়েটার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিবার জন্য—আমাকে অনুরোধও করিয়া ছিলেন। চারুর নিকট হইতে ক্ষমা চাহিবার সময়, সেদিন

আমার চোখ-কাণ ঝাঁ-ঝাঁ করিয়া উঠিয়াছিল; অন্যকিছু হইলে আমি হয়তো কাঁদিয়া ফেলিতাম—সেদিন কিন্তু অশ্রুর পরিবর্ত্তে, আমার পুরুষ-প্রকৃতি, দুই চক্ষু দিয়া কেবল আগুণের হল্কা উদ্গিরণ করিয়াছিল। ক্ষমা চাহিবার সময় চারু হটাৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া প্রবলভাবে আমাকে এক ঝঙ্কার করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল—'আর ক্ষমা চাইতে হবে না,—হ্যাকা ছোঁড়া'!

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, মামারা যে আমার পাত্তা কিরূপে পাইলেন,—সেদিন সকালবেলা সুদর্শনবাবু আমাকে বৈঠক-খানায় ডাকিয়া পাঠাইলেন—আমি চায়ের সরাঞ্জম হাতে লইয়া, বৈঠকখানায় যাইতে গেলাম; গৃহিণী হটাৎ আমার হাত হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়া, আস্তে আস্তে একটু হাসির সঙ্গে বলিলেন—না না, তোমায় আর এগুল নিয়ে যেতে হবে না, তুমি ওখানি যাও বাবা—

চারু উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'য়েচে মা?

গৃহিণী তাহাকে চোখ টিপিলেন। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—একটু গোলে পড়িলাম। মায়ে-ঝিয়ে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা চলিতে রহিল, আমি বৈঠকখানায় চলিয়া

গেলাম। বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া দেখিলাম—আমার বড়-মামা!—আমার আর পা উঠিল না; মানুষের সারাজীবনটাই যেন আমার নিকট স্বপন বলিয়া মনে হইতে লাগিল—আমি কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

চতুর্থ চিত্র।

—:•০:—

শেষে জানিতে পারিলাম ; আমার অন্তর্ধ্যানের দিনই আমার দাদামহাশয় খবরের কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন লটকাইয়া দিয়াছিলেন।—যাক্‌, সেসব কথার দরকার নাই। যখন সুদর্শন বাবুর বাড়ীর সকলে আমার সত্য-স্বরূপ জানিতে পারিলেন, তখন এক নূতনধরণের আদর-যত্ন পড়িয়া গেল ; কিন্তু সারাদিন চারুকে আর আমি কোথাও দেখিতে পাইলাম না—তাহাকেই কিছু বুঝাইবার জন্য আমার বিশেষ প্রয়োজন।

বিকালে বড়-মামা যখন আমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিবার বন্দোবস্ত করিলেন, তখন চারুর ছোট ভাই আসিয়া আমাকে খুব গোপনভাবে কহিল—দিদি ডাকচে। আমি জিজ্ঞেসা করিলাম—কোথায় তিনি?—নণ্টু উত্তর করিল—তে'তলার ছাতে।

আমি তিন-লাফে একেবারে তে-তলায় চলিয়া গেলাম। —ছাতের উপর গিয়া দেখিলাম, খবরের কাগজ হইতে

আমার ফটোখানি কাটিয়া লইয়া, চারু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে—আমায় সে লক্ষ্য করিল না। আমি কহিলাম—তাহ'লে চ'ললুম দিদিমণি!—

চারু তীরের মত উঠিয়া পড়িয়া বলিল—এখনো আমাকে দিদিমণি ব'লবেন আপনি?—

আমার মনে হইল বলি—'আবার যদি ক্ষমা চাইতে হয়'—কিন্তু বলিলাম না; কেবলই হাসিলাম। চারু কি বুঝিল সেই বলিতে পারে; সে কহিল দেখুন, আপনাকে ঘৃণা আমি কোনদিনই করি নি—

বলিতে-বলিতে চারুর চোখ দুটো ছল-ছলে হইয়া আসিল, একটু চুপ করিয়া, আবার কহিল—এখন আমি যা' আপনার কাছে চাইব, আপনি দেবেন কি?

আমি বলিলাম—কি এমন জিনিষ বল না চারু।—আমি পৃথিবীর একজন মা-বাপহীন নগণ্য—মামাদের ভাতে মানুষ ··

চারু বাধা দিয়া বলিল—থাক্, চুপ করুন—আমি আর শুনতে পারছি না।—আবার ক্ষণিক চুপ করিয়া, চারু বলিল—আপনি জগতে দশ জনের একজন হবার চেষ্টা ক'রবেন—এইটে আমার কাছে আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে যান—

বলিতে বলিতে চারু নিজেকে বোধ হয় আর সামলাইতে

পারিল না; সে কাঁদিয়া ফেলিল।—খপ্ করিয়া সে দু'হাতে আমার পায়ের ধুলা লইয়া, হন্‌-হন্ করিয়া চলিয়া গেল; আর চারু কোন অপেক্ষায় দাঁড়াইল না। আমি কেবল গভীর রহস্যে পড়িয়া, ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

আমার অতীত-জীবনের ঘটনা হইতে, কেবলই বুকে একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া, আমি আবার বড় মামার সঙ্গে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী ফিরিয়া পুরানো সকলকেই দেখিলাম, শুধু পেনিকেই আর পাইলাম না। সবই ভুলিলাম; কেবল দশের একজন গণ্য মাণ্য হইব, এই আকাঙ্ক্ষায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি; কিন্তু আমি যাহাদের যাহা দিব বলিয়াছিলাম, তাহা তো কৈ দেওয়া হয় নাই। পেনর টাট্টু ঘোড়ার জন্য দুরন্ত সন্ধ্যা আজও জ্বালাতন করে। মরণকালে ক্ষেমঙ্করী আমায় বলিয়াছিল · জগতের মঙ্গল করিও।—নিজের যশ, মান, খ্যাতির জন্যই আজ পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিলাম;—যতটুকু লোকের মঙ্গল করিয়াছি,—সে কেবলই দশে আমার খ্যাতি রটাইবে—এই লাভের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে মুগ্ধ হইয়াছি। দশের ভাল করিতে গিয়া, কেবল তাদেরই মনের মত কথা বলিয়াছি—তাহা না করিলে